ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা

# ভারতের বিপ্লব কাহিনী

## প্রথম খণ্ড

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

জ্যোতি প্রকাশালয়
২০৬, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক : শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
**ভারত বুক এজেন্সি**
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :
৺শ্যামা পূজা
২৫শে কার্তিক, ১৩৫৩

মূল্য :
**চারি টাকা**

প্রচ্ছদপট :
**শিল্পী—প্রভাত কর্মকার**

মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ ও তৎপূজিতা ৺কালী মূর্ত্তির আলোক চিত্র
তুলিয়াছেন : **শিল্পী—বিষ্ণুপদ কর**

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র দে
**নিউ মদন প্রেস**
৯৫নং বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

# উৎসর্গ পত্র

ভারতের তৎকালীন মহা বিপ্লবী বীর, আজাদ হিন্দ্ বাহিনী
প্রতিষ্ঠাতা ও আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্র গঠনে
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রধান সহায়ক
রাসবিহারী বসুর
স্বর্গত আত্মার
উদ্দেশে।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

# সূচীপত্র

## প্রকাশকের কথা

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ ঘোষ অধ্যাপক, শ্রদ্ধেয় ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতের বিপ্লব কাহিনী' ১ম খণ্ড, প্রকাশিত হইল। ফাঁসীর মঞ্চে, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে যারা জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন, যাঁদের ত্যাগ-সাধনায় দেশ আজ স্বাধীনতার আলোবাতাসে সঞ্জীবিত, তাঁদের কথা দেশের সকলের নিকট প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন—এই বাসনা আমার বহুদিনের। এইজন্যই বহুদিন পূর্ব্ব হইতে ডাঃ দাশগুপ্তকে এই পুস্তক প্রণয়নে অনুরোধ জানাইয়াছি। তিনি এই বয়সে, স্বীয় স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ ও বিপন্ন করিয়াও যে প্রকার শ্রম স্বীকার করিয়া, দূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে যাইয়া, পুস্তকের তত্ত্ব ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর; এই জন্য তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য মনে করি।

বঙ্গভঙ্গের বিপুল উন্মাদনা একদিন আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। তখন আমরা বালক। প্রতি বৎসর দেখিয়াছি আমাদের গ্রাম কুমিরাতে (খুলনা) রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে বৃহৎ জনসমাগম; কলিকাতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের আগমন। এসব বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন শ্রদ্ধেয় শচীন্দ্রদাদা, (শচীন্দ্রলাল মিত্র, পরে খুলনা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ৭বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত)। তারপর যাই বিদ্যাশিক্ষা উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়িয়া পূর্ণিয়াতে। বিহার প্রদেশের এই সহরটিতে তখন স্বদেশী আন্দোলনেরকোন চিহ্নই দেখি নাই। ইহা ১৯১০-১৯১৩ সালের কথা। তারপর অবশ্য ১৯৪২এর আন্দোলনে পূর্ণিয়া বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং আমার সহপাঠী শ্রীশিবনাথ ভাদুড়ীর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান সতীনাথ ভাদুড়ী, তৎপ্রণীত উপন্যাস 'জাগরী'তে ইহার কিছু পরিচয় দিয়াছেন।

পূর্ণিয়ার পাঠ শেষ করিয়া যখন মেদিনীপুর কলেজে অধ্যয়ন করিতে আসিলাম, আমার বহুদিনের সুপ্ত বিপ্লবী চেতনা সেদিন সক্রিয় ও সচেতন হইবার

সুযোগ পাইল। এখানে আমি কয়েকজন খাঁটি বিপ্লবীর সংস্পর্শ-লাভ করি। ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলার মুক্ত আসামী পূর্ণ চন্দ সেন অন্যতম। পূর্ণবাবুর মাতুল গৃহে আমি গৃহশিক্ষক ছিলাম। এখানেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। পরে জানিয়াছি, আমার একটি ছাত্র, শ্রীসুবিমল রায়, কাশী বোমার মামলায় ৭ বৎসর দণ্ড প্রাপ্ত হন। পূর্ণবাবু কলিকাতা কেন্দ্রের সহিত মেদনীপুরের সংযোগ রক্ষা করিতেন। ইহা ভিন্ন যোগজীবন ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু (সত্যেন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), মেদিনীপুরের তৎকালীন গুপ্ত সমিতির পরিচালক ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। যোগজীবনবাবুর মধ্যমভ্রাতা, শ্রীযামিনীজীবন ঘোষ, উকীলএর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয়জীবনএর (তোতার) আমি গৃহশিক্ষক ছিলাম—ইনি পরে মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক হন। যামিনীবাবুর সাতটি পুত্র। ইঁহাদের মধ্যে নির্মলজীবন ঘোষ * এর (পায়রা) ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাডিকে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসী হয়। আর নবজীবন ঘোষ (শালিক)এর অন্তরীন অবস্থায় রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়। আত্মীয় স্বজনকে তাহার মৃতদেহ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ—পর্য্যন্ত এই ঘটনায় বিচলিত হন এবং সংবাদ-পত্রে কঠোর মন্তব্য করেন। যামিনীবাবুর প্রাপ্ত বয়স্ক সব কয়টি পুত্রই অন্তরীন অবস্থায় ছিল। আমি জানি এই পরিবারটি দেশের জন্য কী অতুলনীয় দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছে।

বাঙ্গালার—মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি স্থানের ও ভারতের আরও বহুস্থানের বহু ঘটনা এই খণ্ডে দেওয়া হয় নাই। দেশবাসীর সহানুভূতি পাইলে এবং ভগবানের ইচ্ছা হইলে, দ্বিতীয় খণ্ডে দিবার ইচ্ছা গ্রন্থকারের আছে।

আমাদের সম্মুখে স্বাধীন ভারত; বহু লোকের স্বপ্ন আজ সফল হইতে চলিয়াছে; বহুবীরের আত্মত্যাগ আজ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজকার এই পাওয়ার গর্ব্বে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই—তাঁদের কথা, যাঁরা

---

* নির্ম্মলজীবন ঘোষ—জন্ম—৫ই জানুয়ারী, ১৯১৬; নবজীবন ঘোষ—জন্ম—২৮শে নভেম্বর, ১৯১৪।

এই দিনের প্রতীক্ষায় তিলে তিলে আত্মদান করিয়াছেন, দেশকে ভালবাসার অপরাধে যাঁরা এই পৃথিবীর আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত হইয়া অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীর অন্তরে এই সকল বীরশহীদেয় পুণ্য স্মৃতিকে জাগরূক রাখিতে এই পুস্তক যদি কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা যত্ন সার্থক মনে করিব।

অনিবার্য্য কারণে পুস্তকে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। আগামী সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইবে, পাঠক সাধারণের নিকট ইহাই বিনীত নিবেদন।

পরিশেষে, বাল্যকাল হইতে মহাকবির যে কয়ছত্র কবিতা সর্বদা স্মরণে রাখিয়াছি, উহা দ্বারাই আমার বক্তব্য শেষ করিব :

"বীরের এ রক্তস্রোত— মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সেকি ধরার ধুলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা—
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা—সেকি আনিবেনা দিন ?"

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

---

# ভূমিকা

ভারতীয় বিপ্লবীগণের ইতিহাস ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরই অন্তর্ভুক্ত অন্যতম অধ্যায়। শত-শত যুবক, বালক, প্রৌঢ় যে প্রেরণায় হাসিতে হাসিতে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে, তাহা জাতীয়তারই নামান্তর। স্বাধীনতার আকাঙ্খা হইতে ইহার উদ্ভব। সুতরাং সে বিবরণ জাতীয় ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য্য। শাসনযন্ত্রের অত্যাচারের নিষ্পেষণে জাতীয় আন্দোলন পুষ্ট হয়, চণ্ডনীতি ও পীড়নে বিপ্লব আন্দোলনও পুষ্ট হয়। ইহার ধারাবাহিক কাহিনী যেমন মর্ম্মস্পর্শী, তেমনি উহা শাসন নীতির অদূরদর্শিতাই প্রতিপন্ন করে।

যে সমস্ত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর অবলীলাক্রমে মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহাদের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই প্রথমে এই গ্রন্থ আরম্ভ হয়। তাই মহারাজ নন্দকুমারের নামই শহীদ হিসাবে শীর্ষস্থানীয়। ক্রমে এই পুস্তকে সমগ্র বিপ্লব-যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে উৎসাহিত হই। সেই হিসাবেও দেখিলাম মহারাজাই প্রথমে বিদ্রোহী। ইংরেজের চতুরতা বুঝিতে পারিয়াই তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে শ্বেতাঙ্গ বিতাড়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কেবল জাতির স্বার্থের জন্য নয়, নিজ স্বার্থের জন্যও ইংরাজ কত গর্হিত কাজ করিতে পারে, নন্দকুমার ও অযোধ্যার বেগমের ব্যাপারে ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। মহারাজ নন্দকুমারের স্বদেশ ভক্তি ও স্বজাতি প্রেমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়ানী পদের পরিবর্ত্তে লাভ হয় স্বগৃহে অবরোধ, তাঁহার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র এবং পরে যোগসাজশী মৃত্যুদণ্ড। যেরূপ প্রশান্তচিত্তে মহারাজা নন্দকুমার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করেন, সেই অদ্ভুত ও অশ্রুত-পূর্ব্ব দৃশ্যে ইংরেজ সেরিফও স্তম্ভিত হইয়া যান; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েন। বিচারের নামে নরহত্যা সংঘটিত করিয়া ইংরেজ নন্দকুমারের প্রচেষ্টার একেবারে কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলে।

বহুদিন পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আবার ভারতে এক ব্যাপক বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। মঙ্গল পাঁড়ে হইতে আরম্ভ করিয়া নানাসাহেব, তাঁন্তিয়া টোপী, কুমার সিং, রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতির বীরত্ব কাহিনী বৃহদাকার ইতিহাসকে অলঙ্কৃত

করিবার পক্ষেই উপযোগী। এ গ্রন্থে সে সকল বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না। তবে ১৮৫৭ সালের সেই বিদ্রোহের তারিখ স্মরণ করিয়া শ্যামজী কৃষ্ণ-বর্ম্মা, বীর সাভারকার প্রভৃতি বহু বিপ্লবীবীর কিরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার আংশিক পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

তারপরের স্মরণীয় ঘটনা মণিপুরের যুদ্ধ ও বীর টীকেন্দ্রজিৎ এবং অশীতিবর্ষ বয়স্ক বীর সেনাপতি থাঙ্গালএর উন্নতশিরে ফাঁসিরমঞ্চে আরোহণ। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এবার সেই বীরত্বপূর্ণ বিগত কাহিনী এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। বারো বৎসর বয়সেও সে কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতাম।

তারপরে আসিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। ১৯০৫ সাল হইতে শাসক-বর্গের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। অত্যাচার, অনাচারও পীড়নে সেই যুগে বিপ্লব আন্দোলনের জাতীয়তার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব ও পুষ্টি। সেই যুগের অনেক বিপ্লবীর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। ১৯১০ সাল হইতে বিপ্লবীদের ঢাকা ষড়যন্ত্র প্রমুখ অনেক মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছি। দেশবন্ধুর নিকটে আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার বিস্তৃত কাহিনী শুনিয়াছি। বন্ধুবর সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের নিকটেও অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি। বস্তুতঃ সে যুগের অনেক কাহিনী আমার প্রত্যক্ষীভূত।

এই গ্রন্থে ১৯১৫ সালেরও অনেক কথা অনুক্ত রহিয়াছে। কিরূপে বিপ্লব-দমনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া টেগার্ট সাহেব সর্ব্বত্র ধরপাকড়, অন্তরীণ প্রভৃতির দ্বারা সমগ্র বঙ্গভূমি ত্রস্ত, চকিত, বিচলিত করিয়াছিলেন, কিরূপে ভারত সরকার রাউলট কমিটির রিপোর্ট পাইয়া উহা আইনে পরিণত করেন, কিরূপে উহার পরে সমস্ত ভারতভূমি সমভাবে বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেই মহান্দোলনে কিরূপে বিপ্লবীগণ আসিয়া দেশবন্ধুকে তাহাদের প্রাণের নেতা জানিয়া তাঁহার প্রধান সহকর্ম্মী হিসাবে স্বরাজ সংগ্রামে প্রাণমন ঢালিয়া দেয়, তাহার কোন কথাই এই গ্রন্থে বলা হয় নাই। ভগবৎ ইচ্ছায় আবার সম্ভব হইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে রৌলট কমিটির রিপোর্টের উপরে নির্ভর করিয়া অনেক প্রবন্ধ ও জীবনচরিত রচিত হইয়াছে। লোক এখন পরিশ্রমে বিমুখ, মৌলিক গবেষণায় শ্রমকাতর। তাই রৌলট কমিটির আংশিক বাঙ্গলা সংস্করণ হিসাবেই আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান পাইয়াছি। তবে শচীন্দ্র সান্ন্যাল, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাসবিহারী বসু, শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, শ্রীমদনমোহন ভৌমিক যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক মৌলিক বিষয় আছে। এই সমস্ত ব্যক্তি অগ্রগামী বিধায় আমার কৃতজ্ঞতার্হ। চন্দননগরের শ্রীমতিলাল রায় ও তাঁহার সঙ্ঘের অরুণ বাবু, সতীশমহারাজ প্রভৃতিও আমাকে অনেক কথা বলেন। সতীশ মহারাজ স্বর্গত শ্রীশ ঘোষের সহোদর ও রাসবিহারী বসুর আত্মীয়, আর অরুণ বাবু বিখ্যাত কানাইলালের আত্মীয় ভ্রাতা। আমার পরম স্নেহাস্পদ ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দ্বীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত (অধুনা স্বর্গত) আশুতোষ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ন্যায় খাঁটি লোক আমি খুব কম দেখিয়াছি। আশুতোষের নিকট অনেক কথা পাইয়াছি। সামান্য বিষয়ে দুই একটা কথা ভুলিয়া গেলেও সত্যপ্রিয় আশুতোষের বিবরণে আত্মশ্লাঘার কোন চিহ্ন নাই বলিয়া তাঁহার কথা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। আমার সহোদরের তুল্য শ্রীমান ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তীর ন্যায় এরূপ সেবাপরায়ণ ও দেশভক্ত ব্যক্তি খুবই বিরল। আজন্ম নির্য্যাতিত শ্রীমান মদন ভৌমিক, অমৃত হাজরা ও শ্রীমান রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথসেন (এক্ষণে স্বামীজী), আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র ও আমার প্রতিবেশী স্নেহাস্পদ শ্রীমান কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রদাসের নিকট দলের কিছু কিছু বিবরণ অবগত হইয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন মহাশয়ের গঠনশক্তিও আমি মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিতাম। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটেও কোন কোন বিবরণ অবগত হইয়ছি। ইঁহাদের মুখে কিছু কিছু যাহা শুনিয়াছি আমি বিশেষ ভাবে বিশ্বাস করি।

কিন্তু এই পুস্তক প্রণয়নে আমি মৌলিকভাবে সহায়তা পাইয়াছি মোকদ্দমার

মহারাজা নন্দকুমার পূজিতা—৺কালীমূর্তি

বীরভূম, ভদ্রপুরাস্থিত মহারাজ নন্দকুমারের আদি বাসগৃহের ভিতরের অংশের আলোক চিত্র।

বিরাট—প্রাসাদ বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ।

মহারাজ নন্দকুমারের
বর্তমান বংশধরদের সৌজন্যে

নথিপত্র ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কাগজপত্র হইতে। মোকদ্দমার বিবরণ বিবৃত থাকায় ঐ সমস্ত পুরাতন কাগজপত্রের ফাইল অমূল্য। ইহা হইতে বুঝিয়াছি রাউলট কমিটিরও অনেক তারিখ ভ্রমাত্মক। এতদ্ব্যতীত উক্ত কমিটির বিবরণ সম্পূর্ণ একতরফা।

একটি তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ কৈফিয়ত আবশ্যক। এপর্য্যন্ত যত দেশদ্রোহী ভারত-ভূমি কলঙ্কিত করিয়াছে, তন্মধ্যে বিশ্বাস ঘাতকের শাস্তিবিধান প্রথমেই করেন কানাই-লাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ; গ্রীকবীর হারমোডিয়াস ও এরিষ্টজিটনের ন্যায় এদেশে এই উভয় আত্মত্যাগী যুবকই বীরাগ্রগণ্য। নরেন গোঁসাইয়ের সাক্ষ্য যে কিরূপ মারাত্মক, এই গ্রন্থে তাহা বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছে। যে তারিখে তাঁহারা ঐ অসমসাহসিক কার্য্য অনুষ্ঠিত করেন, আর যে তারিখে তাঁহাদের আত্মা দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া যায়, ভারতবাসীর চক্ষে উহা স্মরণীয় দিবস। এই কয়টি তারিখই নির্ভুল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অনেক পুস্তকে নরেন গোঁসাইর হত্যার তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১লা সেপ্টেম্বর। রাউলট রিপোর্টও বলে উহা সংঘটিত হয় সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু উহা যে ৩১ আগষ্ট (১৯০৮), তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যায়। হাইকোর্টে সত্যেন্দ্র ও কানাইএর মোকর্দ্দমার রায় বাহির হয় ২১শে অক্টোবর ; আর কানাইএর ফাঁসী হয় ১০ নভেম্বর ও সত্যেন্দ্রনাথের হয় ২১ নভেম্বর। উভয় তারিখই বাঙ্গালীর নিকট স্মরণীয় দিবস।

কানাইলালের তিরোধানের তারিখও যে ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর, ২৫শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার, সে সম্বন্ধেও কিছু নিবেদন আবশ্যক। এই পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় ৮ই নভেম্বর উল্লিখিত আছে। তখনকার বহুপ্রশংসিত "বেঙ্গলী পত্রের" ১১ তারিখের কাগজের চতুর্থ পৃষ্ঠার, শেষ কলমের প্রথম লাইনে 'রবিবারে ফাঁসী হইয়া গিয়াছে উল্লিখিত থাকায়—সেই গণনায় আমি ৮ই লিখিয়াছিলাম। পরে আমার স্নেহাস্পদ ও সহকারী শ্রীমান সুধীরকুমার মিত্র, চন্দননগরে শ্রীমতিলালবাবুর নিকট হইতে ১০ই তারিখ শুনিয়া আসায়, আমি আবার

১

পুরাতন কাগজ দেখিতে প্রবৃত্ত হই। দেখিলাম বস্তুতঃই বেঙ্গলী ভুল করিয়াছে, আর ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজে ১১ তারিখের কাগজে ১০ই, মঙ্গলবারের কথাই উল্লিখিত আছে। মতিবাবু ও সুধীরবাবু এ বিষয়ে বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

কানাইলালের মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রেও যে সুনিদ্রার ব্যাঘ্যাত হয় নাই তাহা ৯ই রাত্রে ( ৭ই নহে পৃ ৬১ )। সত্যেন্দ্র নাথের ফাঁসীর তারিখ ২১ নভেম্বরই ৬ই অগ্রহায়ণ ঠিক। আর তাহার পক্ষে যে উকীল দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার নাম নরেন্দ্র নাথ বসু, নরেন্দ্র কুমার বসু নহেন। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিলেন, আলিপুরে ওকালতি করিতেন। হাইকোর্টে সত্যেন্দ্রের মোকর্দ্দমার রায় বাহির হয় ২১শে অক্টোবর (১১ই নহে ৬০পৃষ্ঠা)। আমার বন্ধু ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর সম্বন্ধে বিস্তৃত কাহিনী ও আরও কয়েকটি কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডে দিতে প্রয়াস পাইব।

‘মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র’ ও ‘বর্ম্মা ষড়যন্ত্র’ প্রভৃতি মোকদ্দমার বিবরণ স্থানাভাবে এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল না। প্রথম মহাসমরে যাঁহারা আমেরিকায় থাকিয়া জার্ম্মানদের সাহায্য করেন, তাঁহাদেরও দুই একজনের সঙ্গে আমার আলোচনা হইয়াছে। তন্মধ্যে ডাক্তার চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে প্রতিদিন আমার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত অনেক ঘটনাও তাঁহার সৌজন্যে আমি তাঁহার নিকট অবগত হইয়াছি। আই, বি পুলিসের কতিপয় বহুদর্শী উচ্চ অফিসারের নিকটেও অনেক প্রত্যক্ষীভূত কাহিনী শুনিয়াছি।

পুস্তক প্রণয়নে সুধীরবাবু ব্যতীত, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, কান্তীন্দুভূষণ চৌধুরী এম-এ, শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও প্রমথ ভট্টাচার্য্যের নিকটে আমি সহায়তা পাইয়াছি। বর্ম্মা হইতে শ্রীযুক্ত ললিত মোহন ব্যানার্জ্জি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা আমার কৃতজ্ঞতার্হ। ললিতবাবুর সহিত আমার আবাল্য অন্তরঙ্গ সুহৃদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস এডভোকেটের সহায়তায় পরিচিত হই।

উপসংহারে একটি কথা বলা আবশ্যক। সম্প্রতি কলিকাতা পুলিস-সঙ্ঘের

উদ্যোগে বিপ্লব যুগের অস্ত্রশস্ত্রাদির একটি প্রদর্শনী হইয়াছে। তাহাতে অনেকেই পুস্তকের ভিতরে প্রোথিত একটি বোমা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এইভাবে বোমাটি ১৯০৮ সালের মার্চ্চমাসে কিংসফোর্ড সাহেবকে পাঠানো হয়। ইনি তখন মজঃফরপুরে বদলীর হুকুম পাইয়াছেন। পুস্তকখানি না খুলিয়াই প্যাকিং বাক্সজাত করা হয়। অতঃপর ৩০শে এপ্রিল প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম যে কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া বিফলমনোরথ হয়, এই পুস্তকের ১৩।৪৪ পৃষ্ঠায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরে বারীন্দ্র প্রভৃতি কলিকাতায় ধৃত হইয়া স্বীকারোক্তি করেন। তাহাতে পুস্তকের ভিতরের বোমার কথা উল্লিখিত হয়। অবিলম্বে কলিকাতার পুলিস কমিসনার মিঃ কিংসফোর্ডের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ কর্ণেল এলারসনকে মজঃফরপুরে পাঠাইয়া দেন। সেখানে গিয়া তিনি প্যাকিং বাক্সটী জলে ফেলিয়া বোমার সক্রিয়তা নষ্ট করেন। বরাতের জোরে এইভাবে কিংসফোর্ড বারবার তিনবার অপ্রত্যাশিত ভাবে রক্ষা পাইয়া যান। উক্ত প্রদর্শনী হইতেও আমি কিছু সহায়তা পাইয়াছি বলিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও আমার নিত্যসঙ্গী শ্রীমান অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান শৈলেন্দ্র নাথ সেনের সহযোগিতা ব্যতীত অমানুষিক পরিশ্রম লব্ধ এই ইতিহাস কিছুতেই রচিত হইতে পারিত না। আমি তাঁহাদের নিকটে ও আমার কর্মস্থানের সহযোগীগণের নিকটে ঋণী। ভগবানের কৃপায় পুস্তকখানি সর্ব্বজন আদৃত হইলেই পরিশ্রম সার্থক হইবে।

কলিকাতা, ২৫শে কার্তিক **শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত**

# প্রথম অধ্যায়

## মহারাজ নন্দকুমার

### উপক্রমণিকা

মহারাজ নন্দকুমার ও নবাব মিরকাশিম উভয়েই প্রথমে শ্বেতাঙ্গ বণিক্ ইংরেজের সহিত সম্প্রীতিবদ্ধ ছিলেন, উভয়েই পরে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া বিরুদ্ধাচরণ করেন। ফলে ইংরাজ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের চক্রান্তে নন্দকুমারকে ফাঁসীমঞ্চে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়; আর মীরকাশিম যুদ্ধে হারিয়া রাজ্যচ্যুত হইয়া নিরুদ্দেশ হন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ইন্‌পিচমেণ্টের (পার্লেমেণ্টে কর্ত্তৃক আনীত অভিযোগের বিচার) সময় প্রসিদ্ধ বাগ্মী, ন্যায়পরায়ণ এডমাণ্ড বার্ক সত্যই বলিয়াছিলেন—

"The character here given of him is that of an excellent patriot, a character which all your lordships in the several situations which you enjoy, or to which you may be called will envy, the character of a servant who stuck to his master against all foreign encroachment, who stuck to him to the last

*বীরভূম জেলার অন্তর্গত ভদ্রপুর গ্রামে নন্দকুমারের জন্ম। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ। ইনি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। অল্পবয়সেই নন্দকুমারের বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে তিনিও বিশেষ বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন। নবাব মুর্শিদকুলীর সময়ে আর একবার আলিবর্দির সময়ে তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত নবাবের সময়ে তিনি হিজলী ও মহিষাদলের আমিন নিযুক্ত ছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হয়; তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং অধিকাংশ অর্থই সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন।

hour of his life and had the living testimony of his master to his services".

[ Burke's Impeachment of Warren Hastings ].

প্রবল পরাক্রান্ত হেষ্টিংসের বিষনজরে পড়ার দরুনই যে নন্দকুমারকে ফাঁসীরমঞ্চে আরোহণ করিতে হইয়াছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়ারেন হেষ্টিংস সম্বন্ধেও মহামতি বার্ক ঠিকই বলিয়াছেন—

Ha ! miscreant, plunderer, murderer of Nund Comar, where wilt thou hide thy head now ? [Lawson's Warren Hastings].

এডমাণ্ড বার্ক অবশ্য হেষ্টিংসের আচরণ সম্বন্ধে খাঁটি ইংরাজের ন্যায় উক্তি করিয়াছেন। তবে নন্দকুমার ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গুরুতর অন্যায় করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু তিনি পরবর্ত্তী কালের কার্য্যকলাপে স্বীয় পূর্ব্বাপরাধ সম্পূর্ণরূপে স্খলন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই নিরপেক্ষ ইংরাজ লেখকগণও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি প্রকৃতই উচ্চ আদর্শের জন্য হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন—

Mr. Justice Beveridge has pointed out that the execution of Nanda Kumar was a judicial murder and the popular feeling is that he was a martyr.*

এই সময়ে কি ভাবে নন্দকুমার শহীদের সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রথম যুগের সঙ্গে নন্দকুমারের কতটা সম্বন্ধ ছিল, সেই যুগ সন্ধিকালের বিস্তৃত বিবরণ পাঠকের জ্ঞাত হওয়া একান্ত কর্তব্য।

( ১ )

বাঙ্গালা দেশটি অতি বিচিত্র স্থান। এই স্থানকেই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন স্পষ্টবাদিনী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী ও বাঙ্গালার প্রথম শহীদ নবাব

*Walsh's History of Mursidabad District Page 222.

সিরাজদ্দৌলা। তখনকার বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতকতায় বলেই বাঙ্গলা ইংরাজের করতলগত হয়। আবার শত বর্ষাধিক পরে বাঙ্গলাদেশ হইতে যে স্বদেশ প্রেমের মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাতেই বাঙ্গলার জাতীয়তা, বাঙ্গালার শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙ্গলার অখণ্ডতা প্রতিপন্ন করিতে বাঙ্গলার অগণিত সন্তানের আত্মদান। বাঙ্গলা দেশেই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বীর দেশবন্ধুর আবির্ভাব, আবার বাঙ্গলার স্বেচ্ছাকৃত পৃথকীকরণে ভারতের স্বরাজলাভ। আত্মদান ও আত্মবিভ্রম সমভাবে বাঙ্গলার বক্ষে তরঙ্গাকারে প্রবাহিত। এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ বুঝি কোন দেশের জাতির মধ্যে আর দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গলার ত্রিচতুর্থাংশ লোক লাঞ্ছনা ও আতঙ্কে অভিভূত, বাঙ্গলার স্বাধীনতা এখন প্রহসন মাত্র— কিন্তু এই বাঙ্গলাই যদি আবার অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র ভারতের উপর শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও জাতীয়তার প্রভাব বিস্তার করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করে তাহাতেও আবার আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকিবেনা।

যাক্ এবার আমরা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই।

ইংরাজ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে বাঙ্গলা দেশে বাণিজ্যের প্রসারে লাভবান হইয়া ক্রমে ক্রমে রাজকীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, বাঙ্গলার সিরাজ ইংরাজের এই চতুরতা এবং দুরভিসন্ধি বুঝিয়াই তাহাদের উপরে খড়্গ হস্ত হইয়াছিলেন। 'ফিরিঙ্গিরে নাহি দিব সূচ্যগ্র স্থান,—তাঁহার মুখ হইতেই প্রথমে বাহির হয়। প্রায় পোনের মাস (১৭৫৬ এপ্রিল হইতে ১৭৫৭, জুন ২৩) তিনি বাঙ্গলার নবাবের পদে সমারূঢ় ছিলেন, কিন্তু এরূপ চতুর্দ্দিকাগত বিপজ্জালে কোন নবাব বা সম্রাট ইতিপূর্ব্বে কখনও জড়িত হন নাই। তাঁহার গৃহে শত্রু, বাহিরে শত্রু, কর্ম্মচারী শত্রু, পার্শ্ববর্ত্তী শত্রু, চতুর্দ্দিকে তখন তিনি শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত—তখন তাঁহার একমাত্র বন্ধু ছিলেন বীর মোহনলাল ও মীরমদন।

নবাব আলীবর্দ্দির মাত্র তিন কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠার নাম ঘেসেটি, তৃতীয়টির নাম আমিনা। তিন কন্যারই আলিবর্দ্দি সহোদর হাজি আহম্মদের তিনপুত্রের

নওয়াজেস, সৈয়দ মহম্মদ, জৈনুদ্দিনের সহিত যথাক্রমে বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিতীয় কন্যার পুত্র সওকতজাঙ্গ মদ্যপায়ী, দুশ্চরিত্র ও স্থূলবুদ্ধি। নওয়াজেস অপুত্রক—ঢাকার শাসন কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু রাজবল্লভের উপরে কার্য্যভার দিয়া মুর্শিদাবাদের মতিঝিলে বিলাসে কালাতিবাহিত করিতেন। আমিনার পুত্র সিরাজদ্দৌলাকে আলিবর্দ্দি অত্যধিক স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকেই নবাবের গদিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। এই বিষয়ে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে অমাত্যবর্গের সম্মতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরাজও মাতামহের নিকটে কোরান স্পর্শ করিয়া মদ্য পরিত্যাগ করেন এবং অতঃপরে তিনি উহা স্পর্শও করেন নাই। সাধ্বী বেগম লুতফুন্নেসার প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

জগতশেঠ ছিল তখন রাজ্যের কেন্দ্রীভূত শক্তি। বিপুল অর্থবান শেঠজী সময় মত নিজের অর্থব্যয় করিয়া দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গলার নবাবের ফার্ম্মাণ লইয়া আসিতেন, পরে উহা পূর্ণ করিতেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মির্জ্জাফর খাঁ প্রভৃতির পরামর্শে এবার জগৎশেঠ ফার্ম্মাণ আনয়ন করেন সিরাজদ্দৌলার জন্য নয়—পূর্ণিয়ার নবাব সওকত জঙ্গের জন্য। এইখান হইতেই বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজদ্রোহের সূচনা হইল।

মিরজাফর এই শেঠজীর সহিত মিলিত হইয়াছিল নিজে নবাব হইবার জন্য। জগতশেঠ বাণিজ্যজীবী ইংরেজের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসন হইতে সরাইতে এবং মিরজাফরকে নবাবীগদ্দিতে উপবিষ্ট দেখিতে সঙ্কল্প করিলেন। সিরাজের মন্ত্রী রায়দুর্লভ, মিরজাফর ও জগৎশেঠের সহিত ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। নবাবের মাতৃস্বসা ঘেসেটিও সেই ষড়যন্ত্রের সাফল্যের জন্য অর্থব্যয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নবাব তাহা জানিতে পারিয়া মতিঝিল অধিকার করিয়া লইলেন। ইংরাজও চায় বাঙ্গলা হস্তগত করিতে, সুতরাং উক্ত ষড়যন্ত্রে যোগদান করা তাহার লাভ বলিয়া সে উহাতে

*Walsh's History of Murshidabad District. Page 222.

ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিল। কোম্পানীর ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতিও বিশেষ আগ্রহান্বিত হইল।

ফরাসীরাও এই সময়ে চন্দননগরে অবস্থান করিয়া বাঙ্গলার মধ্যে ব্যবসা চালাইতেছিল। ইংরাজ ও ফরাসী ছিল উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি। ইউরোপে বহুদিন হইতেই এই দুই জাতির মধ্যে ঝগড়া চলিতেছিল, এবং ভবিষ্যতেও লাগিবার উপক্রম হইয়াছিল। কতকটা চন্দননগরস্থ ফরাসীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য, কতকটা নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরিবার জন্যে ইংরাজ কোম্পানীর গভর্ণর ড্রেক বাগবাজারে পেয়ারিং বন্দর দুর্গে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন। আর নওয়াজেসের বিশ্বস্ত সহকারী রাজা রাজবল্লভ (যাহাকে নবাব মাতৃস্বসা ঘেসেটির প্রধান উপদেষ্টা বলিয়া মনে করিতেন) নবাবের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পুত্র কৃষ্ণদাস ও ধনরত্নসহ পরিজন বর্গ কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ড্রেক সাহেব কৃষ্ণদাসকে ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় দেন। নানাপ্রকারে ইংরাজ নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নবাব অবিলম্বে পেয়ারিং দুর্গ ভূমিসাৎ ও কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে ড্রেক সাহেবের নিকট একখানি জরুরি পত্র লিখিয়া পাঠান। ড্রেক সাহেব নবাবের দুইটি আদেশই প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হন।

সিরাজ জগৎশেঠ-মিরজাফর-পুষ্ট এই ষড়যন্ত্র নষ্ট করিবার জন্য মিরজাফর-খাঁকেই সেনাপতি করিয়া পূর্ণিয়া যাত্রা করেন। যখন তিনি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন ড্রেক সাহেবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ লিপি পাইয়া তিনি অত্যন্ত কুপিত হন্ এবং মীরজাফর ও মোহন-লালকে সৌকতজঙ্গ দমনে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হন। পথে কাশিমবাজার কুঠি হস্তগত করিয়া ওয়াট্‌সনকে বন্দী করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস পালাইয়া কান্তমুদীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইহার পর নবাব কাটোয়া অধিকার করিয়া কলিকাতা অধিকার করেন। তিনি যে বাড়ীতে তোপ দাগাইয়া ফোর্ট উইলিয়ামে গোলাবর্ষণ করেন, তাহা

ছিল একটি থিয়েটার বাড়ী, উহার নাম ছিল the Play House, লালবাজার এবং মিশনরোর মোড়ে। কলিকাতার নাম রাখা হইল আলিনগর এবং ১৪৬জন ইংরাজকে বন্দী করা হইল। কলিকাতা ছিল রাজা মাণিকচাঁদের হেফাজতে। তাহার অসঙ্গত ও দোষণীয় অসতর্কতায় ১২৩ জন ইংরেজের প্রাণ-হানি হয়। ইংরাজরা এইরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে অন্ধকূপহত্যা কাহিনীর মূলে কোন সত্য নাই। তবে 'সিরাজদ্দৌলা'র নাট্যকার গিরিশ ঘোষ মহাশয় বলেন, 'এরূপ একটা ঘটনা কলিকাতার ভারপ্রাপ্ত রাজা মাণিকচাঁদের অসতর্কতার ফলে হইয়াছিল। কিন্তু নবাব শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। আমার মনে হয় হলওয়েল উক্তি অতিরঞ্জিত, তবে গরম অসহ্য হওয়ায় কয়েকজনের প্রাণহানি হয়। যাহা হউক কলিকাতা অধিকৃত হয় ১৭৫৬ সালের ২২ জুন, এবং ড্রেক সাহেব নৌকাযোগে ফলতায় পলায়ন করেন। আমিনচাঁদ এই বন্দীগণের আহারের সংস্থান করিতেন কিন্তু মূল্য গ্রহণ করা হইত ৬।৭ গুণ। 'ব্লাক মার্কেট' বোধহয় উমিচাঁদ হইতেই প্রথম সুরু হয়।

( ২ )

প্রথম হইতেই ইংরাজের মতলব ছিল অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক। নবাবকে দমন করিতে হইলে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদিগকে দলে আনা আবশ্যক, কারণ ফরাসী ও ওলন্দাজের প্রতি নবাব অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহারা নবাবের অসন্তোষজনক কোন কার্য্য করে নাই, আর তাহারা যদি নবাবের স্বপক্ষে যায়, তবে ইংরাজ একদণ্ডও বাঙ্গলায় তিষ্ঠিতে পারে না, তাই ইংরাজ বণিক চন্দন-নগরের ফরাসীদিগকে ও চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগকে বুঝাইলেন—

"আমরা শ্বেতকায় জাতি, কালা-আদমীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে চাই, অসভ্য ভারতীয় সভ্যতার স্থানে আনিতে চাই ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, এসো আমরা একসঙ্গে নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান করি"।

ওলন্দাজরা কোনরূপেই ইংরাজকে নবাবের বিরুদ্ধে সহায়তা প্রদান করিতে সম্মত হয় না। ফরাসীও কোন প্রকারে নবাবের বিরুদ্ধে যাইতে সম্মত হয় নাই, তবে এ পর্য্যন্ত রাজী হয় যে, যদি নবাব ইংরাজদিগকে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করে, তবে চন্দননগরে তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে। সেই সময়ে ইংরাজ ও ফরাসী—এই উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি হয় যে কেহই কোন জাতিকে বাঙ্গলা দেশে আক্রমণ করিবে না। এই সন্ধির নাম হয় Treaty of Neutrality. ফরাসীয়গণ সন্ধির সর্ত্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে কিন্তু চতুর ইংরাজ সুবিধা পাওয়া মাত্রেই অবলীলাক্রমে তাহা যে ভঙ্গ করে, পরবর্ত্তী ঘটনা তাহা সপ্রমাণিত করিবে।

ড্রেক সাহেব যখন সদলে কলিকাতা ছাড়িয়া ফলতায় চলিয়া যায়, ক্লাইভ ছিলেন তখন মাদ্রাজে। কলিকাতায় ইংরাজের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মাদ্রাজের ইংরাজগণ কর্ণেল ক্লাইভ ও এড্‌মিরাল ওয়াটসনকে প্রতিবিধান করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। ক্লাইভ ১৭৫৬ সালের ২৩ নভেম্বর মেজর কিলপাট্রিকের সহায়তায় জগৎশেঠকে সব বন্দোবস্ত করিতে চিঠি লেখেন এবং সেও মিরজাফরের সহায়তায় সব ব্যবস্থাই করিয়া রাখে। অতঃপরে ক্লাইভ যখন বজবজ আসিয়া পৌছেন, তাহার সৈন্যবর্গ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাজা মাণিকচাঁদের ছিল ১৫০০ ঘোড়শোয়ার ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য। ভীরু মাণিকচাঁদ তাহার মাথার উপর দিয়া একটা গোলা চলিয়া যাওয়ায় এত সন্ত্রস্থ হইয়া পড়ে যে একমাত্র পলায়নই সে সোজাপথ মনে করে। আর্ম্মি বলেন মানিকচাঁদ অগ্রসর হইলেই জয় ছিল সুনিশ্চিত—

"Had the cavalry advanced and charged the troops in the hallow at the same time that the infantry began to fire upon the village, it is not improbable that the war would have been concluded on the very first trial of hostilities.*

* Beveridge's History of India, Book III p. 552-3.

অতঃপর কলিকাতা অধিকারের আর বিলম্ব হইল না। কারণ কলিকাতার ভারও ছিল মাণিকচাঁদের উপরে। আর বিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠ, মিরজাফর ও রায়দুর্ল্ভ ছিল তাহার পরামর্শ দাতা।

ইহার পরে ক্লাইভের সৈন্য হুগলীবন্দর লুণ্ঠন করিল। অতঃপর ইংরাজের ক্রমিক অসমসাহসিকতায় নবাব দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণে উদ্যত হইলেন ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হালসীবাগানে উমিচাঁদের উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করেন। বিশ্বাসঘাতক, ধূর্ত্ত নবকৃষ্ণ মুন্সী ( পরে ইংরাজের অনুগ্রহে মহারাজা ) ক্লাইবের সংবাদবাহক হইয়া নবাবের শিবিরের এবং সেনা বাহিনীর যে বিবরণ লইয়া আসে, তাহাতেই কুজ্ঝটিকাময় রাত্রিতে ক্লাইভ শত্রু-শিবির আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। ক্লাইভ প্রথমে সুবিধা করিয়া নিলেও পরে দিবা-ভাগের দশটা পর্য্যন্ত কুজ্ঝটিকার গাঢ় অন্ধকারবশতঃ দিগ্‌ভ্রম করিয়া ফেলেন। ফলে ক্লাইভের শতাধিক ইউরোপীয়ান সৈন্য নিহত হয়, এবং একেবারেই গভীর পরাজয়েই এই নৈশ অভিযানের সমাপ্তি হয়।* তবে চতুর ক্লাইভ মনেমনে নবাবের ধ্বংস কামনা করিলেও শীঘ্র শীঘ্র ৯ই ফেব্রুয়ারী ( ১৭৫৭ ) সন্ধি করিয়া ফেলেন। এই সন্ধির অন্যান্য সর্ত্তের সঙ্গে ইহাও স্থির হয় "ইংরাজ বণিকের ন্যায় ব্যবসা চালাইবে, নবাব তাহাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না, এবং ইংরাজও নবাবের রাজ্যে কোনরূপ গোলযোগ বা শান্তিভঙ্গ করিবে না।" বজবজ এবং কলিকাতার এই দুইটি ব্যাপারে যদি ফরাসী সৈন্য নববারে সহায়তা করিত, তবে ইংরাজ সৈন্যের অস্তিত্বও বাঙ্গলা দেশে থাকিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ফরাসীয়গণ সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী কাজ করিতে কোনরূপ ত্রুটি প্রদর্শন না করিলেও, ৯ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধির পরেই ক্লাইভ স্থলপথে এবং ওয়াটসন জলপথে

*The loss on Clive's part was so severe, amounting to 120 Europeans, 100 Sepoy and two field pieces ; and his troops were not only dispirited, but blamed the attack as ill-concerted.

Beveridge's History of India, Book III p 559.

ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেন। ইহা পলাশীর যুদ্ধের প্রায় তিনমাস পূর্ব্বের ঘটনা। আর যুগসন্ধিকালের এই চন্দননগরের পটভূমিকাতেই নন্দকুমারের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিচার করা আবশ্যক।

নন্দকুমার ছিলেন এই সময়ে হুগলীর ফৌজদার। তিনি প্রথমে নবাবের অভিপ্রায় অনুসারেই দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন। পরে ভূতপূর্ব্ব ফৌজদার ওমার উল্লার পদচ্যুতি ঘটিলে নবাব স্বয়ং নন্দকুমারের বিচক্ষণতা ও কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাকেই ফৌজদারের পদে নিয়োগ করেন। সুতরাং নন্দকুমারের কর্ত্তব্য ছিল নবাবের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজ যে হুগলী লুণ্ঠন করে, তাহাতে নবাবের মনোভাব তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

ইংরাজ যখন চন্দননগর আক্রমণ করে, চন্দননগর কুঠীর গভর্ণর রোনাণ্ট নবাবকে বুঝান যে যখন ইংরাজ ও ফরাসী নবাবের চক্ষে সমান, তখন ইংরাজ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ফরাসীর সুখশান্তির দিকে নবাব কেন দেখিবেন না, আরও বুঝাইলেন, চন্দননগর অধিকার করিলে মুর্শিদাবাদ আক্রমণও ইংরাজের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। নবাব রোনাণ্টের যুক্তির সার্থকতা বুঝিয়া হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে চন্দননগরে যাইতে বলেন ও রাজা দুর্লভরামকে সৈন্যসহ সেখানে পাঠাইয়া দেন। চতুর ক্লাইভ জগৎ শেঠের সহকারী বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদের দ্বারা নন্দকুমারকে নিবারণ করিতে প্রয়াস পান। উমিচাঁদ জগৎশেঠের অর্থের কথা, ইংরেজের শক্তির কথা, ফরাসীয়দের পরাজয়ের সম্ভাবনার কথা, ইংরাজ ফরাসীয়দের যুদ্ধে কোন পক্ষকে সহায়তা না করাই নবাবের স্বার্থের অনুকূল প্রভৃতি কথা বিশেষভাবে বলায় সফলকাম হয়। নন্দকুমার নিজেও চন্দননগরে যুদ্ধ না করিয়া চলিয়া আসেন, আর রাজা দুর্লভরামকেও চলিয়া যাইতে উপদেশ দেন। ফলে ফরাসীরা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিলেও চন্দননগর ইংরেজের অধিকারে আসে! ইহার পরে পলাশীর পরাজয়ের কথা সকলেই জানে। মীরজাফরও নবাব হইতে চায়, ইয়ার

লতিফও নবাব হইতে চায়, রাজা দুর্লভরামও রায়দুর্লভের কথামতই কাজ করিয়া থাকে। ফলে মোহনলাল, মীরমদন বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মরিলেও, মিরজাফর ইয়ার লতিফ এবং রায়দুর্লভ কেহই নবাবের হিতকাঙ্ক্ষী ছিলনা। আর মিরজাফর কিরূপ কৌশলে মোহনলালকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ইংরাজকে জয়ী করিয়া দেয়, সেই আখ্যান কাহারও অবিদিত নাই। যদিও নন্দকুমার ইংরেজের স্বপক্ষে বা নবাবের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত ছিলেন না, কিন্তু কি কারণে তিনি চন্দননগরে সসৈন্য উপস্থিত হইয়াও কোনরূপ প্রতিরোধ করিলেন না, যাহার ফলে মুর্শিদাবাদের রাস্তা ইংরাজের পক্ষে সুগম হইল, তাহা দুর্ব্বোধ্য। স্বর্গীয় সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেক ঐতিহাসিক নন্দকুমারের এই দোষ স্খালন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা সেই অবস্থায় মহারাজ নন্দকুমারের স্বপক্ষে কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাইতেছি না।

( ৩ )

ইহার পরে সত্য বটে তিনি মিরজাফরের শেষাবস্থায় দেওয়ান হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এতই প্রভুভক্ত ছিলেন যে, ইংরাজ বণিক অতঃপর যখন মিরকাশিমকে নবাবী পদ দেয়, তখন তিনি দুর্ভাগ্যাবস্থায়ও মিরজাফরকে পরিত্যাগ করেন নাই। অতঃপর ইংরাজের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া তিনি বরাবর চতুর ইংরাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। যে কৌশলী ও স্বার্থান্বেষী ইংরাজ স্বার্থের জন্য উমিচাঁদকে চর করিয়া নানারূপ সুবিধা করিয়া লইয়াছে, আবার সুবিধামত সেই চরকেই জাল সন্ধিপত্র সৃষ্টি করিয়া প্রবঞ্চনা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই, তাহাকে চিনিতে নন্দকুমারের বাকী ছিল না, এবং পরবর্ত্তী ইংরাজের জাল জুয়াচুরির প্রতিবাদ করিয়াই অবশেষে তাঁহাকে আত্মদান করিতে হয়।

( ৪ )

চন্দননগরের ব্যাপারের পরে সিরাজদ্দৌলা নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু পদচ্যুত হইয়াও নন্দকুমার—কোনভাবেই সিরাজের বিরুদ্ধে যান নাই, অথবা সেই সময়ের কোনরূপ ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন নাই। ইহার পরের ঘটনা পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজের পতন ও মিরজাফরের বাঙ্গালার নবাবের গদিলাভ।

ক্লাইভের স্বজাতি প্রীতি ও জাতীয়তাবোধ ছাড়াও একটা মহৎ গুণ ছিল যে তিনি লোক চিনিতেন। এদেশীয় বিশ্বাসঘাতক কোনলোককে তিনি দ্বিতীয় বার বিশ্বাস করিতেন না। মিরজাফর সম্বন্ধে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া কোনরূপ অন্যথাচরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু কি উমিচাঁদ, কি নবকৃষ্ণ, কি জগৎশেঠ, কি রায়দুর্ল্ভ, কি কৃষ্ণচন্দ্র, কি রাজবল্লভ—কেহই ক্লাইভের বিশ্বাস লাভে সমর্থ হয় নাই। মোহনলালকে ক্লাইভ যে সম্মান দিতেন, তাহার শতাংশের একাংশও নবাব মিরজাফরকে দেন নাই। এই কারণেই ক্লাইভ উপযুক্ত সম্মানে নন্দকুমারকেই ইংরেজদের দেওয়ান করেন। নন্দকুমারের ন্যায় একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বহুদর্শী অথচ স্বার্থবুদ্ধি শূন্য ব্যক্তিরই তখন সেই অবস্থায় তাহাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

মিরজাফয় যখন সন্ধির সর্ত্তমত টাকা দিতে না পারিয়া ইংরেজকে বর্দ্ধমান, হুগলী ও নদীয়া প্রভৃতি জিলার রাজস্ব ছাড়িয়া দেন, তখন উহা আদায়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন নন্দকুমার। কিন্তু এই সময় হেষ্টিংস ছিলেন মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর রেসিডেন্ট। এই রাজস্বআদায় সম্পর্কে নন্দকুমারের সহিত হেষ্টিংসের বিরোধের সূচনা হয়। কারণ ইতিপূর্ব্বে হেষ্টিংস উহা আদায় করিতেন, এবং তাহাতে বিলক্ষণ তাঁহার উপরি লাভ হইত। বিচক্ষণ ক্লাইভ এই সমস্ত ব্যাপারে দৃঢ়তার সহিত নন্দকুমারকেই সর্ব্বদা সমর্থন করিতেন। কিন্তু এই বিরোধই ক্রমে ধূমায়িত হইয়া নন্দকুমারের জীবননাশের ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়।

নন্দকুমারের সাধুতায় দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারিতনা।

রাজা রামনারায়ণ এবং দেওয়ান রায়তুর্লভের উপর মিরজাফর বিশেষ কুপিত হন। কিন্তু নন্দকুমারের জন্য নবাব তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। নবাব একদিন মস্‌জিদে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে খোজা হাদী নামে একজন কর্ম্মচারীর কয়েকজন লোক নবাবের পথ রোধ করে। নবাব প্রকাশ করেন রাজাতুর্লভরাম তাহাকে খুন করিবার জন্য খোজা হাদীকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

ক্লাইভের কাছে নন্দকুমারের প্রতিপত্তি জানিয়া নবাব মিরজাফর মহারাজ নন্দকুমারকে একখানি পত্র লেখেন, "যদি ক্লাইভের এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পার, তোমাকে জায়গীর এবং উপাধি দিব।" কিন্তু নন্দকুমার তুর্ল্লভরামের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্যই এই চিঠিখানি পর্য্যন্ত ক্লাইভকে দেখাইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ইহাতে নবাব নন্দকুমারের প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ হন এবং তাহাতে নন্দকুমার কলিকাতা চলিয়া যাইতে বাধ্য হন্।

সৌভাগ্যের-সময় নন্দকুমার ন্যায়নিষ্ঠার জন্য মিরজাফরের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলেও, অচিরে মিরজাফর যখন গদিচ্যুত হন, নন্দকুমারই তাঁহার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ্ হন। বিপদারম্ভেই মিরজাফর নন্দকুমারের শরণাপন্ন হন ও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন।

ক্লাইভ বিলাত চলিয়া যাইবার পরে ভান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার গভর্ণর হন। ইনি নন্দকুমারের গুণগ্রামে মুগ্ধ থাকিলেও, হেষ্টিংস সাহেবের প্ররোচনার পরে তাঁহার প্রতি বিরূপ হন। এইবার ইংরাজের স্বরূপ নন্দকুমারের নিকটে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতে লাগিল। আর নন্দকুমার যখন দেখিলেন, উৎকোচের লোভে ভান্সিটার্ট হেষ্টিংস প্রভৃতি কাউন্সিলের সভ্যগণ মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মিরকাশিমকে নবাবী গদিতে অধিষ্ঠিত করিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন এদেশের প্রত্যেক কার্য্য ইংরাজের ইঙ্গিত ছাড়া হইবার সাধ্য বা সম্ভাবনা নাই এবং দেশবাসী প্রত্যেক হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ কোনরূপে সংরক্ষিত হইবারও আর আশা নাই। তাই নন্দকুমার মিরজাফরের দুঃসময়ে

হিন্দু মুসলমাসের স্বার্থে নবাব মিরজাফরকে সাহায্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। মিরকাশিম যখন বহু অর্থ ঘুষ দিয়া শ্বশুরকে সরাইয়া নিজেই নবাবীগদিতে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন তিনিও ইংরাজের বিরুদ্ধে কিছুতেই যাইতে সাহসী হইবেন না, ইহা মনে করিয়া নন্দকুমার বর্দ্ধমানের মহারাজা, বিহারের কামাগর খাঁ এবং মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি শ্রীভট্ট প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, তাহাদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার একখানি চিঠি গভর্ণর ভান্সিটাটের হাতে পড়ায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পরে নন্দকুমার মিরজাফরের সহি ও মোহর সমন্বিত দুইখানি পত্র, ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের কীর্ত্তিকলাপ জ্ঞাপন করিয়া লেখেন। তাহাও ভান্সিটাটের হাতে পড়ে। ফলে গভর্ণর তাঁহাকে নিজের গৃহে আটক রাখেন। কিন্তু নন্দকুমারের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাহাতেও দমিত হয় না। নন্দকুমার এই অবস্থায় এক বৎসর থাকেন এবং ইংলণ্ডীয় আইনঅনুসারে বিচার প্রার্থনা করিয়াও কোন বিচার পান না। গভর্ণরের ভয় ছিল যে নন্দকুমার আটক হইতে মুক্ত হইলেই ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে গমন করিয়া ইংরাজ বিতাড়নের প্রচেষ্টা সফল করিবেন।

অর্থলোভী ইংরাজের সঙ্গে নবাব মিরকাশিমের ও বনিবনাও হয় না। নবাবী পাইয়া প্রজার স্বার্থ দেখিতে তিনি উদগ্রীবহইলেন। ফলে ইংরাজের সহিত শত্রুতা হইল। ইংরাজ আবার বহুটাকা পাইয়া মিরকাশিমের স্থলে অকর্ম্মণ্য ও পঙ্গু মিরজাফরকেই পুনরায় নবাব করেন কিন্তু ইহাতে ইংরাজের প্রতি নন্দকুমারের ঘৃণা আরও বাড়িয়া যায়। তবে মিরজাফর এবার তাঁহার এই বার্দ্ধক্য ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় নন্দকুমারকেই মন্ত্রী করিয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে মহারাজা উপাধি আনাইয়া রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তাহাকেই বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত করেন।

নন্দকুমার এবার ক্ষমতা হাতে পাইয়া ইংরাজ বিতাড়ানোর জন্য অধিক সচেষ্ট হইলেন, এখন কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের ( চেতসিংহের পিতা ) সহিতও

পরামর্শ করেন। এই বিষয়ে দুখানি পত্রও ইংরাজের হস্তগত হয়। যাহাই হউক মিরজাফরের পুনবায় নবাবী লাভের সঙ্গে সঙ্গে নন্দকুমারই কার্য্যতঃ নবাব হইলেন এবং ইংরাজদিগকে শাসন-সংক্রান্ত অনেক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। ইহাতেই ইংরাজের ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি আরও বাড়িয়া গেল।

নবাব মিরজাফর, নন্দকুমারের প্রতি এত বিশ্বাস স্থাপন করেন যে, তাঁহার অন্তিমকালে নন্দকুমারের পরামর্শে তিনি কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়া চিরতরে চক্ষু মুদিত করেন। এই ঘটনা হয় ১৭৬৫ খৃঃ। নন্দকুমার স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং প্রভু মীরজাফরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ নিবন্ধন যে ইংরাজদের প্রবল শত্রু হইয়া উঠেন তাহা স্বয়ং হেষ্টিংস ও স্বীকার করিয়াছেন।

( ৫ )

মীরজাফরের মৃত্যুর পরে মণিবেগমের গর্ভজাত তাঁহার নাবালক পুত্র নজম উদ্দৌলা নবাবী গদিতে উপবেশন করেন। ইংরাজের অন্তরায় মনে করিয়া নন্দকুমারকে আর দেওয়ান করা হয় না। এমন কি তাঁহাকে নিজগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। ইহার পরে ভান্সিটার্ট সাহেব অবসর লইয়া বিলাত যান এবং ক্লাইভ পুনর্ব্বার গভর্ণর হইয়া বাঙ্গলায় আসেন। তিনি নন্দকুমারকে জানিতেন, তিনি আসিয়াই তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন।

কিন্তু হেষ্টিংস-বন্ধু ভ্যান্সিটার্ট সাহেব একটী কর্ম্ম করিয়া নন্দকুমারের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া যান। তিনি কাগজে পত্রে নন্দকুমার সম্বন্ধে কতকগুলি বিরুদ্ধ অতিরঞ্জিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান এবং ; সেগুলি বাঁধাইয়া তাঁহার ভ্রাতা জর্জ ভান্সিটার্টকে কাউন্সিলে উপস্থিত করিবার জন্য দিয়া যান। ক্লাইভ গভর্ণরের আসনে বসিতেই জর্জ ভান্সিটার্ট ঐ সমস্ত কাগজ কাউন্সিলে

* Seir Mutaksherin-Translatim—vol. II. Page 342.

পাঠ করেন। ইহাতে ক্লাইভ নন্দকুমারের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হন। তাহাতে লিখিত ছিল, নন্দকুমারের দিল্লীর বাদশাহ এবং ফরাসীদের সহিত মন্ত্রণা করিবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক্লাইভ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন বাদশাহ হইতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের সনন্দ গ্রহণ করেন, তখন নন্দকুমারকেই দেওয়ানীপদ দেওয়ার কথাছিল, কিন্তু ভান্সিটার্ট লিখিত মন্তব্যে সন্দিহান হইয়া তাঁহার স্থলে মহম্মদ রেজখাঁকে বাঙ্গলার ও রাজা সিতাব রায়কে বেহারের দেওয়ানী দেন। কিন্তু সুচতুর ক্লাইভ অল্পদিন মধ্যেই অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলেন যে নন্দকুমার সম্বন্ধে ভান্সিটার্ট বর্ণিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনস ও বিদ্বেষ প্রসূত। তাই নন্দকুমারের প্রতি আবার তাঁহার বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহাকে ক্লাইভের অনুপস্থিতকালে অন্যান্য গভর্ণর-দের সময়ে অনুষ্ঠিত যাবতীয় অনাচার লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন। নন্দকুমার বর্ণিত সমস্ত তথ্য সম্বলিত তালিকাটি অতঃপর ক্লাইভ বিলাতে লইয়া যান।

ক্লাইভের পরে গভর্ণর হন ভেরেলষ্ট এবং তারপরে আসেন কার্টিয়ার। শেষোক্ত গভর্ণরের সময়েই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়।

ইংরেজ তখন নিজ প্রাপ্য খাজনা আদায়ে ব্যস্ত, আর দেওয়ান রেজাখাঁ আবার দুর্ভিক্ষের সময় বাজারের সমস্ত চাউল ক্রয় করিয়া নিজের হেফাজাত করিয়া রাখেন এবং সময়মত চারিগুণ দরে বিক্রয় করেন। এতদ্ব্যতীত সরকারী তহবিলের অনেক টাকাও তিনি আত্মসাৎ করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস মান্দ্রাজ হইতে গভর্ণর লইয়া আসেন, বিলাতের ডিরেক্টারগণ রেজাখাঁ ও সিতাব রায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও বিচারের ভার দেয় হেষ্টিংসের উপরে এবং এই বিষয়ে তাঁহাকে নন্দকুমারেরই সহায়তা লইতে নির্দেশ দেন।* হেষ্টিংস

*Minute of the Committee of Circuit of Kashimbazar 28th July 1872.

নন্দকুমার বর্ণিত সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লন। এসময়ে হেষ্টিংস নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাবে পরিচয় দেন—

"নন্দকুমার প্রকৃত মন্ত্রী এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর ন্যায় স্বীয় প্রভুর কল্যাণ ও ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। মিরজাফর তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। এ পর্য্যন্ত নন্দকুমার অনুষ্ঠিত কার্য্য আমাদের বিরুদ্ধে গেলেও প্রভুর কল্যাণের জন্যই হইয়াছে, সুতরাং তাহা দোষণীয় নয়, বরং প্রশংসার্হ।"

কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই হেষ্টিংস ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। ১৭৭৪ খ্রীঃ তিনি ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হন। † তাঁহার সমস্ত অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিবার অবকাশ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই, তবে তাঁহার সম্বন্ধে বিলাতে প্রচারিত কাহিনী শুনিয়াই তাঁহার সহাধ্যায়ী কবি কুপার পর্য্যন্ত লিখিতে বাধ্য হয়েন—

> "হেষ্টিংস বালক কালে দেখেছি তোমার
> হৃদয় পবিত্র সদা সরলতাময়,
> সে হৃদয় স্মরি কভু বিশ্বাস না হয়
> এখন হয়েছো তুমি এত দুরাচার।"

রেজাখাঁর ও সিতাব রায়ের নিকট হইতে অনেকটাকা পাইয়া প্রায় দুই বৎসর পরে হেষ্টিংস রেজাখাঁকে অব্যাহতি প্রদান করেন। ইহার পর হেষ্টিংস জমিদারগণের প্রতি এত অত্যাচার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হন যে তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া বিচক্ষণ, হৃদয়বান ও পরোপকারী নন্দকুমারের পরামর্শ ও সহায়তার জন্য তাঁহার স্মরণাপন্ন হইলেন। ইহাতে নন্দকুমার হেষ্টিংসএর বিশেষ বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন, এবং পূর্ব্ব শত্রুতা এবার চতুর্গুণ বর্দ্ধিতাকারে আত্মপ্রকাশ করিল।

---

† ১৭৭৩এর Regulating Act অনুযায়ী।

( ৬ )

রেগুলেটিং য়্যাক্টের ( ১৭৭৩ ) পরে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বায় হন ফিলিফফ্রান্সিস, ক্লেভারিং, মন্‌সন, বারওয়েল। প্রথম তিনজন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া বিলাত হইতে আসেন। হেষ্টিংসের অনুগত ও স্বপক্ষীয় বারওয়েল ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলেন। উক্ত য়্যাক্ট অনুযায়ী কলিকাতায় একটি সুপ্রিমকোর্টও প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার জজ হন স্যার ইলাইজা ইম্পে, চেম্বার্স, হাঈড্, মেষ্টিয়ার। ইম্পে ছিলেন হেষ্টিংসের বাল্যবন্ধু। এই সূত্রে অন্য জজদের সহিতও হেষ্টিংসের ঘণিষ্ঠতা হয়। উপরোক্ত কাউন্সিলের তিনজন মেম্বার এবং চারিজন জজ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর মাসে ছয়মাস সমুদ্রবক্ষে যাপন করিয়া কলিকাতায় চাঁদপাল ঘাটে পৌছেন।

কাউন্সিলের মেম্বারগণ বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের কারণ, জমিদারদের প্রতি অত্যাচার, এবং হেষ্টিংসের সর্ব্বত্র পক্ষপাতিত্ব ও উৎকোচ গ্রহণের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত সমস্ত বিষয় তত্ত্বানুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। বিলাতে তাঁহারা নন্দকুমারের বিচক্ষণতা ও স্বাধীনচিত্ততা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন ; এখানে আসিয়াও নন্দকুমারের প্রতি ( হেষ্টিংসের পক্ষবর্ত্তী কয়েকজন লোক, যেমন নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিং, অত্যাচারী দেবী সিংহ, কান্ত বাবু, রেজাখাঁ প্রভৃতি ব্যতীত ) সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রমাণ পাইয়া নন্দকুমারকেই হেষ্টিংস সম্বন্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন। এই অভিযোগ পত্র কাউন্সিলে পেশ হয় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ। অভিযোগগুলি এই—

( ১ ) রেজাখাঁর অত্যাচার অনুসন্ধান, ও হেষ্টিংস কর্ত্তৃক পরে তাহাকে রেহাই দেওয়া।

( ২ ) নানাস্থানে হেষ্টিংসের উৎকোচ গ্রহণ।

( ৩ ) নজমুদ্দৌলার অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর পরে বালক মোবারক

উদ্দৌলাকে নবাব করিবার সময় তাহার মাতাকে অভিভাবিকা না করিয়া প্রচুর উৎকোচ গ্রহণান্তে বিমাতা মণিবেগমকে অভিভাবিকা নিয়োগ করা।

(৪) নন্দকুমার পুত্র গুরুদাসকে নায়েব দেওয়ান করিবার সময় প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগগুলি সপ্রমাণিত হইলেও, হেষ্টিংস সেদিন রাগে কাউন্সিল ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং তাঁহার অনুগত বারওয়েলকে দিয়া নন্দকুমারের নামে ষড়যন্ত্র করা অপরাধে সুপ্রিমকোর্টে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই ষড়মন্ত্র মূলক অভিযোগে পরে মহারাজা নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মোকর্দ্দমায় কিছু হইবেনা হেষ্টিংস পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া একটী জাল মোকর্দ্দমা সৃষ্টি করেন এবং ইহাতেই নন্দকুমারের চরম দণ্ড হয়। ক্লাইভ জাল করিয়াছিলেন বিশ্বাসঘাতকের সহিত 'শঠে শাঠ্যং আচরণ করিবার জন্য ও ইংরাজজাতির স্বার্থের খাতিরে। আর হেষ্টিংস জাল মোকর্দ্দমার সৃষ্টি করে বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠরত্ন, ইংরেজবিতাড়নে একান্ত আগ্রহশীল, নির্দ্দোষী, ধর্ম্মপ্রবণ, প্রভুভক্ত নন্দকুমারের ন্যায় প্রবল শত্রুর অপসারণের জন্য। তথাপি ইংরাজ বর্ণিত ইতিহাসে উদারচেতা বীরবর ক্লাইবের সহিত সমভাবে ও সমপর্যায়ে যে হীন অভিসন্ধি পূর্ণ হেষ্টিংসের নামও উচ্চারিত হইয়া থাকে, ইহাপেক্ষা ক্ষোভ, ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হেষ্টিংস যদিও মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া নন্দকুমারের সাহায্য লাভ করেন, কিন্তু জমিদারগণ যতই উৎকোচে প্রপীড়িত হইয়া নন্দকুমারের সাহায্য চাহিতে লাগিল, হেষ্টিংস ও তাঁহাকে স্বার্থের অন্তরায় মনে করিয়া ততই শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এমন কি প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে বলেন—

"এখন হইতে আমি তোমার শত্রু হইলাম, ও তোমার অনিষ্ট করিতে ক্ষান্ত হইবনা।"

"I shall persue what is for my own advantage but in this your part is included. Look to it .

( ৮ )

শীঘ্রই একটী সুযোগ উপস্থিত হইল। বুলাকী দাস নামে মুর্শিদাবাদের একজন বিখ্যাত ধনী নন্দকুমারের নিকট ৪৮০২১ টাকার জন্য একখানি দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। সুদে আসলে ইহা প্রায় লক্ষাধিক টাকা হয়। নন্দকুমার অনেক মণিমুক্তা জহরত তাহার কাছে গচ্ছিদ রাখিয়াছিলেন; পরিবর্ত্তে বুলাকী এই দলিল সম্পাদন করিয়া দেয়। পরে বুলাকী দাসের অনেক টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে কারবার উপলক্ষ্যে পাওনা হয়। বুলাকী এই টাকার বরাত দিয়া যান এবং নন্দকুমার সেই টাকা বুলাকি দাসের উত্তরাধিকারের সম্মতিতে কোম্পানী হইতে আদায় করিয়া লন। এই টাকা বহুপূর্ব্বেই আদায় হইয়াছিল; কিন্তু আজ হেষ্টিংস ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিলেন। তিনি কয়েকজন স্বপক্ষভুক্ত মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিয়া এই দলিল জাল বলিয়া অভিযোগ করিলেন। এই বিষয়ে বুলাকী দাসের মোকদ্দমার তদ্বিরকারক মোহন প্রসাদ, বুলাকীর নূতন উত্তরাধিকারী গঙ্গাবিষ্ণুকে দিয়া দাবী উপস্থিত করে। মোকদ্দমায় নন্দকুমার হারিলেই মোহন প্রসাদের লাভ।

নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরদ্ধে যে অভিযোগ আনেন, তাহার পরেই নন্দকুমার জজদের আদেশে ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহার পরেই এই জাল মোকদ্দমা সম্বন্ধে সামান্য তদন্ত হইবার পর বিচার আরম্ভ হইল।

৮ই জুন বিচার আরম্ভ হয় এবং জজ হয় স্যার ইলাইজা ইম্পে, চীফ জাষ্টিস, বরটি চেম্বার্স, S. C. L. Maistre, জন Hyde, এবং মিঃ জন বরিনসন (Foreman) প্রমুখ ১২জন জুরী নির্ব্বাচিত হন। দোভাষীর কাজ করেন ইলিয়ট ও মিঃ জ্যাক্‌সন। মিঃ ইলিয়ট সম্বন্ধে মহারাজার কৌন্সিলি মিঃ Farrer আপত্তি করেন। কারণ ইলিয়টের সঙ্গে নন্দকুমারের শত্রুদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু এই আপত্তি ইম্পে হাসিয়া উড়াইয়া দেন।

বিচার বিষয়ক দলিলের সাক্ষী ছিল তিনজন, মাতাব রায়, মহম্মদ

কামাল এবং বুলাকীর উকীল শিলাবত। প্রথম দুইজন সহিমোহর ( seal ) করেন, শিলাবত্ নাম সহি করে। দলিল ১৭৬৫ সালের, বিচার হইতেছে ১৭৭৫ সালে! ইতিমধ্যে তিনজনেরই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু সরকার পক্ষ অর্থাৎ হেষ্টিংস যে সমস্ত সাক্ষী উপস্থিত করেন, তাহাতে দেখান হয় মাতাব রায় বলিয়া কোন লোক ছিলনা, আর শিলাবত সাক্ষী হইতেই পারে না। আর কামালের শীল তাহার অমতে ও অসম্মতিতে উহাতে দেওয়া হইয়াছে। কামালসিং খাঁ নামক নন্দকুমারের শত্রু হেষ্টিংস ক্রীত একব্যক্তি আসিয়া বলে "আমিই পূর্ব্বে ছিলাম আবদুল মহম্মদ কামাল, দলিলে আমি সাক্ষী হইনাই। মহারাজা নন্দকুমার নবাব মিরজাফরের কাছে আমার দরখাস্ত পেশ করিবেন বলিয়া ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ( অর্থাৎ ১২ বৎসর পূর্ব্বে। আমার শীল মোহর লইয়া যান, তাহার পরে আমি উহা চাহি নাই, ফেরতও পাই নাই।"

তাহাকে জেরা করা হয়—"তোমার নাম মহম্মদ কামাল হইতে কিরূপে কামালউদ্দিন খান হইল?"—সে উত্তর করে, আমাকে পরে এই খিতাব দেওয়া হয় এবং সনদও পাইয়াছিলাম কিন্তু কবে দেওয়া হয়, কিরূপে দেওয়া হয় তাহার কোন কাগজ পত্র নাই।

এই ক্যামালদ্দিন ছিল অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে হিজলীর ইজারাদারী করিত। সুপ্রিমকোর্টের জজদের কাছে হেষ্টিংস ও বারওয়েল সম্বন্ধে সে অনেক অভিযোগ করিয়াছিল। পরে হেষ্টিংসের বশে আসিলে, সে সবকথা উল্টাইয়া দেয়। এই ব্যাপারে ফাউক নামে একজন বিশিষ্ট ইংরাজ এই প্রকার মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য তাহাকে রুল দিয়া প্রহার করে।

অথচ এই কামালউদ্দিনই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী। হেষ্টিংসের মুন্সী এবং নন্দকুমারের প্রবল প্রতিদ্বন্দী মিথ্যাবাদী নবকৃষ্ণ আসিয়া সাক্ষী দেয়, আমি শিলাবতের লেখা চিনিতাম—এই লেখাটা যেন একটু ভাল বলিয়া মনে হয়"—এমন কৌশলে এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যেন, মনের ভাব "ইনি ব্রাহ্মণ, আমি

কায়স্থ, সব কথা কি করিয়া বলি, ছিঃ ছিঃ ব্রাহ্মণের শাস্তি হইতে পারে। অথচ সব মিথ্যাই অবলীলাক্রমে চলিয়া যায় * —

It was a piece of very clever acting. Raja Nava Krishna went into the witness box and coquetted with the Court, coquetted with the formidable rival and coquetted with the opinion such as it then was. He would not say any thing which might bring a Brahmin to the gallows. He would much rather not give out what he knew. But the writing on Bulaki Das's hand for forging which the Maharaja stood indicted although it purported to be in Sillabuts hand was really not in Sillabut's hand and of this Raja Nava Kissen was certain."

আর একজন প্রধান সাক্ষী ছিল খোজা পিক্র। যে ষড়যন্ত্র করিয়া সহোদর গুরগিনের নবাব মিরকাশিমের সেনাপতির সহায়তায় নবাব মিরকাশি-মেরই সর্ব্বনাশ করে, ইনিই সেই আর্ম্মানী খোদা পিক্রস। এই ব্যক্তি প্রথমে ছিল একজন ভাগ্যান্বেষী এবং বাঙ্গলার সেই যুগসন্ধিক্ষণে সে অপর্য্যাপ্ত বিত্ত সঞ্চয় করিয়া লয়। এরাই ছিল বণিক ইংরেজের প্রধান সহায়। নবাবী গদী হস্তান্তর প্রভৃতি ইহাদের সহায়তায় হইত। এহেন ব্যক্তিও সাক্ষী দেয় যে কামালুদ্দিনের চরিত্র খুব ভাল! ইনিও ছিলেন নন্দকুমারের প্রধান শত্রু—মিথ্যা সাক্ষী দিতে একজন বিশেষজ্ঞ। তাহাকে যখন জুরী জিজ্ঞাসা করে—"নন্দকুমারের সহিত নাকি তোমার ভয়ানক শত্রুতা চলিতেছে? উত্তরে সে বলে—তাঁর শত্রুতা থাকিতে পারে, আমার নহে।" আবার দালাল মোহনপ্রসাদ, সদরুদ্দিন এবং জীবনকিশেনের সাক্ষীও খুবই অবিশ্বাসযোগ্য হয়। সদরুদ্দিন নন্দকুমার শত্রু গ্রেহাম সাহেবের চাকর। এই গ্রেহাম ছিল বর্দ্ধমানের রেসিডেণ্ট। পূর্ব্বে রাজস্ব আদায়

*Trial of Maharaga Nand Kumar. Verbatim Report with an Introduction by P. Metter Esq. 1906.

লইয়া তাহার সঙ্গে নন্দকুমারের বিবাদ ছিল। মোহন প্রসাদকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়—

Has Ganga bishen made you any promise in case the prisoner is convicted ?

A. I am to have five percent on the money received.

এই মোহন প্রসাদের সহায়তায়ই হেষ্টিংস মোকর্দ্দমা সৃষ্টি করেন। জীবন কিশেনের সম্বন্ধে সরকারী দোভাষী কিরূপ সহায়তা করে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ক্ষেরী দাসকে অন্য একখানি দলিল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, আর কে উপস্থিত ছিল? উত্তরে সে বলে—কিশেন সহি করিয়াছিল, সে উপস্থিত ছিল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতেই সাক্ষী বলে, "না কিশেন উপস্থিত ছিল না।

Q. Did you see Kishen Jevon sign it ?

A. I do not recollect.

Q. Then how do you know that he signed it all ?

A. I knew nothing his signing it at all.

এখন সহি সম্বন্ধে সে জেরায় কিরূপ বলে দেখা যাউক।—

মোহনপ্রসাদ, সদরুদ্দীন ও জীবন কিশেনের সাক্ষীও খুবই অবিশ্বাসযোগ্য হয়।

"জ্যাকসনের **interpretiton** ঠিক হয় নাই।

এইরূপ কয়জন সাক্ষী দ্বারাই নন্দকুমারের অপরাধ প্রমাণ করা হয়। আর প্রধান সাক্ষী গঙ্গাবিষ্ণুকেও (বুলাকি দাসের উত্তরাধিকারী) ডাকা হয় না, যদিও ডাক্তার উইলিয়ামস পূর্ব্বে বলিয়াছিল যে অসুস্থাবস্থায়ও সে সাক্ষী দিতে পারে।

নন্দকুমারের যে বুলাকীদাসের সঙ্গে কারবার ছিল, তাহা মোহন প্রসাদই স্বীকার করে—

**Q.** Was there any account open between the Maharaga Nand Kumar and Bulaki Das?

**A.** There are debits and credits between them tn Bulaki Das's books to a great amount.

এই সমস্ত অপদার্থ সরকারী সাক্ষী দিয়া মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

অতঃপর যে সমস্ত ছাপাই সাক্ষী দেওয়া হয়, তাহাতে সত্যই মাতাব, মহম্মদ কামাল এবং শিলাবত সম্বন্ধে দলিলের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিচারকগণ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। এক একটি সাক্ষী দেওয়া যায়, অমনি তাহার সাক্ষ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আবার হেষ্টিংসের দলের সাক্ষী উপস্থিত করা হয়। আর চার্জ্জ বুঝাইবার সময় প্রধান বিচারপতি বলেন আসামীর সাক্ষী বিশ্বাস না করিলে আসামীর দোষ প্রতিপন্ন হইবে।

The nature of the defence in this case is such that if it is not believed, it must prove fatal to the party.

আইনের উদ্দেশ্যই হইল অভিযোগের প্রমাণের ভার সরকারপক্ষের উপর; আসামীর সে সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য নাই। আসামীর সাক্ষী মিথ্যা সাব্যস্ত হইলেও, বাদীর অর্থাৎ সরকার পক্ষের দায়িত্বের তাহাতে লাঘব হয়না।

সুতরাং স্যার ইলাইজা ইম্পে আইনের যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল ভ্রমাত্মক নয়, বিদ্বেষ প্রসূত। তাহার বারম্বার বলা উচিত ছিল—যদিইবা আসামীর সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহাতে আসামীর বিরুদ্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধ ধারণা করা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তাহা ভ্রমেও তিনি করেন নাই।

স্যার ইলাইজা ঘটনা সম্বন্ধে যে সমস্ত নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাও বিদ্বেষভাব প্রসূত। চার্জ দিয়াছেন ইম্পে, মত (verdict) দিয়াছে জুরী। সুতরাং জুরী যখন দোষী বলিয়াছে, তখন অন্যজজেরা আর কি করিতে পারেন? অতঃপর ইম্পে ফাঁসীর হুকুম দেন।

এদেশে জালের অপরাধে কখনও ফাঁসী হয় না। কিন্তু বিলাতে তখন হইতে পারিত।

তাই বিলাতের আইন অনুসারে যখন ইম্পে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন, তখন, অন্যজজদের অনুরূপ শাস্তির চেষ্টা করিবার কোন কারণ হইতে পারেনা। সুতরাং অন্যজজরা ইম্পের সহিত একমত হইয়াছেন বলিয়াই যে সমস্ত বিদেশী এবং বিদেশীর অনুগ্রহপ্রার্থী কোন কোন দেশীয় ইতিহাস লেখক নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মত দেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এদেশে ইংরাজ বিচারের প্রারম্ভের ইতিহাস যে ষড়যন্ত্র কলুষিত ও প্রহসন-মূলক এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অন্যায় বিচারে প্রতিষ্ঠিত ইংরাজরাজত্বের উপর দেবতার অভিশাপ অবশ্যম্ভাবী। মিঃ জাষ্টিস বেভারিজ ঠিক ন্যায়পরায়ণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া নন্দকুমারের ফাঁসীকে বিচার ঘটিত হত্যা (Judicial Murder) বলিয়াই মন্তব্য করিয়াছেন। সত্যাশ্রয়ী হিকি তাঁহার বেঙ্গল গেজেটে* লেখেন—"বেশ বিচার! জাল করিয়া হেষ্টিংস হইলেন লর্ড, আর জালের অপরাধে নন্দকুমারের হইল ফাঁসী!"

হেষ্টিংস নিজেও অতঃপর ১৭৮০ খ্রীঃ তাহার বন্ধু সন্দিভাগকে যে চিঠি লেখেন তাহাতে স্পষ্ট আছে—"ইম্পে একসময়ে আমার মান সম্মান সবই রক্ষা করিয়াছিলেন।

"To whose support I was indebted for the safety of the fortune, honour and reputation."

লর্ডমেকলে বলেন, নন্দকুমারকে শাস্তিদেওয়ার কথাই তিনি মনে করিয়াছিলেন। মিঃ বেভারিজও কারণ দর্শাইয়া বলেন, "যে মেকলেই ঠিক আর হেষ্টিংস অসতর্ক মুহূর্ত্তে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে।

"Hastings accidentally confessed that Impay had hanged Nanda Kumar in order to support him.

---

*Clive was made a peer in England, though he committed in Bengal the same crime for which we hanged Maharaja Nandcomar.

Hicky's Bengal Gazette.

জুরীর রায়ের ( verdict ) পরে নন্দকুমারের কৌন্সিলি মিঃ ফারার ফাঁসীর হুকুম বন্ধ রাখিতে এবং যাহাতে উহা দ্বীপান্তরে পরিবর্তিত হয় তজ্জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। একথাও বলিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা, ইহার ফাঁসী কাষ্ঠে আরোহণে সমগ্র হিন্দু সমাজ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইবে।' বাঙ্গলার তদানীন্তন নবাব মোবারক উদ্দৌলাও ফাঁসী রদ করিতে বিলাতে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইম্পে কোন কথা গ্রাহ্য করে নাই। হেষ্টিংসের সেক্রেটারী এবং অনুগ্রহ পালিত বিলি ও (Mr. Billie) ইম্পের সঙ্গে দেখা করে। ফারার যে রবিনসনকে ফাঁসী রদ করিবার জন্য সুপারিস করিতে বলেন, তাহাতে ইম্পে অন্যায়ভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করে। হেষ্টিংস তাহার প্রবল শত্রু নন্দকুমারকে পৃথিবী হইতে সরাইতে যে পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা Political murder, রাজনৈতিক হত্যা ভিন্ন কিছুই নয়।

( ৮ )

ফাঁসীকাষ্ঠে মহারাজার জীবন দান বশিষ্টাদির ন্যায় প্রকৃত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় দেহত্যাগের আদর্শ। নন্দকুমার সত্যই খাঁটি হিন্দুর আদর্শ ছিলেন। মৃত্যুদণ্ডের পরে বিন্দুমাত্র কাতর না হইয়া তিনি আত্মসমর্পণ পূত নির্ভীকতার সহিত সমস্ত কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছিলেন। মহারাজার আমরণ চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক, পরোপকার ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শেষ কয়দিন কারাগৃহে লোকে লোকারণ্য হইত। কেবল কাউন্সিলের সভ্য ফিলিপ ফ্রান্সিস, মনসন এবং ক্লেভারিং প্রভৃতি উদার প্রকৃতি সাহেবেরাই নহেন, অন্যান্য সাহেবেরাও তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে শৈথিল্য করেন নাই। তিনি সকলকেই উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করেন। মহারাজের মনের অবস্থা তদানীন্তন কলিকাতায় সেরিফের * লিখিত বিবরণ পাঠে সম্যক অবগত হওয়া যায়—

"৪ঠা আগষ্ট ১৭৭৫ শুক্রবার আমি সন্ধ্যাকালে মহারাজার সহিত সাক্ষাত করিতে যাই। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে যথানিয়মে সম্বর্দ্ধনা করেন। কথোপকথনে তাঁহার প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ ভাব লক্ষ্য করিয়া আমার সন্দেহ হইল তিনি তাঁহার দণ্ডের কথা বোধ হয় অবগত নহেন।

He spoke with great ease and such seeming unconcern that I really doubted whether he was sensible of his approaching fate.

'আমি দোভাষীর সহায়তায় বলিলাম, "আমি আপনাকে শেষ অভিবাদন করিতে আসিয়াছি, আপনার যে সকল অন্তিম বাসনা আছে, সে সকল পূরণ করিতে আমি চেষ্টা করিব।'

মহারাজা বলিলেন—আপনার সৌজন্যে আমি বিশেষ বাধিত হইয়াছি। কপালে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, "বিধাতার ইচ্ছা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না।

He put his finger to his fore-head-God's will must be done.

কাউন্সিলের সদস্য ত্রয়ের ফিলিপ ফ্রান্সিস, মনসন ও ক্লেভারিংএর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলেন, "আপনি তাঁহাদিগকে আমার একমাত্র পুত্র রাজা গুরুদাসকে রক্ষা করিতে ও ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ কৃরিবেন'। এ সময়ে তাঁহার নিরুদ্বেগ ভাব দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তিনি স্থির ও নির্ব্বিকার কিন্তু আমি এক মুহূর্ত্তও সে মুখের ভাব দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না, নীচে আসিয়া জেলারের কাছে শুনিলাম যে আত্মীয়স্বজনেরা শেষ বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে তিনি স্বাভাবিক ভাবে লেখাপড়া করিয়াছেন ও হিসাবপত্র দেখিয়াছেন।

পরদিবস (৫ই আগষ্ট) শনিবার প্রাতে অন্তিম ব্যবস্থার আয়োজনের কথা শুনিয়া সাড়ে সাতটার সময় জেলে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। দরিদ্র লোকেরা মহারাজের কাছে চির বিদায় লইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া আকাশ বাতাস বিকম্পিত

করিতেছে, কিন্তু তিনি স্থির নিষ্কম্প দিপশিখার ন্যায় অটল। এই দৃশ্য দেখিবার পরে আমার প্রকৃত অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে একপ্রহর সময় লাগিয়াছে এবং তারপর এই ঘটনা লিপিবদ্ধ না করিয়া চিত্ত শান্ত করিতে পারি নাই। আমি আসিয়াছি শুনিয়াই তিনি নীচে আঙ্গিনায় আসিয়া বলেন, "আমি প্রস্তুত, এই বলিয়া তিনি তাঁহার তিনজন ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহারা শোকে অভিভূত, কিন্তু মহারাজা নির্বিকার, কোন উদ্বেগে বা চিন্তার লেশমাত্র মুখে প্রতিভাত হয় নাই। অবশিষ্ট সময় তিনি কেবল নামজপ করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই যখন পাল্কীতে উঠিলেন, একবার চারিদিক চাহিয়া লইলেন কিন্তু তখনও সম্পুর্ণ বিকার রহিত। যখন আমরা বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলাম, বিশাল ময়দান লোকে পরিপূর্ণ কিন্তু কাহারও মধ্যে বিন্দুমাত্র হাঙ্গামার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিলাম না ( **not the least appearance of a riot** ) ফাঁসীকাষ্ঠ দেখিয়াও মহারাজার কোন উদ্বেগের ভাব দেখিলাম না।

I did not obeserve the smallest discomposure in his countenance or manner at the sight of gallows or the any of the ceremonies passing about it.

"কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ত্রয়ের জন্য একটু বিমনা হন, পাছে তাহারা আসিবার পূর্ব্বেই শেষ কার্য্য হইয়া যায়। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা পৌঁছিলে তিনি আবার জপ করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আমি কহিলাম, "সময় প্রায় নিকটবর্ত্তী কিন্তু একটি কথা বলিতেছি, বধ্যমঞ্চে যখন আপনি সম্পুর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া সঙ্কেত করিবেন, তখনই রজ্জু সংলগ্ন হইবে।" তিনি বলিলেন "হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করিব।" আমি বলিলাম হাত বাঁধা থাকিবে, পা নাড়িলেই হইবে। তিনি সম্মত হইলেন।

"পাল্কী বধ্যমঞ্চের নিকটে আনীত হইল, তিনি ধীরে ধীরে মঞ্চসোপানের কাছে উপস্থিত হইলেন। তাহার হস্তদ্বয় বস্ত্র খণ্ডদ্বারা বাঁধা হইল। তিনি

ধীরে ধীরে মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন, পরে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না, কি স্বর্গীয় জ্যোতি মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে! সে প্রশান্ত বদনে যেন উদ্বেগ নাই। ভ্রুক্ষেপ নাই, ভয় নাই, চক্ষুর পলক নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি পাল্কীর ভিতরে গেলাম। তারপরেই মঞ্চোপসারণের শব্দ কানে আসিল। তারপর একটু চিত্তস্থির করিয়া উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, হস্তদ্বয় যে রূপ বাঁধা ছিল সেরূপই বাঁধা রহিয়াছে, মুখমণ্ডলে কিছুমাত্রও বিকৃত চিহ্ন নাই। এই গভীর বিয়োগান্ত ব্যাপারে মহারাজা যেরূপ নির্ভীকতা ও নির্ব্বিকার চিত্তের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন কোনদেশের বা জাতির ইতিহাসেও তাহা নাই। এরূপ ঘটনা গল্পেও কোন লোকের কাছে শ্রবণগোচর হয় নাই।"

গভীর আর্ত্তনাদে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলে পাপক্ষালনের জন্য গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইলেন। অনেকেই অনাহারে রহিলেন, কোন বাড়ীতেই রন্ধন হইল না, অনেক ব্রাহ্মণই কলিকাতা ছাড়িয়া ভাগীরথীর অপরতীরে বালী উত্তরপাড়া, ত্রিবেণী, বংশবাটি প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গেলেন।

এইরূপে ইম্পে হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রে ইংরাজের প্রধান বিচারালয় ব্রাহ্মণের রক্তে প্রথম কলঙ্কিত হইল। পাঠক এই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন পঞ্চদশবর্ষ বালকের প্রতি অন্যায় বিচারের জন্য বিপ্লবীদল পুনঃপুনঃ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। পুস্তকের অনেক অধ্যায়ই সেই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু মহারাজা নন্দকুমারের প্রতি ইংরাজ বিচারের যে নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কাছে এই ঘটনাও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। বস্তুতঃ বিলাতে একবার জজ জেফ্রি অবিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আর বহুদিন পরে ইম্পে ভারতে আসিয়া ধর্ম্মাধিকরণ কলুষিত করিয়া যায়—

Impay sitting as a Judge put a man unjustly to death. No other Judge since the time of Jeffrys has so much disgraced the

British justice as Impay did as the first chief judge of the Supreme Court.

এইভাবে বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনতম বিচারালয়ে সাদাকালোর পার্থক্যে ইংরাজের বিচারালয়ে নির্দ্দোষী, নির্ব্বিকার, ভগবদ্ভক্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হত্যা-সাধন হইল। ইংরাজ আসিয়াছে, যাইতেছে, একেবারে যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মহারাজা নন্দকুমারের গৌরবময় আসন বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরকালই বিরাজ করিবে।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। তৎকালীন জনসাধারণের অন্যায়ের প্রতিবিধানের প্রতি কী হীনতম নির্বীর্য্য ও নিরাসক্ত ভাব। সম-সাময়িক এক ইংরাজ ঐতিহাসিক ঠিকই বলিয়াছেন—"মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী দেখিতে যত লোক সমবেত হইয়াছিল, উহারা যদি একটি করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত, তবে উপস্থিত সরকারী সৈন্যগুলির অস্তিত্ব থাকিত না। কিন্তু জনগণ ছিল একান্ত স্থির, অবিচলিত ও সংহত।"

—

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## তিলক ও চাপেকার

ইংরাজ প্রায় দুইশত বৎসর এই দেশ শাসন করিয়াছে। বাহ্যতঃ—সুসভ্য জাতি হইলেও, ইহার সঙ্কীর্ণ নীতি পূর্ব্বাপর দেশবাসীকে এমন জর্জরিত করিয়াছে যে, ভারতবাসী নিতান্ত সহনাতীত অবস্থা মনে করিয়াই সময় সময় চরম পন্থা-অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে। ইংরাজের অত্যাচার এবং নিষ্করুণ প্রবল রাজ্যলিপ্সাই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ। উদারমতি ক্যানিংএর ন্যায়পরায়ণতায় সে আগুন তখন নির্ব্বাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজ শাসনের বজ্র-আটুনি অতঃপর কঠোরতর হইয়াছিল।

১৮৯৬ সালে বোম্বাই এবং পুণা সহরে বিউবনিক প্লেগ আরম্ভ হয়। প্লেগ সংক্রান্ত আইনের এমন কঠোর প্রয়োগ হইতে আরম্ভ হইল যে, প্লেগ কমিসনার মিঃ র‍্যাণ্ড 'লা মিজারেবলের' 'ইনস্পেক্টর জেফ্রিজের' মত ভালমন্দ (good, bad, indifferent) অবস্থা বিবেচনা করিলেন না। বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক প্রতিবাদ করিতে গিয়া ধৃত হইলেন, সংবাদপত্র সম্পাদকের উপর নিগ্রহ চলিল, মন্দির কলুষিত হইল, স্ত্রীলোক অপমানিত হইল। লোকে মনে করিল—যে অত্যাচার চলিতেছে, ইহার তুলনায় প্লেগে মরা ভাল।

অনাচারে অত্যাচারে সাধারণ মন এত তিক্ত হইল যে, নাচার হইয়া হিংস আত্মপ্রকাশ করিল। এই সময়ে পুণা সহরের দামোদর চাপেকার একটী 'তরুণসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত তিলক তখন 'মারহাট্টা' ও 'কেশরী'র সম্পাদক। তিলকই 'শিবাজী উৎসব' ও 'গণপতি উৎসবের' প্রবর্ত্তক। ছত্রপতি শিবাজীর আদর্শে দেশের স্বাধীনতা ও মহিমময় আদর্শ প্রচার করা তিনি ধর্ম্মকার্য্য মনে করিতেন। শিবাজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়া একটি সভায়

তিনি বলিয়াছিলেন—"আফজলখাঁর হত্যা দুষ্কৃত বিনাশের জন্য হত্যা, সুতরাং গীতানুমোদিত। স্বরাজ আমাদিগকে পাইতেই হইবে।"

অতঃপরে ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলি উপলক্ষ্যে মিঃ রাণ্ড এবং আয়ার্ষ্ট নামক দুইজন শ্বেতাঙ্গ উচ্চ কর্ম্মচারী গভর্ণরের বাড়ী হইতে নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে নিহত হন। কেশরী সম্পাদক তিলক, এই সম্পর্কে ধৃত হন এবং বিচারে তিলকের আঠারো মাস কারাদণ্ড হয়। এই ব্যাপারে নাটু ভ্রাতৃদ্বয় নামে দুইজন জমিদার বহুদিন পর্য্যন্ত অন্তরালে আবদ্ধ থাকেন, আর দামোদর চাপেকার ধৃত হইয়া চরমদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই দামোদর চাপেকারই দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার দমনের জন্য ফাঁসীমঞ্চে প্রাণ দান করিয়া প্রথম শহীদ হন।

তিলকের মোকদ্দমা পরিচালনায় বঙ্গবাসী বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের সময়ে বাঙ্গলার তীব্র গণআন্দোলন, ও দৃঢ়সঙ্কল্প তিলককে অতিমাত্রায় অভিভূত করিয়াছিল। তাই বাঙ্গালা তাঁহাকে অগ্রগামীদলের নেতা হিসাবে বরণ করিয়া লয় এবং ১৯০৬ সালে তাঁহাকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়া বাঙ্গালী শিবাজী উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। তাঁহারই নেতৃত্বে ১৯০৭ সালের কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ হয়। বস্তুতঃ বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্র তখন সমানে তাল রাখিয়া সমভাবে অগ্রসর হইতেছিল।

---

# ক্ষুদিরাম—প্রফুল্ল

বাঙ্গালা এক অপূর্ব্ব দেশ। নদীমাতৃক এই পুণ্যভূমি বিচিত্র সম্ভারে আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে, জীবন এখানে সহজ, সরল, আড়ম্বর হীন। কত স্বার্থত্যাগী মহাপ্রাণ এখানে স্বাধীনতার বেদীমূলে নিঃশেষে প্রাণ দান করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

আজ ভারবর্ষের সর্বত্র স্বাধীনতার শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিভক্ত বাঙ্গালা প্রাণ ভরিয়া সেই আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে পারিতেছে কই? অথচ এই বাঙ্গালই কৃচ্ছ্র সাধনায় সারা ভারতের জন্য স্বাধীনতা রত্ন বহন করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু—যাক সে কথা।

চল্লিশ বৎসরের পূর্বকার সেই পুরাতন বঙ্গ ভঙ্গের কথা বলিতেছি। ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯০৫ এর ৭ই আগষ্ট হইতে, আর বঙ্গ ভঙ্গ হয় সেই বৎসরেই ১৬ই অক্টোবর, ৩০সে আশ্বিন।

বাঙ্গালার প্রতিরোধ শক্তি তখন দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। কিরূপে বাঙ্গালী সেই শক্তি অর্জন করিল তাহা ভাবিবার বিষয়। বাঙ্গালীকে তখন কে উদ্বুদ্ধ করিল? বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্য। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র প্রথমে আনন্দমঠে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—

"দেশ সেবকের মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই গৃহ নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই। এই সুজলা, সুফলা, মলয়জ সমীরণ শীতলা জন্মভূমিই একমাত্র মাতা, জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

বঙ্কিম আরও বলিলেন, "কালস্রোতে ঝাঁপ দাও, কালসমুদ্রে নির্মজ্জিতা মাকে ছয়কোটি মস্তকে, দ্বাদশকোটি ভূজে বহন করিয়া আন, না হয় ডুবিবে, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

এই "আনন্দ মঠ" ও "আমার দুর্গোৎসব" তখন বাঙ্গালার উপনিষদে পরিণত

হইয়াছিল। তখন লোকে এই উপনিষদ-কল্প পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠ করিত, বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইত, রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়িত ও শুনিত, আর "ভগবদ্গীতা" প্রত্যেকের হাতে হাতে থাকিত। যুবকগণ গীতার শ্লোকে শক্তি পাইত—

ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"

এই ভগবদ্গীতাই দেশকর্ম্মীকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিতে সমর্থ হয়, আর প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্র বসু সেই সময়কার নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালী বীরগণ গীতার বাক্য উপলব্ধি করিয়া হাসিতে হাসিতে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় দেহ ছাড়িয়া পরমাত্মায় মিশিয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্ল ছিলেন রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র। ফুলার শাসনকালে টি, এমারসন বঙ্গভঙ্গের সময়ে রঙ্গপুরে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৬ই অক্টোবর ছিল বঙ্গ-ভঙ্গের দিন। ছাত্রগণ উহা প্রতিপালন করায় তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়। উমেশচন্দ্র গুপ্ত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী মুখার্জ্জী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককেও স্পেশাল কনেষ্টবল করা হয়। এই সময়েই রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় এবং নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুদিন সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। প্রফুল্ল এই জাতীয় বিদ্যালয়ের একজন উৎসাহী ছাত্র ছিল। পরে মুরারীপুকুরে আসিয়া বারীন্দ্রবাবুদের সমিতিতে যোগদান করে। তাহার সম্বন্ধে তখনকার যুগান্তর পত্রিকায় সম্পাদক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন "প্রফুল্ল চাকীকে দেখেছিলুম, রংপুর আখড়ার সব চাইতে সেরা ছেলে। সতের আঠারো বছর বয়স। লোহার মত শরীর।" প্রফুল্ল তাহার ক্ষিপ্রকারিতায় ও কর্ম্মশক্তিতে অল্পদিন মধ্যেই সকলের বিশ্বাস ভাজন হইয়া পড়ে।

তাহার নিবাস ছিল বগুড়ার 'কালীতলায়'। প্রফুল্লই ছিল বাঙ্গালার অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ্।

প্রফুল্ল যখন রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়ে, তখন তাহার দুইভ্রাতা ছিল। প্রথম প্রতাপ চন্দ্র চাকী, দ্বিতীয় চারু চন্দ্র চাকী। সে বুড়ীগঞ্জ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া রংপুর গিয়া তাহাদের আত্মীয় দুর্গাপ্রসাদ নাগ উকীলের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করে।

১৯০৬ সালে বারীন বাবু একবার ছোটলাট ফুলার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তজ্জন্য রংপুর যান। সেখানে প্রফুল্লের সঙ্গে তাঁহায় পরিচয় হয়। অতঃপর প্রফুল্ল কলিকাতা সমিতিতে যোগদান করে। কলিকাতা যাওয়ার সময়ে বাড়ীতে কিছু বলিয়া যায় নাই ও বাড়ী হইতে কোন সাহায্যও লয় নাই। তাহার পিতা তখন জীবিত ছিলেন। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে সে তাহার দাদা প্রতাপকে একখানি যে চিঠি লেখে তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"দাদা—

আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমি ভালই আছি। আর আমি ব্রহ্মচর্য্য নিয়াছি। আমি শ্রীমদ্ভবদ্গীতা পাঠ করি, আর পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি।

আপনাদের মঙ্গল চাই। বাবাকে আমার প্রণাম জানাইবেন।

প্রফুল্ল

ক্ষুদিরাম ছিল ডানপিটে একগুয়ে আপন ভোলা ছেলে। পড়াশুনা তাহার বিশেষ কিছু হয় নাই। সে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে (আজকালকার Class IX)এ উঠিয়াছিল।

ক্ষুদিরামের পৈত্রিক বাস মেদিনীপুর জিলার সদর মহকুমার কেশপুর থানার অন্তর্গত বহুবনী গ্রামে।

ক্ষুদিরাম জন্মগ্রহণ করে ১৮৮৯, ৩রা ডিসেম্বর তারিখে। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু, নাড়াজোল রাজার জমিদারীতে তহশীলদারের কাজ করিতেন। ক্ষুদিরামের

ছয় বৎসর বয়সে পিতা এবং মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী উভয়েই মারা যান। ক্ষুদিরামের পূর্ব্বে দুই ভাইএর অকালে মৃত্যু হয়। মরাঞ্চে ছেলে বলিয়া তাহার মা জ্যেষ্ঠাকন্যা অপরূপা দেবীকে তিনটি ক্ষুদ্ গ্রহণে বিক্রয় করেন। এইজন্যই বালকের নাম হয় 'ক্ষুদিরাম'। ক্ষুদকুঁড়ায় ভগবানের প্রীতি, সুতরাং ক্ষুদে কেনা ছেলের প্রতি বুঝি জন্মভুমি মায়েরও বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

দিদি অপরূপা ক্ষুদিরামকে খুব স্নেহ করিতেন। তাহার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে ছিল এবং বড় ছেলে ললিত ক্ষুদিরামের প্রায় সমবয়সী। অপরূপা দেবীর স্বামী অমৃতলাল রায় ছিলেন তমলুকে দেওয়ানী আদালতে সেরেস্তাদার। ক্ষুদিরামের অপর ভগ্নীর নাম ননীবালা।

ক্ষুদিরামের দেহ ছিল সুগঠিত ও ব্যায়ামপুষ্ট। খেলাধূলায় তাহার ছিল পরম অনুরাগ। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাহাকে মারিতেন না, মারিলেই হাতে চোট পাইতেন। পড়াশুনায় তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। বোমার মামলার অন্যতম আসামী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন তমলুকে ক্ষুদিরামের সহপাঠী ছিলেন।

কিছুদিন পরে অমৃতবাবু তমলুক হইতে মেদিনীপুরে বদলী হইয়া আসিলেন। ক্ষুদিরাম ভগ্নী ও ভগ্নিপতির সঙ্গে আসিয়া মেদিনীপুর কলেজিয়েট্ স্কুলে ভর্ত্তি হয়।

অমৃতলাল রায় জজকোর্টে হেডক্লার্কের কাজ করিতেন। ক্ষুদিরাম স্বদেশী করিত আর তিনি সরকারী চাকুরে। ক্ষুদিরাম প্রায়ই স্বদেশী সম্বন্ধে গোলযোগে পড়িত। তখন বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের বেগ মেদিনীপুরকে খুবই প্রভাবিত করিয়াছিল। বরিশাল, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা ও ময়মনসিং প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে প্রবলভাবে আন্দোলন চলিয়াছিল। ক্ষুদিরাম স্বদেশী প্রচার পত্র বিলি করিত এবং সন্ধ্যা, যুগান্তর ও ইংরাজী বন্দেমাতরম বিক্রী করিত। একারণ পুলিশেরও বিষনজরে পড়ে। তখন সকলেই পুলিশের তীব্র কটাক্ষে ভয় পাইত, ওয়েষ্টন সাহেব ( D. Weston ) তখন সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি অমৃতবাবুর প্রতি শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উপায়ন্তর না দেখিয়া ভগ্নিপতি ক্ষুদিরামকে নিজের বাসায় রাখা নিরাপদ মনে না করিয়া অন্য কোথাও যাইতে

আদেশ করেন। এইখানেই কার্য্যতঃ ক্ষুদিরামের সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়। ইতিমধ্যে তাহার বাড়ীখানিও পৈত্রিক ঋণে বিক্রী হইয়া যায়। তবে এই হইতে তাহার পরম ও একান্ত নির্ভর হইলেন সর্ব্বোপনিষদ দোগ্ধা গোপালনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

মেদিনীপুরের নূতন ভাবধারা ওয়েষ্টন সাহেবকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দুই একটী ঘটনায় ক্ষুদিরামের প্রতি পুলিশের বিশেষ সন্দেহ হয়, কিন্তু প্রমাণ না পাওয়ায় চালান দেওয়া সম্ভব হয়না।

ক্ষুদিরাম দেখিতে সুশ্রী ছিল। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামল, ছিপছিপে চেহারা। কিন্তু তাহার সাহস ছিল অসীম। একতলার ছাদ হইতে সে অবলীলাক্রমে লাফাইয়া পড়িত। কোন ভয়কেই সে ভয় বলিয়া জ্ঞান করিতনা। তাহার নির্ভীকতার একটী দৃষ্টান্ত দিব।

মেদিনীপুরে দুইটী মহারাষ্ট্র কেল্লা আছে। উহার একটী কংসাবতী নদীর উপর গোপগড়ে। ইহা গোপগিরি পাহাড়ের উপর সংস্থিত। এই স্থানটী বড় সুন্দর। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিতেন আমি যখন মরিব, আমার অস্থি যেন এখানে প্রোথিত হয়। দ্বিতীয়টি কলেজিয়েট স্কুলের নিকটে। এখানে পূর্ব্বে জিলার জেলখানা ছিল। ইহার একটী গম্বুজঘরে ফাঁসী হইত। জেলটি সহরের বাহিরে স্থানান্তরিত হইলেও, এইঘরে রাত্রিতে কেহ আসিতে সাহস করিতনা। কারণ সকলেই ইহা ভুতের বাসা বলিয়া ভয় পাইত। সাহস পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন রাত্রি ১১টায় ক্ষুদিরাম, শচীন সেন, ধীরেন সেন প্রভৃতি সেখানে যাইতে মনস্থ করিল। ক্ষুদিরামই ছিল দলের অগ্রণী। সে একাই সেখানে গমন করে এবং ফিরিয়া আসিয়া সকলকে বিস্মিত করে।

সমিতির পরিচালক ছিলেন সত্যেন বসু। ক্ষুদিরাম তাঁহার নিকট বুকের রক্ত দিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, শোণিত অর্পণ করিয়াও সে ইংরেজকে দেশ হইতে দূর করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

সন্তোষ দাস ও আশুতোষ দাস, স্থরেন মুখোপাধ্যায়, যোগজীবন ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সমিতির সভ্য ছিল। সন্তোষ, যোগজীবন ও স্থরেন মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্রের মাম্‌লায় সংশ্লিষ্ট ছিল। মুরারী পুকুরের প্রসিদ্ধ হেমচন্দ্র দাস কানুনগুও এখানে আসিতন। ক্ষুদিরাম ছিল বাহিরের কার্য্যে সত্যেনের দক্ষিণ হস্ত। বারীন্দ্র সত্যেনের ভাগিনেয়, তিনিও কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে আসিতেন। ক্ষুদিরামও ঐ সমিতির সভ্য ছিল। ইংরাজের উপরে তাহার বিজাতীয় আক্রোষ ছিল। শয়নে স্বপনে সে মনে করিত ইংরাজ কবে বিদূরীত হইবে। পাঠ্য পুস্তকের ছাইমাটি ইংরাজের শেখানো কথাগুলো তাহার ভাল লাগিত না। তাহার তীব্র ইংরাজ বিদ্বেষ ভাবের একটী উদাহরণ দেই—

ভাগিনেয় ললিতের সঙ্গে যাইতে যাইতে সে একটী শিবমন্দিরে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোককে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে—

—"এখানে এত লোক শুয়ে আছে কেন রে?"

ললিত—"হত্যে দিয়েছে—দুরারোগ্য রোগ সারবার জন্য।"

—তা হ'লে আমাকেও হত্যে দিতে হবে!"

—"কেন মামা তোমার আবার কি ব্যারাম হয়েছে?

—"ব্যারাম নাইরে, হত্যে দেব, কবে ইংরাজ এই দেশ থেকে তাড়িত হয়ে চলে যাবে। শিব যদি সত্যই প্রত্যাদেশ দিতে পারেন, তবে এই সম্বন্ধে আমাকেও আদেশ দিবেন।"

ক্ষুদিরাম ইহার পরে সত্যেন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত আখ্‌ড়ায় থাকিতেন। সত্যেন্দ্র রাজনারায়ণবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। রাজনারায়ণ বাবু বহু দিন বিশেষ যোগ্যতার সহিত মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম সত্যেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথেরও বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিল।

মেদিনীপুরে ঐ আখড়া বা সমিতিতে লাঠি ছোরা প্রভৃতি খেলা হইত। সমিতির নিজস্ব পতাকা (Flags and badges) ব্যবহৃত হইত। ছেলেরা মাথায় পাগ্‌ড়া বাঁধিত। ক্ষুদিরামও মালকোছা করিয়া কাপড় পরিত ও পাগড়া ব্যবহার

করিত, লাঠি খেলিত এবং সর্ব্বদা লাঠি সঙ্গে লইয়া চলিত। মেদিনীপুরে ক্ষুদিরাম অনেকের মনে ভীতি সঞ্চার করিত। বিলাতী জিনিসের দোকানদার তাহার ভয়ে ত্রস্ত ছিল। এক দোকানদার বহুবার নিষেধসত্ত্বেও বিলাতী কাপড় বিক্রী করিত। ক্ষুদিরাম এক টিন কেরাসিন ও কিছু এসিড দিয়া তাহার কাপড়ের গাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

ইহার পরে একটী বোমার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়। মোকদ্দমার সময়ে পুলিসের জনৈক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি (ডেপুটি সুপারিটেডেণ্ট) সাক্ষ্য দেন—"ক্ষুদিরাম ওয়েষ্টসন সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য যোগজীবনের সহিত রিভলবার সহ ঝাড়গ্রামে প্রেরিত হইয়াছিল। মিঃ ওয়েষ্টন ঝাড়গ্রামে গিয়াছিলেন। তবে সে চেষ্টা সাফল্য লাভ করে নাই।"

ঐ পুলিস অফিসারের নাম মিঃ মজরুল হক। এই মোকদ্দমা পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, সুতরাং ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে এই উক্তি গ্রহণীয় নয় বলিয়া বিস্তৃতালোচনা নিস্প্রয়োজন।

১৯০৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্বোক্ত পুরাতন কেল্লায় একটি শিল্প প্রদর্শনী হয়। ক্ষুদিরাম উত্তেজনামূলক কাগজ বিতরণ করে, তাহাতে জনৈক শিক্ষক পুলিস ডাকিয়া তাহাকে ধরাইয়া দেন। যে কনেষ্টবল ধরিতে আসে ক্ষুদিরাম তাহাকে একটি ঘুষি মারিয়া চলিয়া যায়। ইহার পরে তাহাকে রাজদ্রোহসূচক মোকদ্দমায় চালান দেওয়া হয় কিন্তু, দায়রা কোর্টে সরকার অভিযোগ উঠাইয়া লয়। এই ঘটনা সম্বন্ধে 'মেদিনীবান্ধব' কাগজে ক্ষুদিরামের খুব প্রশংসা বাহির হয়।

নাড়াজোলের রাজার সভাপতিত্বে ক্ষুদিরামকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। যে মোকদ্দমার কথা বলিলাম, তাহাতে অপর একটি যুবক, বিজয় ভট্টাচার্য্যও অভিযুক্ত হইয়াছিল, কারণ তাহার পকেটেও ঐরূপ একখানি কাগজ পাওয়া যায়। বিচারে বিজয়ও মুক্তিলাভ করে।

ইহার অল্পদিন পরে মুরারী পুকুর উদ্যান হইতে দুইজন যুবক মজঃফর-

পুরের দায়রার জজ মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য প্রেরিত হয়। মিঃ কিংসফোর্ড ১৯০৭ সালে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন "সন্ধ্যার" সম্পাদক। কাগজখানি ছিল বড় রসাল, তবে লোক শিক্ষার যথেষ্ট উপাদান ছিল। সম্পাদকীয় স্তম্ভে "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" প্রবন্ধ লিখিবার জন্য তিনি অভিযুক্ত হন। এই মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিষ্টার (পরে দেশবন্ধু) হাকিমের কাছে এত রূঢ় ব্যবহার পান যে তিনি আদালত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন, আর আসেন নাই। বন্দেমাতরম সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মোকদ্দমাও কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতেই হইয়াছিল। অরবিন্দবাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যখন প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে আহ্বান করা হয়, তিনি খুব তেজস্বিতার সহিত উত্তর করেন—

"আমি সাক্ষ্য দিবনা এবং শপথ গ্রহণও করিব না"।

বিপিনবাবুকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। মোকদ্দমার দিন অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং বিচারের সময় বিপুল জন সমাগম হইয়াছিল। সুশীল সেন নামক একটী ১৫ বৎসরের যুবক এই জনতার মধ্যে ছিল। শ্বেতাঙ্গ ইন্‌স্পেকটর মিঃ হিউ (Huey) ঘুষি ও বেটন দিয়া সুশীলকে প্রহার করিলে সেও ইন্‌স্পেকটরকে ঘুষিটি বেশ জোরের সহিতই ফিরাইয়া দেয় ও ছাতি দিয়া প্রহার করে। বালক তৎক্ষণাৎ ধৃত হয়, এবং বিচারে মিঃ কিংসফোর্ড তখন তখনই ১৫টি বেত্রদণ্ডে তাহাকে দণ্ডিত করেন। ইহাতে বিশেষ বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বসন্তকুমার মুখার্জ্জি প্রমুখ যুগান্তরের সম্পাদক ও প্রিণ্টারকে তিনিই দণ্ড প্রদান করেন। ফলে স্বদেশ প্রাণ ব্যক্তি মাত্রই মিঃ কিংসফোর্ডের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়। অতঃপরে মিঃ কিংসফোর্ড মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে দায়রা আদালতের জজের পদ পাইয়া মজঃফরপুর বদলী হন। তিনি ২৮শে মার্চ্চ সেখান চর্জ্জ বুঝিয়া লইলেন। কলিকাতার লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল।

মুরারী পুকুর উদ্যানে একটী গুপ্ত বিপ্লবী দল ছিল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন

নেতা, উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উহার অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস কানুনগু ফ্রান্স হইতে বোমা তৈয়ার করিবার প্রণালী শিখিয়া আসিয়া এখানে বোমা তৈয়ার করেন।

মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যাকরা স্থির হইলে প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরে প্রেরিত হয়। প্রফুল্ল সমিতির বিশেষ বিশ্বাসী কর্ম্মী ছিল এবং ইতিপূর্ব্বে রংপুর এবং আরও দুই একটি ডাকাতির প্রচেষ্টায় 'গাইডে'র কাজ করিয়াছে। সত্যেন বসু আর হেমদাস বাবুর পরামর্শ মতে নির্ভীক ক্ষুদিরামের উপরে উক্ত কার্য্যভার অর্পণ করা হইয়াছিল। প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরামকে বারীনবাবু শিখাইয়া দিয়াছিলেন যে ধরা পড়িবার আগে বরং নিজেদের প্রাণ দিবে তবু ধরিবার অবকাশ দিবেনা।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল মজঃফরপুর ধর্ম্মশালায় অবস্থান করে। ধর্ম্মশালাটি কিশোরী মোহন ব্যানার্জ্জির তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি মহাবৎ জমিদারী ষ্টেটের প্রধান কেরাণী ছিলেন। প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরাম একবার মার্চ্চ মাসের শেষ দিকেই মজঃফরপুর যায়। সেখানে কিশোরীবাবুকে গিয়া বলে যে তাদের টাকা চুরি গিয়াছে, কিছুদিন সেখানে থাকিয়া টাকা আনিতে চায়। কিশোরীবাবু ধর্ম্মশালার পিওন রামধারী সিংকে বলিয়া যুবকদ্বয়ের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পরে ২০৲ টাকা প্রফুল্লের নামে আসে। তাহারা ১০ই এপ্রিল ধর্মশালা ছাড়িয়া যায়। ইহার পরে দ্বিতীয় বার গিয়া এই কার্য্য করে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের সঙ্গে বোমা ছিল। উভয়েরই হাতে একটী করিয়া পিস্তলও ছিল।

৩০ এপ্রিল, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কিংসফোর্ড সাহেবের যখন ক্লাব হইতে ফিরিবার কথা তখন তাহার ফিটন গাড়ী মনে করিয়া যুবক দ্বয় বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু গাড়ীটি সাহেবের ছিল না। ঠিক ঐরূপই একখানি গাড়ীতে স্থানীয় কেনেডি সাহেবের পত্নী ও দুহিতা আসিতেছিলেন। রাত্রি অন্ধকার ছিল, কিছুই দেখা যায়নাই, তাই নির্দ্দোষীদের উপরে বোমা

নিক্ষিপ্ত হয়। এই বোমার আঘাতে উভয়েই ভীষণভাবে আহত হন। মিসেস্ কেনেডি তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, আর মিস্ কেনেডি হাসপাতালে প্রেরিত হইবার অল্পসময় মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। সহরে ভয়ানক হুলস্থুল পড়িয়া যায়। নির্দ্দোষী মহিলাদের হত্যার সংবাদে সকলেই বিশেষ মর্ম্মাহত হন।

এইসময়ে মজঃফরপুরের সরকারী উকীল মিঃ মুখার্জ্জির বাড়ীতে তাঁহার দৌহিত্র নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিল। নন্দলাল ছিল কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা। তাহার পিতা নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাব ডেপুটি এবং এক জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা স্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় পুলিস ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিত। ১লা মে তারিখে নন্দলাল মজঃফরপুর হইতে মোকামা ষ্টেসন যাইবার পথে সমস্তিপুরে অবতরণ করে।

যুবকদ্বয় নগ্নপদে ছিল। এই ঘটনার পরেই তাহারা দৌড়াইয়া সোজা মোকামা ষ্টেশনের দিকে যাইতে থাকে। ক্ষুদিরাম দৌড়াইয়া যায়—তিন ষ্টেশন দূরে ওয়ানী ষ্টেশনে, আর প্রফুল্ল চাকী যায় পরের ষ্টেশন সমস্তিপুরে। ওয়ানী ষ্টেশনে ক্ষুদিরাম ১লা মে ধৃত হইয়া মজঃফরপুর নীত হয়। তাহার ক্লান্ত চেহারা, নগ্নপদ ও রুক্ষ চুলে কনেষ্টবলদের সন্দেহ হইয়াছিল। তাহাকে ধৃত করে ফতে সিং ও শিউপ্রসাদ সিংহ নামে দুইজন কনেষ্টবল। সে আত্মহত্যা করিবার অবকাশ পায় নাই। অবলীলাক্রমে সকলের কাছে সে নিজকৃতকার্য্য স্বীকার করে। সেখানে তাহার ফটো তোলা হয় এবং সাক্ষী প্রমাণ সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়।

কি রকমে জানিনা সমস্তীপুরে নন্দলালের সঙ্গে প্রফুল্লের সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। কথোপকথনে নন্দলাল স্বদেশীর দিকে খুব অনুরাগ দেখাইয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করে এবং সে সমস্ত কথা অকপটে তাহাকে প্রকাশ করে। পরে বন্ধু ভাবে আলাপ করিতে করিতে ট্রেণ মোকমায় পৌছাইলে অবতরণ করিয়া উভয়ে কলিকাতাগামী ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

নন্দলাল দারোগা দুইজন কনেষ্টবলকে ও আর দুই একজনকে প্রফুল্লের উপর দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া মজঃফরপুরের পুলিশ সাহেব মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং-এর নিকট যায়

এবং প্রফুল্লকে ধরিবার অনুমতি লাভ করে। প্রফুল্লের ছদ্মনাম ছিল দীনেশ রায়। যখন নন্দলাল দীনেশকে ধরিবার জন্য কনেষ্টবলদ্বয়কে ইঙ্গিত করে, সে বুঝিতে পারিয়া নন্দলালকে ধিক্কার দিয়া বলে—

"ছি, ছি মশহাশয় আপনি না বাঙ্গালী ? বাঙ্গালী হয়ে এইরকম বিশ্বাস-ঘাতকতার সঙ্গে বাঙ্গালীকে ধরিয়ে দিচ্ছেন ? কিন্তু পারবেন না, আমার মুক্ত প্রাণ।" এই বলিয়া বিনা দ্বিধায় সে নিজের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। প্রফুল্লের দেহ তখনই পড়িয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হয়। সেই পূত দেহ পরে মজঃফরপুরে নীত হইলে ক্ষুদিরামকে দেখান হয় এবং সে বলে "প্রফুল্লও আমার সঙ্গে কলিকাতা হইতে একই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। কিন্তু আমিই গাড়ীর দিকে বোমা ছুড়িয়াছিলাম।"

ক্ষুদিরাম নির্ভীক ভাবে পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সকলের কাছেই প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যারট্রূড্ দুই তিন দিনের মধ্যেই অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়া তাহাকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন।

৮ই জুন (১৯০৮) হইতে জজ কার্ণডাফের আদালতে বিচার আরম্ভ হয়। ইনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টেরও বিচারপতি হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষদের আপিলের সময় প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সের সঙ্গে অন্যতম জজ ছিলেন।

সরকারী পক্ষে ছিলেন পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ মান্নুক, জাতিতে আর্ম্মে-নিয়ান। আর উকীল শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী মজুমদার। বিনোদবাবু এখনও জীবিত আছেন। বর্ত্তমান লেখক মিঃ মান্নুকের সঙ্গে দেওঘর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় বিভিন্ন পক্ষে ছিলেন। বিনোদবাবু ক্ষুদিরামের দৃঢ় চিত্ততার খুব প্রশংসা করিতেন। আদালতে ক্ষুদিরাম নির্ভীক ভাবে জবাব দেয়। সে বলে—

"আমার পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, এমন কি খুল্লতাত বা মাতুল কেহই নাই। আমি দ্বিতীয় শ্রেণী ( Class IX ) পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। আমার বিমাতা থাকেন তাঁহার সহোদরের কাছে। আমার একমাত্র দিদি আছেন,

তাঁহার বড় ছেলেই প্রায় আমার সমবয়সী। ভগ্নিপতি অমৃতলাল রায় মেদিনীপুর জজের হেড্ ক্লার্ক। কিন্তু স্বদেশীর জন্য আমাকে তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন।"

তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুমি কি এ কাজের জন্য দুঃখিত?" সে নির্ভীক, নিষ্কম্প স্বরে উত্তর করে,

"দুঃখিত? দুঃখিত কেন হইব? আমিতো গীতা পাঠ করিয়াছি। যাহা সত্য তাহাই আমি বলিয়াছি। সত্য বলিতে আমার বাধা কি?"

সে কোনও উকীল দেয় নাই। কলিকাতা হইতে কোন উকীলও তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে যায় নাই। শ্রী কালিদাস বসু নামে স্থানীয় একজন উকীল তাহার হইয়া কাজকর্ম্ম দেখিতে চাহিলে সে আপত্তি করে নাই। রংপুর হইতে উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গিয়াও জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন।

কালিদাস বসু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া—"তাহার বয়স কম এবং অন্যের ক্রীড়নক রূপে কার্য্য করিয়াছে" বলিয়া অপরাধকে লঘু করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জজ তাহা কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে এইরূপ ছেলে বেশী থাকিলে ইংরাজ রাজত্ব নিরাপদ নয়।

বিচারে জজ সাহেব তাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করেন। সে হাসিমুখে ও অবিচলিতভাবে সেই দণ্ড গ্রহণ করে। তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, শেষের দিনের পূর্ব্বে একবার সে সাধের মেদিনীপুরে যায় এবং দিদি ও ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের একবার শেষ দেখিয়া লয়, কিন্তু তাহার সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই।

জজ কার্ণডাফ সাহেব দণ্ডাদেশ হাইকোর্টের অনুমোদনের জন্য কলিকাতা পাঠাইয়া দেন। এই আপিল হয় মিঃ জষ্টিস্ ব্রেট এবং রাইভসের আদালতে। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু তাহার সম্বন্ধে বেশ যুক্তিপূর্ণ সওয়াল জবাব করেন। বস্তুতঃ তাহার স্বীকারোক্তি ছাড়া সে যে বোমা মারিয়াছে তাহার অন্য প্রমাণ ছিল না। বিশেষতঃ তাহার বয়স তখন খুবই অল্প। এইরূপ স্থলে এইরূপ যুবকের পক্ষে সমস্ত দায়িত্ব লওয়া বিচিত্র নয়।

এরূপ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকা উচিত নয়, তাহাই নরেনবাবু খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। কিন্তু বিচারপতিদ্বয় সে যুক্তি গ্রহণ করেন নাই। তাহার মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখিয়া ১৩ই জুলাই (১৯০৮) রায় দেন।

১১ই আগষ্ট প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় তাহার স্বাধীন আত্মা দেহ হইতে মুক্ত হয়। পবিত্র গণ্ডক নদীর তীরে ক্ষুদিরামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে কালিদাশবাবুকে দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করে, জেলখানার ভিতরে না হইয়া পবিত্র নদী সৈকতে যেন তাহার দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর শবদেহ লইয়া পুলিশ কোনরূপ শোভাযাত্রা করিতে দেয় নাই।

ফাঁসীমঞ্চে সে নির্ব্বিকারভাবে উঠে এবং পা দিয়া নিজেই কাঠখানি সরাইয়া দেয়। পর মুহূর্ত্তেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহার মুখের প্রশান্ত ভাব ও হাসিমুখের ছবিটি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। সেই সময়ে 'প্রবাসী'র স্তম্ভে লিখিত কয়টী কথা এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে—"ইহা সত্য যে দেশভক্তি যেমন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, উহা তেমন করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে নাই। সে মরিয়াছে বীরের মত।" এই শহীদই উনিশ বৎসরের যুবক আমাদের ক্ষুদিরাম।

মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রত্যক্ষদর্শী জেলখানায় তাহার স্থির শান্তভাব দেখিয়া তাহাকে স্বর্গবাসী দেবশিশু বলিয়া মনে করে। ক্ষুদিরাম যেন স্বর্গদূতের মত বলিতে লাগিল—

"ভাই, আমার জন্য কাতর হইওনা—আমি এই জীর্ণ দেহত্যাগ করিয়া পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেছি—

"বাসাংসিজীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

সে অন্যান্য কয়েদীকেও বলিত, মৃত্যুতো একদিন আসিবেই; আগে বালক

ছিলাম, এখন যুবক হইয়াছি, আপনারাতো প্রৌঢ় হইয়াছেন, কয়জন বৃদ্ধও দেখিতেছি, তার পরের অবস্থা মৃত্যু—যুবকের দেহ আর প্রৌঢ়ের দেহ এক নয়। আবার যে বালক ছিল, বৃদ্ধ হইতে তাহার কত তফাত। দেহের অবস্থারই পরিবর্ত্তন হয়, আত্মার বিনাশ নাই—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।"

দেহের বিনাশ ঘটে, কিন্তু আমি একই আছি। মৃত্যুতেও তাহাই থাকিব—

"য এনং বেত্তি হন্তারম্ যশ্চৈনং মন্যতে হতম
উভেই তৌ ন বিজানিতৌ নায়ং হন্তি না হন্যতে।"

আত্মা অচ্ছেদ্য, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য, অশোষ্য, অদাহ্য, ইহাকে শস্ত্র ছেদন করিতে পারেনা, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারেনা, তাপ খিন্ন করিতে পারেনা, বায়ু শুষ্ক করিতে পারেনা।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপ ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

তখন ক্ষুদিরামকে মনে হইয়াছিল ঠিক যেন গিরিশচন্দ্রের 'সৎনামে'র বৈষ্ণবী।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল, কানাই ও সত্যেন্দ্র মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালার যুবকগণ ঝাঁকে ঝাঁকে, লাঠি, গুলি, বেয়নেট তুচ্ছ করিয়া মাতৃভূমির মুক্তির জন্য অকাতরে শোণিত দান করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

লক্ষ বক্ষ চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ
পক্ষী সমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে।

শহীদ ক্ষুদিরাম

শহীদ প্রফুল্ল চাকী

"কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"

আজ স্বাধীনতা লাভের দিনে স্বাধীনতার অগ্রদূতগণের প্রতি কর্ত্তব্য দেশবাসী নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইতে পারেন না।

বহুদিন সুদূর পল্লীতেও রামপ্রসাদী সুরে গান শুনিতাম—

আমায় বিদায় দেমা<br>
ঘুরে আসি।<br>
হাসি হাসি পরবো ফাঁসী<br>
দেখ্‌বে এবার জগৎবাসী।

তারপরে সেই গান স্তব্ধ হইয়াছিল। আবার যেন আকাশে বাতাসে এই গান শুনিতেছি।

---

# মহামান্য তিলক ও ক্ষুদিরাম

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল বোমা লইয়া কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যাকরিতে আসিয়াছিল, এবিষয়ে লোকমান্য তিলক তঁহার সম্পাদিত "কেশরী" পত্রিকায় যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। ১২ই মে তারিখে বাহির হয় "The Country's Misfortune"—"দেশের দুর্ভাগ্য" আর ৯ই জুন বাহির করেন "These remedies are not lasting" এইসব ব্যবস্থায় বেশীদিন লোককে শান্তরাখা যাইবে না।

প্রথমটিতে তিনি লেখেন—

"এই ছেলেরা কোনরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া হত্যা করিতে যায় নাই। নিতান্ত নাচার হইয়াই এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসকগণের যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন, মানুষের ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। বঙ্গভঙ্গের সময় হইতেই লোকের মন বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত। বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর সব বৈধ উপায়ই যখন বিফল হইয়াছে, পণ্ডিত মর্লি (এখন লর্ড) যখন কবুল জবাব দিলেন যে গভর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তনের কোন আশাই নাই, তখন কি শাসকবর্গ আশা করেন যে দেশবাসীর সব অনুরোধ বা প্রার্থনাই আমরা উপেক্ষা করিনা কেন, লাজপত রায়ের মত লোকদের বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত করিনা কেন, সভা শোভাযাত্রা জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিইনা কেন, তবু লোকে নীরবে সবই সহ্য করিয়া যাইবে? বিড়ালকেও যদি খাঁচায় পুরিয়া রাখ, সেও খাঁচার বাহির হইতেই চেষ্টা করিবে, আর বাহির হইয়া খুব জোরের সহিতই তোমার উপরে পড়িয়া তোমাকে আঘাত করিতে চেষ্টিত হইবে। এক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের অবস্থা এই যে, উপর্য্যুপরি প্রত্যাখ্যাত হইয়াই তাহারা এমন অসহিষ্ণু (মরিয়া) হইয়া উঠিয়াছে। স্বরাজ লাভে তাহাদের সঙ্কল্প

দৃঢ়তর হইয়াছে, তারা ভয়াবহ কাজেও ব্রতী হইয়া পড়িতেছে। তাদের সম্মিলিত দাবী অগ্রাহ্য হইলে মজঃফরপুরের ন্যায় কাণ্ড অবশ্যম্ভাবী। তাই বলি এরূপ কাণ্ড নিবারণের উপায়—কর্ত্তাদের কড়া শাসন সংযত করা—"

"However the desire of the people gradually to obtain the rights of Swarayya is growing stronger and stronger and if they donot get rights by degrees, as desired by them, then some people atleast out of the subject population being filled with indignation or exasperation will not fail to embark upon the commission of improper or horrible deeds recklessly......

"Where this duty is disregarded there the occasion of calamities some time or other like that of Muzafferpore is inevitable. If rulers donot want them, they should impose restriction upon their own system of administration."

"বোমা নিক্ষেপের কারণ নির্দ্দেশে করিলে স্বতঃই দেখিতে পাইবে, ঘোর অশান্তি, অত্যাচার ও পীড়নের জ্বালায় অসহ্য হইয়াই তাহারা এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, তাহাদেরও দোষ নাই, সংবাদ পত্রেরও অপরাধ নাই, অপরাধ শাসক বর্গের গোড়ামী, অবহেলা ও তাচ্ছিল্য —

All thoughtful people seem to have formed one opinion as to the cause that gave rise to the bomb party. The bomb party has come into existence in consequence of the oppression practised by the official class, the harrassment inflicted by them and their obstinacy in treating public opinion with recklessness. The bombs exploded owing to the official class having tried the patience of the *Bengalees* to such a degree that the heads of the Bengalee youths became turned. The responsibility of this calamity must therefore be thrown not on the political agitation, writings or speeches, but on the thoughtlessness and the obstinacy of the official class.

ক্ষুদিরামের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় প্রবন্ধ লেখা হয়

**These remedies are not lasting,** শাস্তি প্রদানে এসব বন্ধ হইবেনা, জনগণের যে অধিকার তা না দিয়ে পীড়ন করলে, বিজ্ঞানের—এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের—দিনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ফল ফলিবেই।

"The real and lasting means of stopping the bomb outrage consists in making a beginning to grant the important rights of *Swarajya* to the people. It is not possible for measures of repression to have a lasting effect in the present condition of western sciences and that of the people of India."

কিন্তু মদগর্ব্বিত সরকার এই সব অমূল্য উপদেশ বাণীর প্রত্যুত্তর দিল তিলককে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করিয়া। হাইকোর্টের বিচার আরম্ভ হইল ১৩ জুলাই (১৯০৮) হইতে। বিচারপতি হন জষ্টিস ডাভার ( Davar) আর ইনি পূর্ব্বের মোকর্দ্দমার তিলকেরই পক্ষ সমর্থন করেন। নয় জনের মধ্যে সাতজন জুরী ছিলেন ইউরোপীয়, আর দুইজন দেশীয়। সাতজন অপরাধী বলায় জষ্টিস ডাভার তিলককে ছয় বৎসরের দ্বীপান্তর ও একহাজার টাকা জরিমানার আদেশ করেন। হাসিতে হাসিতে লোকমান্য কারাবরণ করেন।

এই বিচার প্রহসন এমনই কৌতুকাবহ ও মর্ম্মন্তুদ ( tragic-comedy) যে এইখানে ইহার উল্লেখ প্রয়োজন। হাস্যোদ্দীপক—কেননা, জষ্টিস ডাভার বিচারের নামে এমন অবিচার করিয়াছিল, মনে হয় ইংরাজ শাসনযন্ত্র আমাদের দেশীয় চরিত্র কিরূপ জঘন্য এবং দাসসুলভ মনোবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছিল ইহা তাহারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

তিলক নিজ পক্ষ নিজেই সমর্থন করেন এবং জুরীদের রায়ের পরে হাকিম তিলককে জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার কিছু বলিবার আছে ?"

তিলক—হাঁ আছে, জুরীর যাহাই মত হোক না কেন, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। যে মহাশক্তি মানুষ ও জাতীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরই ইচ্ছায় কারাভোগ ও দুঃখবরণ দ্বারা আমি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ

রচনা অপেক্ষা দেশ ও জাতিকে আরও প্রকৃষ্ট উপায়ে সেবা করিতে সমর্থ হইব।"

"All that I wish to say is that in spite of the verdict of the jury I still maintain I am innocent. There are higher powers that rule the destinies of men and nations and I think it may be the will of the Providence that the cause I represent may be benefitted more by my suffering than by my pen and tongue."

এই নির্ভীক এবং বীরত্বব্যঞ্জক উক্তির পরেও বিচারপতি ডাভার যে ব্যবহার করেন সেই ইতিহাস পাঠ করিলে পাঠক কেবল লজ্জায় অবনত হইবে না দাসসুলভ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি কৃপারই উদ্রেক হইবে। জষ্টিস ডাভার বলেন :—

"তিলক, তোমার বুদ্ধি বিভ্রম হইয়াছে, অপরাধের চরম সীমায় তুমি পৌঁছিয়াছ—নতুবা তুমি কেন মনে করিবে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা ন্যায়বুদ্ধি প্রণোদিত? তুমি আরেক বার জেল খাটিয়াছ, এই কিছুদিন পূর্ব্বেই তোমাকে মুক্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহই প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তোমার শিক্ষা হয় নাই। তুমি হিংসামূলক কার্য্য, হত্যা, রাজদ্রোহ প্ররোচিত করিয়াছ। দেশহিতকল্পে আমি মনে করি তোমার দেশ হইতে কিছুদিন বাহিরে থাকাই শ্রেয়ঃ। যাও কিছুদিন দ্বীপান্তর ঘুরিয়া এসো।

"It seems to me that it must be a diseased mind, a most perverted mind that can think that the articles that you have written are legitimate articles to write on political agitation. They are seething with sedition. They preach violence, they speak of murders with approval and the cowardly and attrocious act of committing murders by bombs not only seem to meet with your approval but hail the advent of bomb in India as if

something had come to India for good. As to the sentences, I order that in the interest of the country which you profess to love you should be out of it for the little time of six years".

এই রায় পার্লেমেণ্টে বিশেষভাবে আলোচিত হয় এবং ভারতের আয়ব্যয় ( Indian budget ) সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বেই বিলাতে পৌঁছে। এ সম্বন্ধে তিলকের অনুবর্ত্তী অন্যতম দেশসেবক শ্রীযুক্ত এন, সি, কেলকার মহাশয় "মারহাটা" পত্রিকাতে লেখেন যে "বিচারপতি ডাভার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই মোকদ্দমার কোন তারিখ না ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বিচারকার্য্য শেষ করিয়াছেন, যেন কমন্সসভায় আলোচনার পূর্ব্বেই রায়টি প্রকাশ হয়।"

আদালত অবমাননার জন্য মিঃ কেলকারের চৌদ্দদিনের জেল ও হাজার টাকা জরিমানা দণ্ড হয়।

মোকদ্দমার প্রহসন এই ভাবেই শেষ হইল। তিলকের মোকদ্দমায় ও অন্যায় বিচারে সমগ্র ভারতবাসীকে, বিশেষতঃ বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের অগ্রগামী দলের লোকদিগকে একেবারে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিয়া ফেলিল। অবস্থাতো শান্ত হইলই না, বরং বোমার আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাইল।

---

# কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ

১৯০৫ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় ইতিহাস এমন রোমঞ্চকর ও বৈচিত্র্যময় যে উহার এক একটি ঘটনায় এক একখানি বৃহদাকার উপন্যাস রচিত হইতে পারে। সত্য ঘটনা রহস্যময় কাহিনী অপেক্ষাও অধিক রোমাঞ্চকর। Truth is stranger than fiction—এ কথার সত্যতার জন্য বোধ হয় বেশী দূর যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ১৯০৫-এর বিরাট জনসভা, বঙ্গ ভঙ্গ ও স্বদেশীয়দের প্রতিজ্ঞা ও শপথ, স্বদেশী গ্রহণ বিদেশী বর্জ্জন, পুলিসের লাঠি প্রহারও যুবকগণের লাঞ্ছনা, কত ঘটনাই যে জাতীয় ইতিহাসকে রঞ্জিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৯০৬ সালের বরিশাল সম্মেলনের ছত্রভঙ্গ হওয়া, যুবকগণের উপর অমানুষিক লাঠি চালনা ও মাথা ভাঙ্গার কথায় এখনও শিহরিয়া উঠিতে হয়। তারপরে আসিল সুরাটের জাতীয় মহাসম্মেলন, অগ্রগামী দলের নেতা লোকমান্য তিলকের প্রতি অসম-ব্যবহার ও কংগ্রেসের যজ্ঞভঙ্গ।

এই সুরাটের কাণ্ডের পূর্ব্বেই মেদিনীপুর জিলা সমিতির অধিবেশন হয়। সভাপতি হন মিঃ ক্ষীরোদবিহারী দত্ত। কলিকাতা হইতে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পুরাতন ও নূতন দলের অনেক নেতা সমাগত হইয়াছিলেন। সম্মেলনে একটু বিশেষ গোলমাল হয়। দত্ত সাহেব স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দকে লাঠি লইয়া সভামণ্ডপে যাইতে নিষেধ করায় এই গোলমালের সূত্রপাত। আর স্বেচ্ছাসেবকগণও চাহিয়াছিল যে দত্ত সাহেব যেন সাহেবী পোষাকে সভায় গিয়া উহার নেতৃত্ব না করেন। কিন্তু সভাপতি কিছুতেই দমিলেন না। ফলে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সত্যেন্দ্র নাথ বসু তাঁহার অধিনায়কত্ব সন্তোষ দাসের ( পরে মেদিনীপুর বোমা ষড়্‌যন্ত্র মোকদ্দমার অন্যতম আসামী) হাতে দিয়া অবসর গ্রহণ করে। তাহার প্রধান সাহায্যকারী ক্ষুদিরাম বসুও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসে। এই সত্যেন্দ্র নাথই আমাদের এই

আখ্যায়িকার অন্যতম নায়ক। ক্ষুদিরাম তাহার বাড়ীতেই থাকিত ও তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল।

অতঃপরে মেদিনীপুর সম্মিলনী ভাঙ্গিয়া দুইটি হইল। অগ্রগামী দলের কনফারেন্সে সভাপতি হন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী। 'স্বরাজ' সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে না দেওয়াতেই, কনফারেন্স অবশেষে ভাঙ্গিয়া যায়। এই গোলযোগ সুরাটের যজ্ঞ ভঙ্গেরই পূর্ব্বাভাস। কংসাবতী নদী তীরের দৃশ্য পক্ষান্তে তাপ্তী তীরস্থ সুরাট নগরে প্রবলভাবে ও ব্যাপকভাবে পুনরাভিনীত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার অন্যতম জাতীয় আন্দোলনের পুরোহিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় সহোদর অভয়চরণের দ্বিতীয় পুত্র। ১৯০৭ সালে পূজার সময়ে দেওঘরে তাহাকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রের জ্যৈষ্ঠ সহোদর জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রথমে শিক্ষকতা করিতেন, পরে নাড়াজোলপতি কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। তিনিও খুব শিক্ষিত ও স্বদেশপ্রাণ ছিলেন। অন্য ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ, সুবোধ এবং সরল। ডাক্তার সুবোধ বসুও কংগ্রেসের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। একবার নির্য্যাতিতও হইয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্র সেই সময়ে মেদিনীপুরেই থাকিত। রাজনারায়ণবাবুর বাড়ী চব্বিশ পরগণার বোড়াল হইলেও, তিনি অনেকদিন মেদিনীপুরেই ছিলেন এবং উক্ত জিলাকে নিজ জন্মভূমির ন্যায়ই জ্ঞান করিতেন। দেওঘরেও তাঁহার একটি সুন্দর বাড়ী ছিল।

সুরাট কংগ্রেস পণ্ড করার ব্যাপারে সত্যেন খুব বেশী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বারীন্দ্রবাবু, শ্যামসুন্দরবাবুও সুরাটে গিয়াছিলেন।

যাহাহউক মুরারীপুকুর উদ্যান ও তথাকার গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে সাধারণে কিছু জানিত না, কিন্তু ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পরে।

মজঃফরপুরের ঘটনার পর, ৩২নম্বর মুরারী পুকুর রোডস্থ উদ্যানটি ও অন্যান্য স্থান খানাতল্লাস হয় এবং শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস কানুনগু,

উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জীলাল, নলিনী-গুপ্ত, পূর্ণ সেন প্রভৃতি ধৃত হইয়া বিচারালয়ে প্রেরিত হন। অরবিন্দবাবু গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট্ হইতে। নিম্ন আদালতে প্রথম দফার আসামী ছিলেন উপরোক্ত যুবকগণ ও কানাইলাল দত্ত প্রমুখ ৩৩জন, আর দ্বিতীয় দফায় থাকেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ৮জন। শ্রীরামপুরের গোস্বামী পরিবারের নরেন গোঁসাই প্রথম দফার আসামী ছিলেন। ম্যাজিষ্টেট মিঃ বার্লি আই, সি, এস, বিচারের প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্য্য করেন।

ইতিমধ্যে জুন মাসে ক্ষুদিরামের বিচার হইয়া ফাঁসীর দণ্ড হয়। আর আসামী নরেন গোসাই পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেষ্টের নিকটে স্বীকারোক্তি করে। তাহাতে সে অরবিন্দবাবু প্রভৃতি অনেককে জড়ায় ও গুপ্তসমিতির ভিতরের সমস্ত সংবাদ দেয়। জুন মাসের ২৩ তারিখ হইতে রাজসাক্ষী (approver) হিসাবে তাহার সাক্ষ্য হয়। একরার ব্যতীত রাজার সাক্ষী হইয়া প্রকাশ্য আদালতে নরেন সবকথা প্রকাশ করে। নরেন গোঁসাইর স্বীকারোক্তির জন্যেই সত্যেন্দ্র ধৃত হইয়া উক্ত মোকদ্দমার দ্বিতীয় দফার আসামী হন। সত্যেন অসুস্থতার জন্য প্রায়ই কোর্টে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। তিনি হাঁসপাতালেই থাকিতেন। আর কানাইলালও পেটের পীড়ার ভাণ করিয়া হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হন।

সেনট্রাল জেলে ( বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি ) স্বীকারোক্তির পরে নরেন গোঁসাই থাকিত ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে। সত্যেন নিজেও স্বীকারোক্তি করিবে ভাণ করিয়া নরেন গোঁসাইকে সেখানে খবর দিয়া লইয়া যায়। উদ্দেশ্য, কিভাবে স্বীকারোক্তি করিতে হইবে সত্যেন নরেন গোঁসাইর সহিত পরামর্শ করিবে! খবর দেওয়ার পরে তৃতীয় দিনে সোমবার, ১১ই আগষ্ট, নরেন ইউরোপীয় বন্দী হিগিন্‌সকে লইয়া হাঁসপাতালে সত্যেনের কাছে উপস্থিত হয়। সত্যেনের সঙ্গে কানাইলালও ছিলেন। উভয়েই গুলি করিয়া নরেন গোঁসাইকে মারিয়া ফেলে। হিগিনস সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আহত হয়।

হিগিনস প্রথমে একটু দূরে ছিল। নরেনের চীৎকার শুনিয়া সাহায্যার্থ

আসিয়া কানাইলালের গুলিতে আহত হয়। নরেন প্রথমে হাঁসপাতাল হইতে দৌড়াইয়া ঐ বাটীর বাহিরে দরজা দিয়া একটা গলির ভিতরে প্রবেশ করে। ইত্যবসরে লিনটন নামে অন্য কয়েদী সত্যেনকে ধরিয়া ফেলে। ধস্তাধস্তির সময় সত্যেনের একটি গুলিতে ও বড় রিভলভার হইতে কানাইলালের একটি গুলিতে নরেন গোঁসাই নিহত হইয়া পায়খানার সন্নিকটস্থ নর্দ্দমায় পড়িয়া যায়। অন্য সব কয়েদী চীৎকার শুনিয়া একেবারে পলাইয়া যায়।

ইহার পরেই পাগলা ঘণ্টা বাজিল, বন্দীগণ সেলে প্রবেশ করিলেন, পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন। কানাইলাল, সত্যেন ও ইন্দ্রনাথ নন্দী নামে আর একটি যুবক ধৃত হইল।

ইন্দ্রনাথ এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল না। কিন্তু তখন সে হাঁসপাতালে ছিল। সত্যেন কোন কথাই বলিলনা, কিন্তু কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উন্নত শিরে অবিচলিত চিত্তে উত্তর দিলেন—

'হা আমি ও সত্যেন উভয়েই মেরেছি।'

Magistrate—why did you do so, কেন করেছ ?

কানাই—কেন ? সে বিশ্বাসঘাতক ও দেশ-শত্রু ব'লে।

Because he proved a traitor to the country

Magistrate—ইন্দ্রনাথ তোমাদের কাজের সহায়তা করেছে ?

কানাই—Never—কখনও নয়।

প্রমাণ না হওয়ায় ইন্দ্রনাথকে এই মোকদ্দমায় চালান দেওয়া হয় নাই।

ইহার পরদিনই বিচারের প্রথম অনুসন্ধান পর্ব্ব আরম্ভ হয়। Mr. W. A. Marr I. C. S. মার সাহের আলিপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি দুইদিনের মধ্যে মোকাদ্দমাটি দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়া দিলেন।

আলিপুরের দায়রার জজ Mr F. R, Roe I. C. S. সাহেবের আদালতে ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিচার আরম্ভ হয়। সরকার পক্ষে উকীল ছিলেন শ্রী আশুতোষ বিশ্বাস আর সত্যেনের দিকে থাকেন ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি

বানার্জ্জি ও উকীল নরেন্দ্রকুমার বসু। জুরী থাকেন দুইজন ইংরাজ ও তিনজন বাঙ্গালী—বৈকুণ্ঠ ঘোষ, পন ভট্টাচার্য্য ও আশুতোষ দত্ত। কানাইলাল আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকীল দেন না। মোকদ্দমা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ছিলেন। প্রথমে অভিযোগ পঠিত হইয়া দোষী কি নির্দ্দোষী—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উত্তর দেন,—

"I decline to plead not guilty নির্দ্দোষ বলিতে আমি অস্বীকার করি।"

তুমি কোন উকিল দিবে ?

—না।

অতঃপরে সাক্ষী প্রমাণের পর জজসাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—

তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা কি ঠিক ?

সে উত্তর করে—নরেন গোঁসাইকে আমিই খুন করিয়াছি। সত্যেন সেখানে ছিল বটে কিন্তু খুনের ব্যাপারে কোনরূপে সে লিপ্ত ছিলনা। তাহার সম্বন্ধে আমি তাড়াতাড়ি ভুল বলিয়াছি। আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য নয়। আমি একাই খুন করিয়াছি।

জজসাহেব (পিস্তলটি দেখাইয়া) তুমি এই Revolver কোথায় পাইয়াছিলে ?

কানাই—কোথায় ? এবিষয়ে আপনাকে কি বলিব—ক্ষুদিরামের আত্মা আমাকে পিস্তলটি দিয়া গিয়াছে। The spirit of Khudiram supplied me with the revolver.

প্রঃ। তুমি আর কিছু বলিবে ?

কানাই। না।

কানাইলাল তখন বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছেন এবং পরীক্ষায় পাশও হন। চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের ফরাসী দেশীয় অধ্যক্ষ সাক্ষ্য দেন যে কানাইলালের স্বভাব যেমন ভাল, পড়াশুনায়ও সে তেমনি ভাল।

জজসাহেবের জুরীগণকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দেওয়ার সময়ে কানাইয়ের মুক্তির

উপরই খুব জোর দেন এবং সত্যেন্দ্র সম্বন্ধে তাহার সপক্ষে বিপক্ষে সব কথাই বলেন। জুরীরা প্রায় এক ঘণ্টা পরে আসিয়া তাহাদের মত প্রকাশ করে—

"কানাইলাল হত্যাপরাধে দোষী এবং অধিকাংশ জুরীর মতে সত্যেন্দ্র নির্দ্দোষী।"

বাঙ্গালী তিনজনই নির্দ্দোষ বলার পক্ষে ছিলেন।"

জজসাহেব কানাইলালকে ফাঁসীর দণ্ডে দণ্ডিত করেন, আর সত্যেন্দ্রের বিষয় বিচার করিবার জন্য হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন।

১৫ই, ১৬ই অক্টোবর (১৯০৮) হাইকোর্টের বিচার মিঃ জাষ্টিস কক্স ও সরফউদ্দিনের আদালতে সত্যেনের মোকদ্দমা উঠে। কানাই এর ফাঁসীর ব্যাপারেও হাইকোর্টের অনুমোদন দরকার বলিয়া তাহার বিষয়ও একসঙ্গেই উত্থাপিত হয়। কানাই হাইকোর্টেও কোন উকীল দেয় নাই। সত্যেনের পক্ষ সমর্থন করেন, প্রসিদ্ধ বারিষ্টার পি, এল, রায় ও শ্রীমন্মথ মুখোপাধ্যায় ( পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি )।

১১ই অক্টোবর তারিখে বিচারপতিদ্বয় সত্যেনকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করেন, আর কানাইলালের ফাঁসীর দণ্ডও বহাল রাখেন।

এই দেড়মাস সময় কানাইলাল স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করিতেন। তাঁহার যে কোন দণ্ড হইয়াছে, তাঁহার চেহারা বা মুখ দেখিয়া কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতা মুখেই প্রতিভাত হইত। অধিকন্তু, দণ্ডের দিন হইতে ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ( প্রায় দুইমাসের মধ্যে ) তাঁহার ওজন ৮সের ( ১৬ পাউণ্ড ) বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে যাইত, তাঁহার তখনকার মৃদু, শান্ত ও নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইত। কানাইলাল যেন ইহ জগতের মানুষই নয়। একেবারে দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহা স্থিতধী তাপস—

> "তার প্রাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারও ঋণ
> জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন"

কানাইলালের মা ও জ্যেষ্ঠ সহোদর আশুতোষ দত্ত, পরে ডাক্তার, তাঁহার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ফাঁসীর রায় বহাল হইয়া গেলে মা তাঁহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতেন,—কানাইলাল মাকে বুঝাইয়া উত্তর করিতেন,—"মা আমার জন্য তোমরা কিছু ভেবোনা, আমি বেশ আছি, আমি ভাল জায়গায় যাচ্ছি।"

মা—তোর কী খেতে ইচ্ছা হয় বল্‌তো।

কানাই—যা দরকার তাতো পাচ্ছি মা, এর উপরে আর আমায় কিছুরই দরকার নাই।

ক্রমে শেষের দিন সমাগত হইল। ৭ই নভেম্বর, শনিবার রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত কানাইলাল বেশ স্বচ্ছন্দচিত্তে পড়াশুনা করিয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন।

ভোর পাঁচ ঘটিকায় উঠিয়া তিনি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিলেন। সাড়ে পাঁচটা বাজিতেই পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বম্পস, জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এমারসন ও জেলার, জেলের আফিসে সমবেত হইল। জেলের বাহিরে তিন শত সশস্ত্র পুলিসও উপস্থিত ছিল। দশ মিনিট থাকিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রমুখ উক্তসাহেবেরা তাঁহাকে মৃত্যু পরওয়ানা খানি দেখায়। সে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাবে উহা পড়িতে লাগিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'এ বিষয়ে তোমার কিছু বলিবার আছে ?"

সে তেমনি ভাবেই হাসিমুখে ধীর ভাবে উত্তর করে "কিছু না।"

পেছনের দিকে দুই হাত শৃঙ্খলিত করিয়া ফাঁসীর স্থলে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি তেমনি নির্লিপ্ত ভাবে ধীর পদক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। আদি গঙ্গার অপর পারে তখন শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত কলিকাতা নগরী মুখরিত হইতে লাগিল, কানাইর প্রাণে সেই ধ্বনি জয়ধ্বনির মতই বাজিয়া উঠিল। মনে হইল তাহার কারাকক্ষ হইতে ফাঁসীমঞ্চ পর্য্যন্ত একটী বিরাট শোভাযাত্রা চলিয়াছে, আর উহার নেতা কানাইলাল—মনে হয় তিনি ভাবিতেছিলেন—

"ভক্ত হৃদয়ের রক্তলহরী
মুক্ত হইল কিরে ?"

ছয়টা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে ফাঁসীমঞ্চে নেওয়ার নির্দ্দেশ হইল। তিনি বীরের ন্যায় নির্ভীকভাবে মঞ্চে উঠিলেন। সেই সময়ে দর্শক বৃন্দ ও সংবাদ সেবীগণ তাঁহার বীরত্ব ব্যঞ্জক চেহারা আর দৃঢ় ও উন্নত বদনমণ্ডল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। যখন তাহার গলায় ফাঁসীর রজ্জু পরাইবার সময় হয়, একজন ডোম অগ্রসর হইয়া আসিলে তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন—

"এই রজ্জু কাহাকেও আমার গলায় পরাইতে হইবে না, আমি নিজেই পরিতেছি।"

রজ্জু নিজের গলায় নিজেই পরে তিনি পরাইলেন, দেহে তখন তাঁর দৃঢ়ভাব ও সহাস্য মুখ স্বর্গীয় শোভায় দীপ্তমান। বীর যুবকের সাহস, দৃঢ়তা ও প্রফুল্লতায় শ্বেতকায় বিদেশী শাসকবর্গকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। তার পরে যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল, মুখের হাসিতেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। সে হাসিটি চিতাশয্যায় শয়নকালেও সকলের নয়নগোচর হইয়াছিল। তক্তা সরাইয়া দেওয়া হইল, আর সব শেষ হইয়া গেল—সে হেলিল না, দুলিল না, কাঁপিল না। ডাক্তার নীল মৃত্যু ঘোষণা করিল, জুরীগণ মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে মত প্রকাশ করিল, তার পরে সেই পুণ্য দেহ কানাইলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে অর্পিত হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই বন্ধু বান্ধবসহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জেলের বাহিরে লোকে লোকারণ্য হইল, সমস্ত সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আলিপুরের রাস্তা দিয়া জজকোর্ট রোড ধরিয়া শব বহনকারীরা কালীঘাট রোডে পড়িল। সর্ব্বত্র উলু ও শঙ্খধ্বনি, বন্দেমাতরম ও হরিধ্বনি। ক্রমে শব কালী মন্দিরের সম্মুখে নীত হইল। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা কালীমায়ের চরণামৃত দিয়া কানাইলালের গলদেশে মালা পরাইয়া দিলেন। শ্মশানে আর তিল ধারণের স্থান রহিল না। কানাই-এর দাদা যে কাঠ আনান, ছেলেরা তাহা ফিরাইয়া দিল। তাহারা চন্দনকাঠ লইয়া আসিয়াছিল। স্বেচ্ছায়

সকলে টাকা পয়সা দিতে লাগিল। স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা ছিলেন বিশ্বরঞ্জন দাশ। কেবল চন্দনকাষ্ঠ ও ঘৃতের সাহায্যতায়ই কানাইলালের পূত দেহের দাহকার্য্য চলিতে লাগিল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সমস্ত গগন পরিপূরিত হইল। আর মহিলারা কেবল গঙ্গাজল ও মায়ের চরণামৃত কানাইর মুখে দিতে লাগিলেন। তিন ঘণ্টার মধ্যে সে পুণ্য দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল।

পরবর্ত্তী দৃশ্য বর্ণনার অতীত। শ্মশানে চিতা আর গঙ্গাজলে পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইল না। শব ও কাঠের শেষ ভস্মটুকুও বাকী রহিল না। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেল। অবস্থাপন্ন মহিলারা কেহ রূপার ডিবায়, কেহ কমণ্ডলুতে করিয়া কেহ বা অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া গেল। যে-যাহা পাইল সব কুড়াইয়া নিল। এইভাবে বীর কানাইলাল শত্রুমিত্র, ইংরাজ, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, হিন্দু, মুসলমান সকলের হৃদয় জয় করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

"বীর, জননীরে রক্ত তিলক ললাটে পরাল
পুণ্য ভাগীরথী তীরে।"

এই সময়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অনেক ইংরাজকেও বলিতে শুনিয়াছি—

"কানাইলাল প্রকৃতই বীরপুরুষ—যাহারা যে কাজ করুক, নিজেদের সংহতি নষ্ট করিবার জন্য যে কাপুরুষ সেই গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দেয় সে অবশ্য বধ্য।"

বিদেশীরা যাহাই বলুক না কেন, আমাদের কানে আজ নাট্যসম্রাটগিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলা নাটকে মোহনলালের প্রতি কর্ণেল ক্লাইভের উক্তিই প্রতিধ্বনি হইতেছে:—

"মোহনলাল আপনি বীরপুরুষ। আপনাকে খোলসা দেবার আমার একতার নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি You are a brave soldier, আপনি সত্যই বলিয়াছেন মৃত্যুতে আপনার গর্ব্ব খর্ব্ব হবে না। You are a patriot."

চল্লিশ বৎসর অতীত হইল কানাইলাল দেশদ্রোহীর শাস্তিবিধান করিতে নিজের দেহ হেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আজ স্বাধীনতা লাভের প্রারম্ভে দেশবাসী কি সেই বীরের যোগ্য সম্মান দিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন ?

ক্রমে সত্যেনের অন্তিম দিবস নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল কিন্তু প্রথমে সত্যেন বড় মুসড়িয়া পড়েন। তিনি মনের সাহস হারাইয়া ফেলেন। সত্যেন খুবই আশা করিয়াছিলেন হাইকোর্ট জুরীদিগের মত অগ্রাহ্য করিবে না, তাহাকে নিশ্চয়ই মুক্তি দিবে। কিন্তু তাঁহার আশা নিস্ফল হইল। তাঁহার বিষাদের কারণও এই আশাভঙ্গের দরুণই। তিনি এই অবস্থায় ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকিয়া জেলে আনান। সত্যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"শাস্ত্রীমহাশয়, বলুন তো, কি করে শান্তিতে মরতে পারি ?"

শাস্ত্রী মহাশয়—তোমার বাবা ও জ্যেঠা মহাশয়কে স্মরণ করো। তাঁরাতো খুবই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। পৃথিবীর সব ভাবনা মন হতে অপসারিত করো।

কিছুক্ষণ থাকিবার পরে উভরই প্রার্থনা করেন। সত্যেন ও প্রার্থনা করে:—

"জগদীশ্বর, কৃপা করো—কি করে শান্তিতে মরতে পারি আমায় শিখিয়ে দাও। তোমার কাছে যেতে প্রাণ কাঁদছে, কিন্তু এখনো আমি চিত্ত স্থির করতে পারিনি, কি ক'রে স্থির কর্ব্বো আমায় শিখিয়ে দাও, পরম পিতা"—

শাস্ত্রীমহাশয় অনেকটা সাহস দিয়া আসেন এবং ভগবৎগীতাও কয়েকখানি পুস্তক পাঠাইয়া দেন। তিনি অনুভব করিলেন যে ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিবার জন্ত আরও উপদেশ দরকার !

এদিকে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর স্যার এনড্রু ফ্রেজারকে দরখাস্ত করিয়া কোন ফল হইল না। লর্ড মিণ্টো ভাইসরয়কে আবেদন করিয়াও কোন ফল হইল না।

কিন্তু ক্রমে সত্যেনও তাঁহার চিত্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে ( ১৯শে নভেম্বর ) আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যে শেষ বাক্যালাপ হয়,

শহীদ কানাইলাল

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন

জাগো রে সকল দেশ"
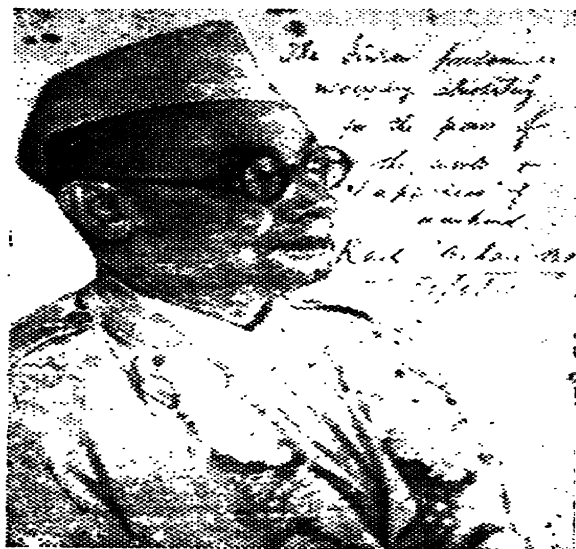
**মহা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু**

"রেখে গেলাম আমার নত মস্তকের প্রণাম

সেই বীরের উদ্দেশে

মর্ত্তের অমরাবতী যার সৃষ্টি

মৃত্যুর মূল্যে দুঃখের দীপ্তিতে"

তাহাতে মনে হইল তাঁহার চিত্তের সাময়িক দুর্ব্বলতা দূর হইয়াছে। এইদিন তাঁহাকে খুব প্রফুল্ল ও প্রসন্নচিত্ত দেখা গিয়াছিল। তিনি বলিলেন—

"আপিল নিয়ে আর ত্যক্ত ক'র না। মাকে দেখতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে, আর সমাজের নিয়মানুযায়ী প্রার্থনাদি ক'রে যেন আমার শব দাহ করা হয়।"

সকলে চলিয়া আসিবার সময়ে তাঁহার প্রফুল্লতা দেখিয়া সকলেই খুব আশ্বস্ত হয়! বিদায় কালে তিনি বলেন, আমি যাচ্ছি, কেউ ভেবো না। আমি এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত—তিনি আমাকে শান্তি দিবেন।"

২১শে নভেম্বর সকলে ৬টায় সত্যেনের অন্তিম কার্য্য শেষ হয়। বড়লাটের শেষ আদেশ ও মৃত্যু পরওয়ানা পড়িয়া শুনানো হইলে তিনি কোন কথা না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া আসেন। ধীর পদক্ষেপে তিনি মঞ্চে উঠিয়া নিজেই ফাঁসীর রজ্জু গলায় পরিলেন। অবশেষে দেহ ঝুলিয়া পড়িল, জানু নড়িয়া উঠিল, সত্যেনের দেহ পিঞ্জর হইতে তাঁহার অমর আত্মা বহির্গত হইয়া গেল।

জেলখানার মধ্যেই আত্মীয় স্বজনের সহায়তায় তাঁহার দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। দেহ জেলখানার বাহিরে আনিবার আদেশ নামাঞ্জুর হয়। তাঁহার চিতার কোন চিহ্ন বা শবভস্মও বাহিরে আনিতে দেওয়া হয় নাই।

সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসীরপর বোমার মামলার অন্যতম আসামী বন্দী শ্রীঅরবিন্দের নিকট জনৈক উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারী এইরূপ মন্তব্য করেন—**Mr. Ghosh, "Satyen died quite like an Englishman".** শ্রীঅরবিন্দ একটু হাস্য করিয়া বলিলেন—**Yes, the highest tribute you can offer—,**

যেদিন কানাইলালের দেহপাত হয়, তাহার পূর্ব্বদিন ও পরের দিন কলিকাতায় দুইটি লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হয়। কলেজ ষ্ট্রীটের ওভারটুম হলে স্যার এনড্রু ফ্রেজারকে যতীন্দ্র রায় চৌধুরী নামক একটি যুবক হত্যার জন্য চেষ্টা করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ছোটলাট বাঁচিয়া যান, এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাপের চেষ্টায় আসামী ধৃত হয়। ইহা ৭ই নভেম্বরের কথা।

৯ই নভেম্বর, যে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুদিরামের সঙ্গী প্রফুল্ল চাকীকে ধরাইবার চেষ্টা করে, সেই নন্দলালকে সার্পেণ্টাইন লেন ও বৌবাজারের সংযোগ স্থলে হত্যাকরা হয়। সে তখন বিবাহ করিবে স্থির হয় এবং খবরটি একটি বন্ধুকে দিবার জন্ত কেরানীবাগানের বাসা হইতে রওনা হয়।

ইতিপূর্ব্বে মজঃফরপুরের ব্যাপারে পুরস্কার স্বরূপ সে এক হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের তো মৃত্যু নাই, তাঁহারা চিরকালই স্ব স্ব কীর্ত্তির মহিমায় আমাদের সম্মুখে দীপ্তিমান থাকিবেন।

কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্বন্ধে ষ্টেট্‌সম্যান, ইংলিসম্যান, বেঙ্গলি, অমৃতবাজার প্রভৃতি সংবাদ পত্র নানারূপ কটূক্তি ও নিন্দা করিতে লাগিল কিন্তু একমাত্র পাইওনিয়ার সংবাদ পত্রই সত্যকথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। পাইনিওর বলে--"হ্যাঁ ইহা খুন বটে, কিন্তু ইহাতে আত্মাহুতি আছে। ইঁহারা নিজেরা মরিবে কিন্তু বহুলোককে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইয়াছে, দেশবাসী যদি তাহাদিগকে, অনুরূপ গ্রীকবীরদের ন্যায় বীরের সম্মান দেয়, তাহা খুবই ন্যায় সঙ্গত হইবে—

"The shooting of the informer is indeed murder, but it is also self devotion. It is a case of his life against the lives of others and the two assasins resolved to sacrifice themselves for the sake of the rest.

If the Bengalis like to enthrone those two youngmen hereafter in popular remembrance as another 'Harmodius' and 'Aristogeiton' it is not easy to see how any one could justly object to the action.

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বকার ইংরাজের কথা আজ সত্যই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

* Pioneer Sept. 4, 1908.

# তৃতীয় অধ্যায়

## বাঙ্গলার বিপ্লব আন্দোলন ও মুরারীপুকুর

বাঙ্গলার বিপ্লব আন্দোলনের সহিত স্বর্গীয় প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ, স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্র কুমার ঘোষের গভীর সম্বন্ধ। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন বাঙ্গালার জাতীয়তার অন্যতম পুরোহিত। তাঁহার দুইটি দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্র বাবু দেশাত্মবোধে মাতামহের নাম রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দ উচ্চশিক্ষিত, গায়কোবার কালেজের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। পরামর্শদাতা হিসাবে তরুণ মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোয়ার তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্গভঙ্গের বিক্ষোভ ও নূতন স্বদেশী আন্দোলনে সমগ্র ভারত তখন আলোড়িত। সেই প্রবাহ শ্রীঅরবিন্দকেও বিচলিত করিয়া ফেলিল। এই সময়ে কলিকাতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। আর তিনিই উহার প্রথম অধ্যক্ষ রূপে, ২৩শে আগষ্ট, ১৯০৬ সেখানে যোগদান করেন। অতঃপর "বন্দেমাতরম্" পত্রিকাও স্থাপিত হয় এবং তিনি উহাও সম্পাদনা করিতেন।

বরোদা মারাঠা রাজ্যভূক্ত। ১৮৯৭ সালে পুনার সরকারী কর্ম্মচারীগণের অনাচারে বিপ্লব আন্দোলন প্রবল হয় এবং পুনার মারাঠী ব্রাহ্মণ দামোদর চাপেকার অত্যাচার নিবারণ কল্পেই প্রথমে হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। অনেক মারাঠী লোকের সহিত অরবিন্দ বাবুর আলাপ হয়। ইতিমধ্যে তিলকও ১৯০৬ সালের জুনমাসে, শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া চরমপন্থীগণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া যান। মিঃ তিলক মনে করিতেন—"শিবাজী কর্ত্তৃক আফজল খাঁর হত্যা ধর্ম্মানুমোদিত" এবং নয় বৎসর পূর্ব্বে এই ভাব প্রচার করিয়া তিনি

কারারুদ্ধ হন। পুনার চিৎপাবন ব্রাহ্মণরা এইভাবেই অনুপ্রাণিত হন। বাঙ্গলার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের গভীর সম্বন্ধ; কারণ সেই সঙ্কট সময়ে (১৯০৫-১৯০৮) ভারতীয় নেতাগণের মধ্যে একমাত্র বাল গঙ্গাধর তিলকই বাঙ্গলার আশা আকাঙ্খায় ইন্ধন প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার লোক মহারাষ্ট্রের ভাবধারায় শ্রদ্ধাবান্। ঠিক এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দও ৭০০শত টাকার বেতন ছাড়িয়া দিয়া মাত্র ১৫০শত টাকার সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া বাঙ্গলার সেবা করিতে জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি পুনার এক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বরোদায় ছিলেন। তিনি মহারাজার দেহরক্ষক ছিলেন। সেই কাজ ছাড়িয়া বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতা জানকী নাথ ঘোষাল মহাশয়ের কন্যা ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী সরলা দেবীর নামে একখানা পত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। সরলা দেবীই "বীরাষ্টমী ব্রতের" প্রবর্ত্তক ছিলেন। যুবকগণের উপর তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল।

অনুমান ১৯০৩।১৯০৪ সালে যতীন্দ্রনাথ প্রথম মিঃ পি মিত্র বার-এট-ল এর সহায়তায় ১০২নং সার্কুলার রোডে একটি ব্যায়াম সমিতির প্রথম পত্তন করেন। কিন্তু এই সময় আর একজন বাঙ্গলার জাতীয়তায় বিশেষ সহায়তা করেন, তিনি ভগিনী নিবেদিতা, পূর্ব্বে ছিলেন মিস্ মার্গারেট নবোল, আইরিষ নিহিলিষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা লইবার পরে ভারতের জাতীয়তা, ধর্ম্ম এবং সমাজের উন্নতি কল্পে দৃঢ়ব্রতী হন। তাঁহাকে যাহারা সেই মহৎ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখনীয়। তাঁহার ভ্রান্তি, সৎনাম, সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম ছত্রপতি শিবাজী, শঙ্করাচার্য্য, তপোবল এবং রাজা অশোক যখন রচিত হয়, তখন নিবেদিতা স্বামীজীর গুরুভ্রাতা গিরিশচন্দ্রের সহিত অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। 'ভ্রান্তিতে' প্রাণভয় তুচ্ছ করিবার কথা আছে, সৎনামে দেশহিতব্রতে

আত্মোৎসর্গ এবং শত্রুর নিকট হইতে কিরূপে সতর্ক থাকিতে হয় তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। নিবেদিতা এই ১০২ নম্বর সার্কুলার রোডের বাড়ীতে সর্ব্বদাই আসিতেন এবং নানাভাবে, বিশেষতঃ পুস্তকাদি দিয়া সমিতির সহায়তা করিতেন।

যতীনবাবুর সমিতি প্রতিষ্ঠার ছয় সাত মাস মধ্যেই বারীন্দ্র আসিয়া সমিতিতে যোগদান করেন। বারীন্দ্র বাবু নিজেই বলেন "অরবিন্দের কাছে আমি দীক্ষা নিয়ে এই কেন্দ্রে এসে যোগদান করি।"

গুপ্তসমিতিতে যোগদান করিবার পূর্ব্বে বারীন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ছিল। সেই সূত্রটি এখানে উল্লেখ করিতেছি, তাঁহার চরিত্রের গুণ দেখাইবার জন্য, তাঁকে অসম্মান করিবার জন্য নয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমি যখন বাঁকীপুরে আইন পাঠে ও শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, বারীন্দ্র বাবু পাটনা কালেজের সম্মুখেই একটি রেষ্টুরেন্ট করিয়াছিলেন। চা, বিস্কুট, পোলাও, মাংস সবই থাকিত। সেখানে তাঁহার নম্র ব্যবহার, হাসিমুখ ও সেবাপরায়ণতায় তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। আমার জনৈক স্নেহভাজন রাসবিহারী দাশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আলাপ হইত ও চিঠিপত্র চলিত। দেশের দুর্দ্দশা ও ইংরাজের অত্যাচার সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি খুব তীব্র ছিল, সেই দিনে তখন তাঁহার উক্তি কাহারও কাহারও নিকট বাগাড়ম্বর বিবেচিত হইলেও উগ্র তখনকার তাঁহার মনোভাবের পরিচায়ক। পাটনা হইতে আমি ১৯০৩ সালের গোড়ায় চলিয়া আসি। তিনিও বোধ হয় সেই সময় কি তাহার পূর্ব্বেই চলিয়া যান এবং সম্ভবতঃ তখন বরোদায় তাঁহার দাদা অরবিন্দের কাছে গিয়াছিলেন। তবে তখনই দেখিতাম তিনি ছিলেন আপনভোলা লোক, এবং তাঁহার পরোপকার প্রবৃত্তি ছিল প্রবল।

বারীন্দ্র বাবু বাঙ্গলায় আসিবার পরে প্রথমে বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্রমে দেশের হাওয়া যেন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইল। ইতিমধ্যে লর্ড কর্জ্জন আসিয়া বাঙ্গলা দেশকে বেশ গরম করিয়া তুলিয়াছেন।

ছাত্রদিগকে চটাইয়া দিয়াছেন। তারপরে বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন ও প্রবল ছাত্রদলন, দুইদিক দিয়া প্রবলভাবে চলিল। বিপ্লবী নেতারা সেই সুযোগ ছাড়িলেন না।

মালিকতলার ৩২ নম্বর মুরারী পুকুর উদ্যান স্বর্গীয় কৃষ্ণদয়াল ঘোষের (অরবিন্দবাবুর পিতা) সম্পত্তি ছিল। উপযুক্ত দলীল সম্পাদন করিয়া বারীন্দ্র এই স্থানটিই সমিতির জন্য নির্দ্ধারিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি নানাস্থানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিতও হইয়া ছিলেন। স্থির হয় এখানে শরীর চর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, এবং রাজনৈতিক শিক্ষা দান করা হইবে। যেমন গীতার পাঠ দেওয়া, আবার কুস্তি, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

সমিতির ভাব প্রচারের জন্য ১৯০৬ সালের ১৮ই মার্চ্চ হইতে যুগান্তর পত্রিকা সাপ্তাহিক পত্র হিসাবে বাহির হইত, এবং ইহাতে সমিতির উদ্দেশ্য, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও কর্ম্ম পদ্ধতি প্রকাটিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সহোদর ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এবং অন্যান্য লেখক ছিলেন পণ্ডিত প্রবর উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু ও অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। যুগান্তরের প্রবন্ধে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ হইত। যত পীড়ন নীতি বাড়িত, যুবকগণ প্রহৃত হইত, প্রবন্ধের ভাষার তীব্রতা তত বাড়িত। আর কাগজের প্রচারও অসম্ভব বাড়িয়া যাইত। পাঁচশত, হাজার হইতে ক্রমে পোনের, বিশ হাজারে পরিণত হয়। যুগান্তরের প্রবন্ধ হইতেই 'মুক্তি কোন পথে' ও 'বর্ত্তমান রণনীতি' নামক পুস্তক দুইখানি অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হয়। যুগান্তরের একটী মেসও ছিল। এখানে সভ্যগণ থাকিতেন এবং রাজনীতি ও কর্ম্মপন্থা আলোচনা করিতেন। এখানে ঐ সমস্ত পুস্তক ভিন্ন, ভবানী মন্দির, 'রুষ জাপান যুদ্ধ' এবং 'আনন্দ মঠ' প্রভৃতি পুস্তক পড়িতে দেওয়া হইত।

অরবিন্দবাবুর 'ভবানীমন্দির' অনূদিত হইয়া সভ্যদের মধ্যে পঠিত হইত। ইংরাজদের কিরূপে হত্যা করিতে হইবে, কিরূপ সুষ্ঠুভাবে এইকার্য্য করিতে

হইবে তাহা ইহাতে লিপিবদ্ধ ছিল। আনন্দ মঠের 'মাতৃপূজা' অধ্যায় ও পড়িতে দেওয়া হইত। 'ভবানী মন্দির' প্রতিষ্ঠা অরবিন্দেরই পরিকল্পনা।

সমিতির অন্যতম সভ্য উল্লাসকর দত্ত, শিবপুর কলেজের অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের পুত্র। বরাবর তাঁহার বেপরোয়া ভাব। ১৯০৪ সালে তিনি রবিবাবুর "স্বদেশী" সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছেন। এত ভিড় যে পুলিস টহল দিয়া প্রহার করিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া লোককে বাধা দিতেছে। উল্লাসকর তখন সিটি কলেজে পড়েন। পুলিশের এই আচরণ তাঁহার অসহ্য হইল। তাঁহার ও পুলিশের মধ্যে কথান্তর হইল। কিন্তু পুলিস প্রবল পক্ষ। উল্লাসকরের পিঠের উপর ছড়ি ও ঘুষি বর্ষিত হইল। কেবল তাহাই নয়, তাঁহাকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস জামিন দিয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া আসেন এবং ঔষধ দিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। ইহার পরে রাসেল সাহেবের ঘটনা। তখন স্বদেশীর দিন, গোয়ালন্দে এক সাহেব এক বাঙ্গালী বাবুকে মারিতে গিয়া নিজেই প্রহৃত হইয়াছেন। উল্লাসকর তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। একদিন অধ্যাপক রাসেল সাহেব বাঙ্গালী ছেলেদিগকে চরিত্রভ্রষ্ট প্রভৃতি নানাকথায় গালি দেয়—। সর্ব্বত্র প্রতিবাদ সভা হইতে থাকে, কিন্তু উল্লাস প্রতিবাদ করিলেন কথায় নয় মুষ্টাঘাতে ও একপাটি ছেঁড়া চটিজুতার সহায়তায়। সাহেব মার খাইয়া নালিশ করে, ফলে উল্লাস উক্ত কলেজ হইতে বিতাড়িত হন। তারপরে কিছুদিন তিনি পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও পড়েন। তারপরে আসিল বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনী। উল্লাস স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, চিত্তরঞ্জন গুহের উপরে অনবরতঃ লাঠির প্রহার চলিতেছে, আর সে কেবল বন্দেমাতম বলিয়া মারই খাইতেছে। এসময় উল্লাসকর নীরবে রহিলেন বটে, কিন্তু অতঃপর পুলিশ ও ইংরাজ দলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। পুলিশের নির্য্যাতন দেখিয়া ইহার পরে বোমা এবং রিভলভারের উপর তাঁহার আগ্রহ স্বতঃই বাড়িয়া গেল। গীতার প্রতিও অসাধারণ নিষ্ঠা জন্মিল।

সমিতির অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস কানুনগো। ইতিপূর্ব্বে তিনি মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যাল কলেজে আসিষ্টাণ্ট ছিলেন। একাজে তিনি তিনবৎসর ছিলেন। তারপরে হন পাউ ও ইনসপেক্টার। তিনি চিত্রবিদ্যা এবং ফটোগ্রাফিও জানিতেন। সমিতির সভ্য হইয়া এক বৎসর পরে প্যারিসে যান এইং বিস্ফোরক বিদ্যা শিক্ষা করেন। অনুমান ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ফিরিয়া আসেন। হেমবাবু বোমা তৈয়ার প্রণালী শিখিয়া আসেন এবং ইলেকট্রিক ড্রাইসেল সংযোগে কিরকমে ট্রেন ফাটান যাইতে পারে তাহাও শিক্ষা করেন। হেমবাবুর নির্ম্মাণ কৌশলে তৈরী বোমা; রেললাইন উড়াইবার উপায় এবং সংগৃহীত কয়েকটি রিভলবারই তখন সমিতির একমাত্র সম্বল ছিল।

১৯০৭ সালের ১৬ই জুন যুগান্তরে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়—"ভয় ভাঙ্গা ও লাঠ্যৌষধং" প্রবন্ধটি বিশেষ উদ্দীপক ছিল। ইহার পরেই পত্রিকা অফিস খানা-তল্লাস হয়। যুগান্তরে কাহারও নাম সম্পাদক ভাবে ছিলনা। তবে ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্ত আসিয়া বলেন "এ কাগজ আমার এবং সম্পাদক আমি। এই প্রবন্ধ আমিই লিখিয়াছি, মুদ্রাকরের কোন দায়িত্ব নাই।" বিচারে ডাঃ দত্তের এক বৎসর জেল হয়। অরবিন্দ তাঁহার এই spiritএর খুব প্রশংসা করেন। আফিস ছিল তখন ৪২ নম্বর চাঁপা তলা ফার্ষ্ট লেনে।

যুগান্তর ব্যতীত সন্ধ্যা, * নবশক্তি প্রভৃতি সংবাদ পত্র উক্ত ভাবপ্রচারে সহায়তা করে। আর সর্ব্বোপরি অরবিন্দবাবু সম্পাদিত বন্দেমাতরমের উদ্দেশ্যের সহিত পরিচয়লাভ করিয়া সকলেই একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। ইংরাজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবেনা ইহাই ছিল উহার উদ্দেশ্য। Absolute autonomy free from British control.

সমিতির নিয়মে সকলকেই নিরামিষাশী হইতে হয়। মাছ, পেঁয়াজ, ডিম প্রভৃতি কিছুই বাগানে ঢুকিতে পারিতনা।

---

* সন্ধ্যা প্রথমে বাহির হয় ১৯০৫ সালের ২০ নভেম্বর, সম্পাদক শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁহার মৃত্যু—২৭ অক্টোবর ১৯০৭

যে সমস্ত ষড়যন্ত্রের জায়গা ছিল তাহার মধ্যে মুরারী পুকুর উদ্যানই প্রধান। তখন হ্যারিসন রোড্ ও কলেজ ষ্ট্রীটের কাছে ছাত্রভাণ্ডার নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহাতেও সমিতির সভ্যগণ মিলিত হইতেন। মেদিনীপুর খানাতল্লাস করিয়াও অনেক জিনিষপত্র পাওয়া যায়। ৩৮।৫ রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট ও রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীটের মোড়ে, ১৫ গোপী মোহন দত্ত লেন, ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট ও শীলস্ লজ দেওঘর, খানাতল্লাস করিয়া কিছু কিছু কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ১৩৪ নম্বর হ্যারিসন রোডেও কিছু কিছু বিস্ফোরক পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল। এবং তাহাতে উল্লাসকর দত্ত, অশোক নন্দী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ধরণীনাথ গুপ্ত প্রভৃতির ৭ বৎসর জেল হয়।

বারীন্দ্রদের ষড়যন্ত্রের চেষ্টা সম্বন্ধীয় যে কয়টি ঘটনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা সবই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রথমে বরিশালে লাটফুলারকে হত্যার চেষ্টা, রঙ্গপুরে অনুরূপ চেষ্টা, দুইটিই বিফল হয়। বারীন্দ্রনাথ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। পরে রংপুরে একটী বিধবার বাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পূর্ব্বেই পুলিস আসিয়া পড়ে। হাসডাঙ্গা মোহান্তের বাড়ীতে ডাকাতির কথা হয়, কিন্তু সুযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ছোট লাট স্যার এণ্ড্রুফ্রেজার এর গাড়ী উল্টাইয়া দেওয়ার জন্য চন্দননগরে দুইবার চেষ্টা হয়। কিন্তু কোনটাই সফল হয় নাই। মেদিনীপুর জেলার নারায়ণ গড়েও এইরূপ চেষ্টা করা হয়, তাহাও ব্যর্থ হয়। গাড়ীর কিছুই হয় না, তবে ইঞ্জিন খানির সামান্য চোট লাগিয়াছিল। আসামী ধরিবার জন্য ৫০০০০৲ পুরস্কার ঘোষণা হয়। টাকার লোভে পুলিশ নির্দ্দোষ কয়েকজন কুলীকে ধরিয়া চালান দেয়। বিচারে তাহাদের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। কিন্তু বারীন্দ্র প্রভৃতির বিচারের পর তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। কুষ্টিয়ায় পাদরী হিকেন বোথামকে হত্যা করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মজঃফরপুর কিংসফোর্ডকে হত্যাকরার চেষ্টাও বিফল হয়। কিংসফোর্ডের স্থানে দুইজন মহিলা মারা যান। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মজঃফর পুরের ঘটনার পরেই মুরারীপুকুর উদ্যান প্রভৃতি স্থান

খানাতল্লাস করা হয়। বাগানের সকলেই ধৃত হন। বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্র কুমার বুঝিতে পারিয়া বলেন, "আমার কাজ শেষ" My mission is over. তিনি মন হইতেই বিপ্লবের ভাব বিদূরীত করেন।

কার্য্যসম্পাদনের ফলাফল দেখিয়া মনে হয়, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ বাবুর মোকদ্দমার সমর্থন কালে মুরারীপুকুরের কার্য্য যে একটা খেলনা-বিদ্রোহ বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহাই ঠিক। নেতার সরলতা বশতঃ এখানকার গুপ্তভাবও সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইত না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্যাপক কার্য্য প্রচেষ্টা না হইলেও যে উচ্চ প্রেরণা এবং স্বাধীনতার ঐকান্তিক আগ্রহ লইয়া দেশহিতব্রত বীরগণ আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। যে উচ্চপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, কানাই লাল দত্ত ও সত্যেন বসু প্রভৃতি জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় হেলায় দেহত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, সে ভাবের প্রেরণা একান্তই দুর্লভ। ইহার পরে হয়ত বহু স্থানে বিপ্লবাত্মক কার্য্য আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু দেশহিতব্রতে হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মুরারীপুকুর উদ্যান সমিতিতে এই বীর সন্ন্যাসীদের মধ্যে তখন যেরূপ ছিল তাহা নিতান্তই দুর্লভ। ইহা নিশ্চিত আদর্শ স্থানীয়।

দ্বীপান্তর হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া বারীন বাবু এরূপ কার্য্য নির্ব্বাহের ফল বিষময় বলিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের উদ্ভাবিত স্বাধীনতা আন্দোলনও ভাল চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহার নীতি ও ভাবধারায় যত পরিবর্ত্তনই আসুক না কেন, বাঙ্গলার বিপ্লবাত্মক কার্য্যের তিনিই যে প্রথম প্রবর্ত্তক ও গঠন কর্ত্তা, এ বিষয়ে ইতিহাস বরাবরই তাঁহাকে যোগ্য সম্মান দিতে বাধ্য হইবে।

মুরারীপুকুর উদ্যানের খানাতল্লাস হয় ২রা মে ১৯০৮। ৩রা ও ৪ঠা মে অনেক স্থানে খানা তল্লাস হয়। ৪ঠা মে তারিখে আলিপুরের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লির কাছে ১৪ জন ধৃত ব্যক্তিকে হাজির করা হয়। চারজন তাঁহার কাছে অপরাধ স্বীকার করিয়া বিবৃতি দেয়। ইহারা বারীন, উল্লাসকর, উপেন্দ্র, হৃষিকেশ। দুই কারণে তাঁহারা এইরূপ বিবৃতি দেন। প্রথম তদন্তকারী ইনস্পেকটার

রামসদয় মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্র দাস বাবুর প্রদত্ত একটা মিথ্যা বিবৃতি দেখাইয়া বিবৃতি বাহির করে। এই সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নির্ব্বাসিতের আত্মকথায় লিখিয়াছেন, "ডেপুটি সুপারিণ্টেডেট আমাদিগকে দিদিশাশুড়ীর মত আদর যত্ন করিয়া তুলিলেন। একদিন একখণ্ড হাতে লেখা কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া মহা উৎসাহে বলিলেন—"এই দেখ বাবা, হেমচন্দ্রের Statement. তিনি আমাদের যাহা শুনাইলেন তাহা একেবারেই তাঁহার মনগড়া। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে, সমস্ত ব্যাপারটা যে আমাদের নিকট হইতে স্বীকার উক্তি বাহির করিবার জন্য অভিনয় মাত্র তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা দুই একটা ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া সে রাত্রির জন্য নিষ্কৃতি পাইলাম।" যাহা হউক ধরা পড়িবার পরই বারীন্দ্র বলেন আমাদের যাই হোক, আমরা কি করিতেছিলাম দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার"। আর উল্লাস কর বলেন—"অনেক নির্দ্দোষী লোককে ধরা হইয়াছে, অন্ততঃ তাঁহাদের বাঁচাইবার জন্য আমরা বিবৃতি দিব"।

ইহাদের স্বীকার উক্তি যে উচ্চভাব প্রণোদিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল যখন নরেন গোঁসাই সত্যই একদিন রাজসাক্ষী হইয়া (২৩ জুন) সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়াইল। ইতিপূর্ব্বে নরেন গোঁসাইকে ইউরোপীয়ন ওয়ার্ডে পৃথকভাবে রাখা হইয়াছে বলিয়া সকলে এইরূপ একটা আশঙ্কার কথা মনে করিতেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ তাহাকে দেখিয়া এক অরবিন্দবাবু বাদে সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিলেন বোধ হইতে লাগিল যেন পিঞ্জরাবদ্ধ অসংখ্য শার্দ্দূলের সমবেত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এক সঙ্গে তাহার উপরে নিবদ্ধ হইয়াছে। সে অবলীলাক্রমে অরবিন্দ বাবু, সুবোধ মল্লিক, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, সত্যেন, প্রফুল্ল চাকী প্রভৃতি সকলকে জড়াইয়া এক স্বীকার উক্তি করিল। সাক্ষী হইবার পরে সকলের সেদিন আনন্দ দেখে কে? জেলখানায় যাইবার সময়ে তাঁহারা যেন বিজয় গর্ব্বে বন্দেমাতরম্

বলিতে বলিতে বাসে উঠিলেন এবং সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া রাস্তা দিয়া গাইয়া যাইতে লাগিলেন—

দিন পর দিন জুলুম হোতা জাতা ভাইয়ো।
জঙ্গি জোওয়ান জল্‌দি লও হাতিয়ার, জল্‌দি লও হাতিয়ার।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে উপরি উপরি পাঁচদিন পর্য্যন্ত সমানে নরেন গোঁসাইর সাক্ষী হইতে লাগিল। নরেন গোঁসাই সাক্ষী দেওয়ার পূর্ব্বে আসামী ছিলেন—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ইন্দ্রভূষণ রায়, উল্লাস কর দত্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন্দ্র কুমার সেন, পরেশ চন্দ্র মৌলিক, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয় কুমার নাগ, নগেন্দ্র নাথ বক্‌শী, পূর্ণ চন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিভূতি সরকার, নিরাপদ রায়, কানাই লাল দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, দীনদয়াল বসু, সুধীরকুমার সরকার, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক নন্দী, বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু, শিশির সেন, হেমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র সেন।

কয়েকদিন পরে নরেন্দ্র নাথ গোঁসাই সাক্ষী দিতে আসেন, সাক্ষী দেওয়ার পরে আবার এই কয়জনকে ধৃত করিয়া আনা হয়।

চারুচন্দ্র রায়, চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক, নিখিলকৃষ্ণ রায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় ভট্টাচার্য্য, হৃষিদাস দাস, দেবব্রত বসু, সত্যেন্দ্র বসু।

দেবব্রত বসুর বয়স ৪০।৪৫, চেহারা বেশ মোটা সোটা, সোনার চশমা পরিহিত। আদালতে আসিবামাত্র প্রশ্নের পর প্রশ্নে আসামীরা সকলে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিল। সত্যেন আসিলেন জেলের পোষাকে। মেদনীপুরে অস্ত্র আইনে দুই মাস তাঁহার ম্যায়াদ হইয়াছিল। তাঁহার বাড়ী থানা তল্লাসে কিছু অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল। প্রবীণ অধ্যাপক চারু রায় ছিলেন কানাই লালের সর্ব্ব বিষয়ের গুরু। আর যতীন্দ্রনাথ আসিলেন সন্ন্যাসীর বেশে।

বার্লি সাহেব সাক্ষী প্রমাণ লইয়া সকলকে দায়রায় সোপার্দ করিয়া দিলেন। এডিসন্যাল জজ বীচক্রফট সাহেবের ঘরে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। অরবিন্দুবাবু আসামী থাকায় মোকদ্দমার গুরুত্ব খুব বাড়িয়া যায়। প্রথমে মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন। তারপরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অপূর্ব্ব মনীষা ও বাগ্মিতার সহিত মোকদ্দমা পরিচালনা করেন।

জুন মাসের ২৩শে হইতে বার্লি সাহেবের আদালতে পাঁচ দিন নরেন গোঁষাইর সাক্ষ্য হয়। তারপরে প্রতিদিনই নরেনকে কোর্টে সাক্ষী দেওয়ার জন্য বা সেনাক্ত করার জন্য আনা হইত। ৩১শে আগষ্ট তাহাকে কানাই ও সত্যেন গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। দায়রার জজ নরেন গোসাইর সাক্ষ্য গ্রহণ না করায় অরবিন্দুবাবুর বিপক্ষীয় প্রমাণ অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া যায়।

যাহাহউক উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইলে জজ বীচক্রফট ১৯০৯ সালের ৬ই মে নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেন—

বারীন্দ্র ও উল্লাসকর দত্তকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়, উপেন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়, হেমচন্দ্র দাশ, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী (কর্ণেল মহেন্দ্র নন্দীর ছেলে), অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্রভূষণ রায়; দশবৎসর দ্বীপান্তরের আদেশ হয়—পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ ও নিরাপদ রায়ের; সাত বৎসরের দ্বীপান্তর হয়, অশোকনন্দী, বালকৃষ্ণ হরি কানে, শিশিরকুমার সেনের। কৃষ্ণজীবন সান্যালের একবৎসরের কারাদণ্ড হয়।

এই উনচল্লিশ জনের দণ্ড হয়, এবং সতের জন মুক্তিলাভ করে। আপিলের বিচারে বারীন ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয় এবং উহার পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। হেমবাবুর, উপেন্দ্র বাবুর দণ্ড পূর্ব্ববৎই বহাল থাকে। তবে অন্যান্য যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের দশবৎসর দণ্ড হয়। অপর সকলের কিছু কিছু কমিয়া যায়। বালকৃষ্ণহরি কানে মুক্তি পান। হাইকোর্টের দুইজন বিচারক

ছিলেন। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিনস ও মিঃ জষ্টিস্ কার্ণডাফ ( ক্ষুদিরামের মোকদ্দমার বিচারক )

অশোক নন্দী আপিল শেষ হইবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। উভয় বিচার পতির মধ্যে মতভেদ হওয়ায়, বিচারপতি হ্যারিংটন, ইন্দ্রনাথ নন্দী, সুশীল সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, শৈলেন্দ্র বসু এবং বীরেন্দ্র সেনের প্রথম তিনজনকে খালাস দেন এবং বাকী দুইজনের দণ্ড পূর্ব্ববৎ রাখেন।

১৯০৯ সালের ৬ই মে তারিখে অরবিন্দবাবু মুক্তিলাভ করেন। ইহার পরে তিনি 'কর্ম্মযোগিন' ও 'ধর্ম্ম' সম্পাদনা করেন। প্রথমটি হয় ইংরাজীতে, দ্বিতীয়টি বাঙ্গালায়। 'কর্ম্মযোগিন' কাগজে ধর্ম্মের সহিত দেশসেবার সংযোগ থাকায় কাগজ খানি বড় উৎকৃষ্ট হয়। উহাতে দেশসেবাব্রতের পন্থা গ্রহণ সম্বন্ধে কোন মতামত না থাকায় সকল পন্থী কর্ম্মীগণই পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু বেশী দিন অরবিন্দের বাহিরে থাকা সম্ভব হইল না।

শ্রীঅরবিন্দ এখনও পণ্ডিচারীতে আছেন। বারীন্দ্র বাবু একদিন বলিয়াছিলেন "তিনি আসিবেন, তবে যিনি আসিবেন, পূর্ব্বের অরবিন্দ নয়, নতুন একজন"। বাঙ্গালা মা কি সেই প্রথম যুগের স্বার্থত্যাগী দেশভক্ত শ্রীঅরবিন্দেকে আবার একবার বক্ষে ধারণ করিবেন না ?

বারীন্দ্র ও উল্লাস কর, উপেন্দ্রনাথও হেমচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলেই কালাপানি হইতে ১৯২০ সালের গোড়ায়ই ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন তাঁহারা বোধ হয় সকলেই সংসারী কিন্তু সেই যুগের প্রবর্ত্তকগণের স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাতীয় ইতিহাসের একটা গৌরবময় অধ্যায়।

যাঁহারা আলিপুরে এই বোমার মোকদ্দমায় আসামী ছিলেন, তাঁহাদের একাধিক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি আসামীরা কি জেল-হাজতে, কি হাজতের আসামী ভাবে সর্ব্ব অবস্থাতেই খুব আনন্দে ছিলেন। একদিনের পরিচয় দিতেছি। হাকিম

এজলাসে আসিলেন, অমনি আসামীর কাঠগড়া হইতে উল্লাসকর গান ধরিলেন—

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে॥
কোন কাননে জানিনে ফুল,
গন্ধে এমন করে আকুল
কোন গগনে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে॥
ওমা আঁখি মেলি তোমার আলোয়।
প্রথম আমার চোখ জুড়াল
ঐ আলোকে নয়ন রেখে
মুদ্‌বো নয়ন শেষে॥

কেবল এরূপ সময়ে নয়, যখন ফাঁসীর হুকুম হইল, তখনও উল্লাস কর হাসিতে হাসিতেই জেলের বাসে গিয়া উঠিলেন। সে হাসি কোনও দিন ম্লান হয় নাই। এইরূপ মুক্তপ্রাণই ছিলেন সে সময়কার বীর শহীদ্‌গণ।

## নরেন গোঁসাইয়ের স্বীকার উক্তি

নরেন্দ্র নিম্নলিখিত রূপ স্বীকার উক্তি করেন :—

আমার নাম নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। আমরা শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী বংশের লোক। আমার পিতার নাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী। আমাদের কিছু জমিদারী আছে। জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে প্রায়ই বাঁকুড়া, হাঁসডাঙ্গা, মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলায় যাইতে হইত। এখন আমার বয়স ৩০ বৎসর।

আমি ছেলে বেলায় হেয়ার স্কুলে ও হিন্দু স্কুলে পড়িতাম, এবং পরে সেণ্টজেভিয়ারস্ কলেজে পড়িয়াছি। জমিদারী দেখিবার জন্য আমাকে আগেই পড়া ছাড়িতে হয়।

একবার বাঁকুড়ায় আমাদের জমিদারীতে যাইবার পরে রামদাস নামে একব্যক্তি আমাদের বাড়ী আসেন। আমাদের সেখানকার উকীল নগেন্দ্র দত্ত পরিচয় করাইয়া দেন। স্বদেশী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি আমাকে বলেন "আমাদের এখানে একজন বিশিষ্ট নেতা আছেন, তাঁর নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজের শাসন ধ্বংস করিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করাই তার উদ্দেশ্য।" তাঁহাকে আমার দেখিবার আগ্রহ হইল। দুই একদিন পরে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সন্ন্যাসীর বেশে কোন প্রবীণ ব্যক্তি আমার কাছে আসেন। তিনি গীতা, পরলোক তত্ত্ব, আত্মা প্রভৃতির কথা বলেন, তাঁর কথায় আমার বেশ শ্রদ্ধা হয়। তিনি দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করা যে উচিৎ তাহা বুঝাইয়াছিলেন। দুই চারিদিন পরে তিনি আমাকে একখানি পত্র দিয়া কলিকাতার বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে বলেন। পরে শুনিয়াছি যতীন্দ্রবাবু আগে বরোদায় থাকিতেন। আমি কলিকাতা ফিরিয়া প্রথমে উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ও পরে অরবিন্দবাবুর সহিত দেখা করিতে যাই।

উপেন্দ্রবাবু যুগান্তরের উদ্দেশ্যের কথা বলেন, "ভাই যুগান্তর আফিসে যেও, সব কথা হবে।" তিনি আমাকে গ্রাহক হইতে বলেন। আমি তখনই দেড়টাকা দিয়া গ্রাহক হই।

বারীনবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি দেশ যাহাতে স্বাধীন হইতে পারে সেই কথা বলিলেন। তিনি বলেন "দেখুন আমাদের নিজেদের লোক ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে বিজ্ঞান শিখিবার জন্য যাইবে। টাকা যত বেশী পাওয়া যাইবে, কাজ তত বেশী হইবে।

আমি বলিলাম বিজ্ঞানের আবশ্যকতা কি? তিনি বলিলেন "বোমা তৈয়ারী শিখিয়া আসিবে, ট্রেন উড়াইবার কৌশল বুঝিতে পারিবে, আর এখন হইতেই যুবক দিগকে শিখাইতে হইবে যে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন যেন শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের ঠিক ভাবে মারা যাইতে পারে।" একটু পরে বলেন "তুমি যদি বিদেশে যাও বেশ ভাল হয়।" আমি বলি যে পরে বুঝিয়া বলিব।

বারীনবাবু বলিলেন দেখুন সেজদা ( অরবিন্দবাবু ) কত বড় পণ্ডিত, তিনি দেশ স্বাধীন করিবার জন্যইতো বরদা হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সকল বিষয়ের নেতা কে? আপনি?" তিনি বলিলেন 'না, না, আমি কেন হইব। সেজদাই ( অরবিন্দবাবুই ) নেতা।"

অরবিন্দবাবু মুরারী পুকুরের উদ্যানেও আসিতেন, যুগান্তর আফিসেও যাইতেন, আর ওলেনিংটন স্কোয়ারে সুবোধ মল্লীকের বাড়ীও যাইতেন। সেখানে কিছুদিন বাসও করিয়াছিলেন। সব জায়গায়ই অরবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হইত। সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে অবিনাশ চক্রবর্ত্তী আসিতেন। তিনি একজন মুনসেফ। তাঁহার সঙ্গেও দেশের কথা হইত। আর একজন আসিতেন নীরদবাবু, ইনি সুবোধবাবুর সম্পর্কে ভাই।

সুবোধবাবু যুগান্তরের জন্য ৫০০৲ টাকা দেন। যুগান্তর লাইব্রেরীতে 'মুক্তি কোন পথে', 'বর্ত্তমান রণনীতি', 'রুষজাপানযুদ্ধ', 'ভবানী মন্দির', 'আনন্দমঠ', 'গীতা' প্রভৃতি পুস্তক থাকিত। 'ভবাণী মন্দিরে' বোমার ব্যবহার কিরূপে হইবে, সাহেব দিগকে কি করিয়া বধ করা যাইতে পারে প্রভৃতি সব কথা আছে। এই সব বই সমিতির সভ্যরা পড়িত। উল্লাসকর বিস্ফোরণ যন্ত্র সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিতেন।

সমিতিতে ছোরা, গুলি, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি অভ্যাস হইত। কিছুদিন পরে বারীন বাবু আমাকে বলেন, "হেমবাবু বোমা তৈয়ারী শিখিবার জন্য ফরাসী দেশে চলিয়া গিয়াছেন"। হেমবাবু ফিরিয়া আসিলে, হেমবাবু বোমা তৈয়ার করিতেন। বাপাতও ( মিঃ টি, এম্, Ba[illegible]at ) তৈয়ার করিতেন। উল্লাসকর দত্তও করিত। রাজা নবকিশেন ষ্ট্রীটে ও গোয়া বাগানে বোমা তৈয়ার হইত।

সমিতিতে পর পর ধর্ম্মশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা ও দেহ চর্চ্চার শিক্ষা হইত।

সুবোধবাবু ও অরবিন্দবাবুর মধ্যে খুব সম্প্রীতি ছিল। চারু দত্ত, কি মিত্র

ঠিক মনে নাই, তিনি ছিলেন, সুবোধবাবুর ভগ্নিপতি। তিনি একজন সরকারী কর্ম্মচারী, সিভিলিয়ান। তিনি একদিন যুগান্তর প্রেসে আসিয়া বলেন, "স্বরাজ স্থাপন কর্ত্তেই হবে, মারহাট্টারা যেমন ক'রে টাকা উঠায়, আমরাও তেমনি ক'রে টাকা ওঠাব। "ঠাকুর বাড়ীর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমিতিতে আসিতেন। আর মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, যিনি গিরিডিতে থাকেন, তিনিও সমিতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সেখানে একটী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমিতির কাজে তিনি ৩০০০৲ দিয়াছিলেন।

উদ্যানে উপেন্দ্রবাবু সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতেন, তিনি গীতা পড়াইতেন। শচীন্দ্র সেনের মত অল্পবয়স্ক ছেলেরা তাঁহার গীতার উপদেশ শুনিতে বড় ভালবাসিত। শচীনের বাড়ী ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। ১৩।১৪ বছরের ছেলে মাত্র। এত অল্পবয়সের আর কেহ ছিল না। উপেন্দ্রবাবু যেমন বাঙ্গলা তেমনি ইংরাজী জানেন। তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় দারোগা দীনবন্ধুবাবুও মুগ্ধ হন।

উদ্যানের সমিতিতে একটা বাক্‌সে টাকা থাকিত। সেখান হইতে বারীনবাবু, উপেনবাবু, পরেশ মৌলিক ও প্রফুল্ল চাকী ইচ্ছামত টাকা লইতেন। বন্দুক এবং বিস্ফোরক জিনিষ কিনিবার জন্য টাকার দরকার হইত। আমি একদিন উপেনবাবুকে স্বচক্ষে পঞ্চাশ টাকা নিতে দেখিলাম। বারীনবাবুর একটা খৃষ্টানী নাম আছে--ইমানুয়েল। বোধ হয় সমুদ্র পৃষ্ঠে জাহাজে জন্ম হওয়ার জন্য। তবে তিনি খুব ভাল বাঙলা বলিতে পারিতেন। উদ্যানে গীতার কথা, শরীর চর্চ্চার কথা, বিষ্ফোরক জিনিষের কথা এবং সমিতির কার্য্য কিরূপে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হইবে সে সম্বন্ধে আলোচনা হইত। বরদার কৃষ্ণজী পাণ্ডেও সমিতিতে আসিতেন।

তিলক কিরূপ শিবাজী ও গণপতি উৎসব করিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহাও বলা হইত। পুনায় প্লেগের পরে অত্যাচার নিবারণের জন্য কি করা হইয়াছিল তাহাও আলোচনা হইত। উদ্যানে অনেকে সন্ন্যাসীর বেশে থাকিত। আমিও সন্ন্যাসীর বেশ পরিতাম। লোকে বলিত আমার

চেহারা বেশ সুন্দর। অনেকে আমাকে সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিত। হেমদাসবাবু, যিনি বোমা তৈয়ার শিখিয়া আসিয়াছেন, তিনি একজন জমিদারের পিস্তুত ভাই। তাঁর বাড়ীতে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও উল্লাকর আসিত। মিঃ বাপাত, আব্বাস মির্জ্জাও ফ্রান্সে বোমা তৈয়ার শিখিয়াছেন।

একদিন অরবিন্দবাবু আমায় বলেন, "নরেন এই বারোটা টাকা নিয়ে তুমি রংপুর যাও, সেখানে এক বিধবার বাড়ীতে ডাকাতি ক'রে টাকা আন্‌তে হবে। ঈশান চক্রবর্ত্তী নামে সেখানে আমাদের একজন বিশ্বস্ত লোক আছেন। তার কাছে গেলেই তিনি সাহায্য করবেন।" আমি টাকা লইয়া রংপুর চলিয়া যাই। আমার সঙ্গে রিভলভার ছিল। আমার পূর্ব্বেই প্রফুল্ল চাকী চলিয়া গিয়াছিল। আমি, হেমদাস, মহেন্দ্র লাহিড়ী, পরেশ মৌলিক ছিলাম। প্রফুল্ল চাকী আর পরেশ আমাদের গাইডের কার্য্য করে।

সেখানে প্রথমে আমরা বলিহার জমিদারের কাছারীতে যাই। ঈশান চক্রবর্ত্তী ও তার ছেলে মনোরথ আমাদিগকে সাহায্য করে। মনোরথও একজন জমিদার। আমার চশমাটা সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমি যে রিভলভারটি নিয়াছিলাম, তাহা অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের। কিন্তু মনোরথ রাত্রে আমাদিগকে খবর দেয়, গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে, বোধ হয় পূর্ব্বে কোন রকমে সংবাদ পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। আমরা চলিয়া আসিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া আমি অরবিন্দবাবুকে সব কথা বলি, তিনি উত্তর করেন "একবার না হইয়াছে, তাতে চিন্তা কি, আবার হইবে।"

অতঃপরে বাঁকুড়ায় যাই। আমাকে সেখানে পাঠানো হয়। সেখান হইতে অম্বিকা নগরের রাজা রাইচরণ ধবল আমাকে নিয়া পুরুলিয়ায় আসেন। সেখানে তাঁহার একটী ফিতার কারখানা ছিল। সেখান হইতে হাসডাঙ্গা যাই। স্থির হয় যে রাত্রে মোহান্তের বাড়ী লুট করিব। মোহান্তের অনেক টাকা আছে। আমাদের সঙ্গে রিভলভার এবং লাঠি ছিল। বীরেন্দ্র, আমি, নিরাপদ ও প্রফুল্ল

চাকী ছিলাম। রাজার দারোবান প্যালারাম সময় বুঝিয়া আমাদিগকে খবর দিবে কথা ছিল। কিন্তু সেই লোকটা এত মদ খাইয়াছিল যে আমাদের কাজ হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম।

ছোটলাট সাহেবে শ্যার এণ্ড ফ্রেজার হাওড়া হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। আমাকে আদেশ দেওয়া হয় যে আমি আগে গিয়া রেল লাইনের উপরে বোমা রাখিয়া আসিব। লাট সাহেবের গাড়ী উড়াইবার কাজে ছিলাম। আমি, বারীন, বিভূতি, উল্লাস কর আমরা চন্দননগর গিয়াছিলাম। আমি প্রথমে শ্রীরামপুরে যাই ও বারীন তারপরে চন্দননগরে যায়। প্রায় সন্ধ্যার সময় সেখানে পৌঁছি। এইটা দেওয়ালীর সময়ে হইয়াছিল (১৯০৭ নভেম্বর) এবার বোমাটা ফাটে নাই। আমরা শরৎ ঘোষের বাড়ী চন্দননগরে ছিলাম; বোমাটি একটা লোহার গ্লাসের মত আর তাহার উপর চাকতি ছিল। আমার সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি ছিল। আমি, বারীন, উল্লাস কর ও প্রফুল্ল চাকী ছিলাম; আর সেই শান্তি ঘোষও ছিল।

ইহার তিন চারি দিন পরে আবার আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমি আর একটি বোমা লইয়া যাই। এবার বোমাটা গ্লাসের মত লোহার একটা গোল বস্তু ছিল। প্রথমে মানকুণ্ডে ট্রেনে যাই। সেখান হইতে হাঁটিয়া সন্ধ্যায় যাই গন্তব্যস্থলে, পরে কাজ সারিয়া গঙ্গা পার হইয়া ট্রেনে শ্যামনগর হইতে শিয়ালদহ পৌঁছি।

নারায়ণগড়ে যে লাট সাহেবের গাড়ী ওড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়, তাহাতে আমি ছিলাম না। কিন্তু বারীন, উল্লাসকর প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলেন; একথা বারীনই আমাকে বলিয়াছেন। এই সময়ে আমি কাশী ছিলাম। সুবোধ মল্লিকও সেখানে ছিলেন। নারায়ণগড়ের কথা তাঁর সঙ্গে হয়। কোন ফল না হওয়ায় তিনি দুঃখিত হন। তবে আমি যখন বিদায় নিয়া আসি, তখন তিনি বলেন—

"বারীনকে আমার ধন্যবাদ দিবে"। আমি কথাটা ঠিক বুঝতে না পারিয়া

কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলেন 'অনেক দিন থেকে চেষ্টা তো চলছে। যদিও ফল হয়নি, তবু ধন্যবাদ তার প্রাপ্য"।

আমি ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দবাবুকে এই কথা বলিলে, তিনিও বলেন "হাঁ, একবার হয়নি, আবার হবে"।

চন্দননগরে আরেকটা ব্যাপার হয়। সেখানে যে মেয়র আছেন, তাঁহার ডিনারে যাওয়ার সময়ে তাঁহার উপরে বোমা মারিবার কথা হয়। তিনি নাকি ইতিপূর্ব্বে স্বদেশীসভা পুলিশের সাহায্যে বন্ধ করেন, তাই সব নেতারাই তাঁকে জীবিত রাখা পছন্দ করে না।

আমরা প্রথমে হেমচন্দ্র দাসের বাড়ী যাই। আমি বারীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি যে "মেয়রকে মেরে লাভ কি?" বারীন উত্তর করে "দেখ, টাকার দরকার, মেয়রকে খুন করলে, অনেক জমিদার আমাদের দলে আস্‌বে।" আমি বলি চন্দননগরে এমন জমিদার কে আছেন? বারীন বলেন "কেন উত্তর পাড়ার জমিদারবাবুরা রয়েছেন, মিশ্রীবাবুতো এর মধ্যেই ২০০৲ দিয়ে সাহায্য করেছেন আরও হাজার টাকা পাওয়া যাবে"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মিশ্রীবাবু কে?" বারীন—"কেন জানোনা, রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জির জ্যেষ্ঠপুত্র?"

আমরা যখন চন্দন নগরে পৌঁছি তখন সন্ধ্যাকাল। চারুবাবু তখন গঙ্গার ধারে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের দলের চন্দন নগর এলাকায় বিশিষ্ট নেতা। আমরা একটু দূরে ছিলাম, তিনি একটী ছেলে আমাদের কাছে পাঠাইয়া দেন। ছেলেটী অল্প বয়স্ক, নাম নরেন। নরেন আসিয়া বলে "চারুবাবু চান মেয়রকে দুনিয়া থেকে সরাইতেই হবে"। আমারা মেয়রের বাড়ীর দিকে গিয়া পাশের একটী গলিতে অপেক্ষা করি। আমরা মানকুণ্ড ট্রেনে আসিয়া সেখান হইতে দুই মাইল হাঁটিয়া চন্দন নগর যাই। হেমদাশ নিরাপদ রায়, উল্লাসকর দত্ত ও ইন্দুভূষণ রায়, বারীন, বিভূতি ও আমি ছিলাম। হেমবাবুর বাড়ী হইতেই তিনটা বোমা ও একটী ক্যানভাস ব্যাগ নিয়া আসিয়া-

ছিলাম। ইন্দুভূষণ বোমাটি নিক্ষেপ করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তারপরে আমরা গঙ্গাপার হইয়া শ্যামনগরে যাই এবং সেখান হইতে ট্রেনে শেয়ালদহ পৌঁছি। আমার হাতে যে রিভলভারটি ছিল তাহা মেদিনীপুরের স্বেচ্ছা-সেবকদের নেতা সত্যেনের। চন্দননগর হইতে আসিয়া রিভলভাটি মাণিকতলায় জমা দিই।

এই যে চারুবাবুর কথা বলিয়াছি, তাঁহার পূরা নাম চারুচন্দ্র রায়, তিনি চন্দন নগর ডুপ্লে কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক। কানাইলাল দত্ত তাঁহারই শিষ্য ও প্রিয়তম ছাত্র।

ইহার অল্পদিন পরে কুষ্টিয়ার একটী পাদরী সাহেব হিকেন বোথামকে গুলি করা হয়। কিন্তু তাহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই।

আমি ক্ষুদিরামকে জানিতাম। তাকে যে মজঃফরপুরে পাঠানো হয় তাহা আমি জানি। আমি পূর্ণ সেনকে জানিতাম। শুনিয়াছি ক্ষুদিরাম ও পূর্ণ তমলুকে একসঙ্গে পড়িত। ক্ষুদিরামের একটী মোকদ্দমায় পূর্ণ সেন ক্ষুদিরামের পক্ষে সাক্ষী দিয়াছিল কিনা আমি জানি না।

দেবব্রতবাবু একজন সন্ন্যাসী মানুষ। সত্যেন্দ্রবসু রাজনারায়ণ বাবুর ভ্রাতুস্পুত্র। সত্যেন্দ্রই ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুরে মোকদ্দমার হাত হইতে বাঁচায়। সমিতিতে অরবিন্দ ছিলেন বড় কর্ত্তা, বারীন ছোট কর্ত্তা।"

এইবার মোকদ্দমার কথা কিছু বলিব। অরবিন্দ প্রভৃতি ধৃত হন ২রা মে, তারপরেই আলিপুরের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লিসাহেবের কাছে 'প্রিলিমিনারী এনকোয়ারী' আরম্ভ হইল। ১৯শে অক্টোবর হইতে আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ বীচক্রফ্‌টের ঘরে মোকদ্দমা আরম্ভ হয় এবং রায় প্রকাশ হয়, পরবৎসর ৬ই মে (১৯০৯)। এই দীর্ঘকাল শ্রীঅরবিন্দ কি জেল হাজতে, কি আসামীর কাঠগড়ায় নীরব থাকিতেন। সকলে হাসিত, গাহিত, কথাবার্ত্তায় মস্‌গুল থাকিত কিন্তু কোর্টে আসিয়া তিনি চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া থাকিতেন। শুনিয়াছি তিনি মাথায় তৈল দিতেন না। তথাপি সর্ব্বদাই চুলগুলি যেন

তেল চুপ্‌সিয়া পড়িতেছে, বলিয়া বোধ হইত। ইহা সাধক অবস্থার পরিচায়ক।

অরবিন্দ সাক্ষী প্রমাণ শুনিয়া যাইতেন, এবং কিছু কিছু ব্যারিষ্টারকে বলিবার জন্য কাগজে নোট করিতেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে আরম্ভ করিবার পর হইতে আর তাহাও করেন নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দকে বাঘের মুখ হইতে টানিয়া বাহির করেন। বিচারককে সম্বোধন করিয়া তিনি যে চিরস্মরণীয় আবেদন করেন উহা আমাদিগের কর্ণে আজও প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

"Long after this turmoil, long after this controversy will be hushed in silence, long after he is dead and gone, he will be look d upon as the poet of Patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India but across distant seas and land."

দেশবন্ধু যেন কথাগুলি দেবানুপ্রাণিত হইয়াই বলিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর বাণী কি সত্যে পরিণত হইতে চলিতেছেনা ? বাঙ্গালার শ্রীঅরবিন্দ অমরত্ব লাভ করুন। আর এই সম্বন্ধে যিনি অনন্যমনা হইয়া সাধকের মত তাঁহার কার্য্যে একান্ত তপস্যানিরত ছিলেন, সেই মহামানব দেশবন্ধু সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ করা এই গ্রন্থের বিষয় না হইলেও, অরবিন্দ মুক্ত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন মাত্র তাহাই উল্লেখ করিতেছি—

"Then all that was put from me and I had the message from within—This is the man who will save you from the snares. Put aside those papers, It is not you who will instruct him. I will instruct him."

ইহাও সাধকেরই কথা। মুক্তিলাভ করিয়া অরবিন্দ দেশবন্ধুর বাড়ী আসিলেন। তখন দেশবন্ধু হাইকোর্টে গিয়াছিলেন। যথা সময়ে আসিলে উভয়ের

মিলন হইল, দুইজনই দুইজনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেহই একটি কথাও বলিলেন না। কথা হইল অন্য মুক্ত আসামীদের সঙ্গে। এই সময় দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন, বারীন্দ্র ও উল্লাসের ফাঁসীর দণ্ড বেআইনি, ইহা টি'কিবে না।

যাহা হউক অতঃপরে কি অরবিন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন? তখন তিনি ও দেশবন্ধু প্রমুখ দুইএকজন ছাড়া আর কেহ বাহিরে ছিলেননা। দেশবন্ধু তখন সংসারিক কাজে লিপ্ত, বিপিনবাবু বিলাত চলিয়া গিয়াছেন, অশ্বিনী বাবু, শ্রীসুবোধ মল্লিক, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ অন্তরীণাবদ্ধ। জাতীয়তার নেতা লোকমান্য তিলক তখন মান্দালয় জেলে আবদ্ধ। এই দুঃসময়ে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া সেই সময়ের রাজনীতি তত্ত্ব প্রচার করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ব্যাপারও সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। মডারেট্‌রা নূতন মিণ্টো মর্লি সংস্কারে তা কিছু পাইলেনই না, পরন্তু তাঁহারা সরকারের প্রীত তোষণ নীতিরই একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে যে কয়মাস অরবিন্দ বাহিরে ছিলেন অনেক বক্তৃতায় জাতীয়তা বাদীগণের রাজনীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে প্রথমে উত্তর পাড়ায়, ধর্ম্মের সঙ্গে জাতীয়তার সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেন। তারপরে দেন বীডন উদ্যানে ফিডারেল গভর্ণমেণ্ট ও ভিক্ষা-নীতির প্রতিবাদ করিয়া। তারপরে ঝালকাটিতে অশ্বিনীবাবু প্রভৃতির ও লোকমান্য তিলকের সম্বন্ধে অবিচার বর্ণনা করিয়া আর একটি বক্তৃতা দেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বাঙ্গলায় 'ধর্ম্ম' পত্রিকা ও ইংরাজীতে "কর্ম্মযোগিন" সম্পাদন করিয়া লোকশিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন কাগজের মারফত লোকশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকাই সেই অবস্থায় একান্ত কর্ত্তব্য। ২৪ জুলাই (১৯০৯) মুক্তিলাভ করিবার দুইমাস পরে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন উহার নাম The doctrine of Sacrifice আবার পরসপ্তাহেই লেখেন An open letter to my Countrymen. ২রা october লেখেন

Nationalist Organisation. তারপরে ২৫শে ডিসেম্বর লেখেন, To my Countrymen. শেষোক্ত প্রবন্ধ একেবারে নিজের নাম সহি করিয়া বাহির করেন। সব কয়টি প্রবন্ধেই জাতীয়তাবাদীগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ও স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

উপর্য্যুপরি জাতীয়তা মূলক প্রবন্ধে গভর্ণমেণ্ট এবং মডারেটরা প্রমাদ গণিলেন। গভর্ণমেণ্ট সেই সময় তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাইতে লাগিলেন। তখন বন্ধনের আশঙ্কাও প্রবলভাবে দেখা দিল। কেননা এই দেশে আইন সঙ্গত ভাবেও জাতির জাগরণের বা কল্যাণেও কোন কথাই বলা যাইবে না।

অরবিন্দ দেশ ছাড়িতে সঙ্কল্প করিলেন। সকলেই জানেন সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার পরই উপর্য্যুপরি ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। তিনি বুঝিলেন এই দেশে থাকিলে কোন কাজই সম্ভব হইবেনা। তাই তিনি দেশ ছাড়িয়া পর্ব্বত, কন্দর, নদী পার হইয়া স্বাধানতার জ্বলন্ত আকাঙ্খায় বিদেশে চলিয়া যান। আর অরবিন্দও ন্যায়সঙ্গত ও সংযত লেখনী প্রসূত জাতীয়তার কথা লিখিয়াও নিগৃহীত হইবার খাটি সংবাদ পাইয়া ভিন্ন রাজ্যে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। এইযে জাতীয়তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিত অরবিন্দ বাঙ্গলা মায়ের ক্রোড় হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহার জন্য তখন দায়ী ছিল একমাত্র নির্ম্মম সরকার ও ফিরিঙ্গি তোষণকারী মডারেটগণ। জাতীয় ইতিহাস না জানায় অরবিন্দকে আমরা ঠিক বুঝিতে চেষ্টা করিনা। কিন্তু পূর্ব্ব কথা জ্ঞাত হইলে দেখিতে পাইব, অরবিন্দের দেশপ্রেম কত গভীর, কত উন্নত, কত স্বার্থশূন্য!

তিনি কি লিখিয়াছিলেন? লিখিয়াছিলেন, "আমরা তো বে আইনী করিনা। আমাদের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট ভারতের স্বাধীনতা। এই কার্য্য সাহস, ধীরতা ও খাঁটি দেশাত্মবোধের সহিত আমাদিগকে করিতেই হইবে। যাহারা চণ্ডনীতিতে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আসিবার আবশ্যক নাই। যাহারা একান্ত তোষণনীতির অনুগামী তাহারাও পশ্চাতে পড়িয়া থাকুক, কিন্তু আমাদিগকে লক্ষ্য স্থলে পৌছিতেই হইবে। যদি

আমাদের জনগণ এমন ভাবে নিপীড়িত হয়, নেতারা দেশান্তরিত হন, বিচারক ন্যায় বিচার না করেন, পুলিস গোয়েন্দার প্রভাবই সর্ব্বত্র চলিতে থাকে, তবে ট্রান্সভালে গান্ধীজী প্রমুখ ভারতীয়গণ যাহা করিয়াছেন, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে—

"But if a corrupt Police, unscrupulous official or a partial judiciary make use of our honourable publicity of our political methods to harass the men who stand in front by illegal ukases suborned and perjured evidence or unjust decisions shall we shrink from the toll that we have to pay on our march to freedom ? If conditions are made difficult and almost impossible can they be worse than those our countrymen have to be contented against in the Transval ?

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা হইল। ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে ২৪শে বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত সামসুল আলমকে খুন করে। ঘটনায় প্রকাশ পায় বীরেন্দ্র, যতীন্দ্র মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া এই কার্য্য করে। যতীনের সঙ্গে অরবিন্দের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই গভর্ণমেণ্ট অরবিন্দকে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়া অন্তরীণ করিবে স্থির করে।

১৯১০এর ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় গ্রেপ্তারের ইঙ্গিত পাইয়াই একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষিনী তপস্বিনী ভারত ভগ্নী নিবেদিতা এই সংবাদ তাঁহাকে দেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে ইঙ্গভারতের বাহিরে যাইতে পরামর্শ দেন। সেই দুঃসময়ে কোথায় যাইবেন? কে আশ্রয় দিবে? ইতিপূর্ব্বে—"সোণার ভারতের" সম্পাদক বৈকুণ্ঠগুপ্ত ওয়ারেণ্টের আশঙ্কায় চন্দননগরে আশ্রয় নিয়াছেন। তিনি "রক্ত গঙ্গা" প্রবন্ধ বাহির করিতেন। "মাতৃপূজা" লেখক কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলীও

একটী গানে আছে "কর কর বন্ধন হে দৈত্য রাজন, আমার বন্ধনহারিণী মা আছে।

সেখানে আশ্রয় নিয়াছেন। চন্দন নগরেই কানায়ের বাড়ী, আর চন্দন নগরে অরবিন্দের সহকর্মী ও হিতকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় রহিয়াছেন!

অরবিন্দ সেখানেই চলিয়া যাওয়া স্থির করেন। কিছু দিন পরে "গৌমোন ঠাকুর" নাম নিয়া ফরাসী জাহাজে পাণ্ডিচারী চলিয়া যান। শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ীতে মাস খানেক অজ্ঞাত বাসের পরে, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নৌকায় আগরপাড়ায় লইয়া যান এবং সেখান হইতে নির্ব্বিঘ্নে রাজনীতি তত্ত্বদর্শী, স্বার্থ-ত্যাগী, দেশপ্রাণ অরবিন্দকে "ডুপ্লে" নামক ফরাসী জাহাজে উঠাইয়া দেন। ফাঁসীর মঞ্চের দণ্ড হইতে মুক্ত পাইয়াও এই ভাবে তাঁহাকে আমরা দেশ হইতে বিদায় দিলাম। তিনি ১৯১০এর ৪ঠা এপ্রিল পাণ্ডিচারীতে উঠেন। মতিলাল, অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অতঃপরে অরবিন্দের সঙ্গে সংযোগ ছিল। অরবিন্দ পাণ্ডিচারী হইতে "আর্য্য" পত্রিকা বাহির করেন।

অরবিন্দকে না পাইলেও প্রিণ্টার মনোমোহন ঘোষের ছয়মাস জেল হয়। তাই মোকদ্দমাটি হাইকোর্টে আসে। বিচারকগণের মধ্যেও কেহ কেহ আবার যূথভ্রষ্ট ছিলেন। মিঃ জাষ্টিস ফ্লেচার ভিন্নরূপ বুঝিলেন। তিনি মনে করিলেন এই সব উক্তিতে দোষ কি? তিনি অরবিন্দের প্রবন্ধটি ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়া মনোমোহনবাবুকে মুক্তিপ্রদান করেন। বিচারপতি হমড্‌ও একমত হন। অরবিন্দের গ্রেপ্তারের পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে যে একটী অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করেন, তাহাই তাঁহার চরিত্রের যথার্থ পরিচায়ক—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণী-মুর্ত্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্রদান
চাহো নাই কোন ক্ষুদ্র-কৃপা; ভিক্ষা
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি

পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন—
যার লাগি নরদেব চিররাত্রি দিন
তপোমগ্ন, যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকট যাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে,
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরব দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ডবিশ্বাসে।”

## ধিঙ্গড়া ও দক্ষিণ ভারতে বিপ্লব আন্দোলন

মুরারীপুকুরের মোকদ্দমা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি বিশেষ রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক হত্যা অনুষ্ঠিত হয়। একটি কলিকাতায় অপরটি লণ্ডনে, আর একটি নাসিকে।

বৎসরের গোড়ার দিকেই শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির মোকদ্দমার পক্ষের সরকারী প্রধান উকীল ছিলেন স্বর্গীয় আশুতোষ বিশ্বাস। তিনি বহুদিন যাবৎ (১৮৮৮) বিশেষ যোগ্যতার সহিত আলিপুরে পাবলিক প্রাসকিউটারের কার্য্য করিতেছিলেন। এবং মোকদ্দমায় তিনিই নর্টন সাহেবকে সব বুঝাইয়া পড়াইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত কুষ্ঠীয়ায় হেকেন বোথাম মোকদ্দমায় ও কানাই লাল দত্ত এবং সত্যেন বসুর মোকদ্দমায়ও তিনিই সরকার তরফে ছিলেন। তিনি ইংরাজী খুব ভাল জানিতেন, বেঙ্গলী কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও লিখিতেন।

১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি আলিপুর সুবারবান পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে আসেন। বৈকালে কাজ সারিয়া প্রায় পৌনে চারিটার সময় তিনি আদালত গৃহ হইতে পূর্ব্ব দরজা দিয়া আসিয়া যেমন বারেন্দা হইয়া দক্ষিণ দিকে গাড়ীতে উঠিবেন, অমনি কে একজন একটি রিভালভারের গুলি একেবারে ফুস্‌ফুসের দিক লক্ষ্য করিয়া মারিল। ইহার পরে তিনি লাইব্রেরীর দিকে দৌড়াইতেই আর একটি গুলি আসিয়া পেছন দিকে আঘাত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ইহধাম ত্যাগ করেন। তাড়াতাড়ি স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক প্রমুখ উকীলরা আসিয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ বাক্যস্ফূরণ হয় না।

এই হত্যা অনুষ্ঠিত হয় ভবানীপুরেরই একটি ছেলের দ্বারা। তাহার নাম ছিল চারুচন্দ্র বসু। গ্রাম শোভনা, জিলা খুলনা। তাহার পিতার নাম

কেশবচন্দ্র বসু। সে ১৩০ নম্বর রসারোডে একটী খোলার ঘরে মাসিক ।।০ ভাড়া দিয়া থাকিত ও হোটেলে খাইত। হাওড়া হিতৈষী প্রেসে সে কাজ করিত। তাহার ডান হাতটা বিশেষ নুলো মত ছিল এবং রিভালভারটি হাতের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হত্যা করিবার পরই সে ধরা পড়ে এবং ধৃত হইয়া প্রকাশ করে "আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে"।

পরের দিনই জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বমপাশ সাহেবের কাছে প্রাথমিক তদন্ত কার্য্য হয় এবং সেদিনই তাহাকে সেসন সোফার্দ করা হয়। সে এই সময় বলিয়া উঠে—

"দায়রায় পাঠাচ্ছেন কেন, আমাকে কালই ফাঁসী দিন"

দায়রার বিচারও একদিনেই শেষ হইয়া যায়। সে কোনরূপ জেরাও করে না। কোন ব্যারিষ্টারও দেয় না। তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়, এবং শীঘ্রই ফাঁসী হইয়া যায়।

দ্বিতীয় খুন হয় লণ্ডনে। স্যার ওয়ালিয়াম কার্জন ওইলি সাহেবকে (Curzon Wyllie) ভারতীয় যুবক মদন লাল ধিঙ্গড়া হত্যা করে। ইনি ভারত সচিব লর্ড মর্লির অন্যতম সহকারী ছিলেন এবং ভারতীয় ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার হাতে ছিল। লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়াসানে জাহাঙ্গীর হলে ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে অনেক ভারতীয় এবং ইউরোপীয় অভ্যাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি প্রীতি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে সঙ্গীত ও বাদ্যের ও বিশেষ আয়োজন হয়। মদন লণ্ডনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিল এবং সেও সেখানে উপস্থিত ছিল। সেদিন ১লা জুলাই (১৯০৯) রাত্রি ৮টা। প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত ছিলেন, এবং স্যার ওয়ালিয়াম যখন হলঘর হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিবেন, মদনলাল বেশ হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছিল, স্যার উইলিয়ামও ভারতীয় ছাত্রগণের তত্ত্বাবধান করিতেন বলিয়া বেশ প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ছাত্রদের সম্বন্ধে অশিষ্ট উক্তি করিয়াছিলেন। ইহাই মদন লালের তাঁহার উপর রাগের কারণ। মদন লাল সাহেবের

পোষাকে ছিল। হঠাৎ সে ওভার কোর্টের পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া ওইলির দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। মিঃ লালকাকা নামে একজন ভারতীয় পার্সি কাছে ছিলেন, যেমন ধরিতে যাইবেন, তিনিও গুলি খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মদন তখন আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। ধৃত অবস্থায়ও তাহাকে কোনরূপ বিচলিত দেখা গেল না। তাহার পকেটে কতক-গুলি কাগজ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট লেখা ছিল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক হত্যা একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে।'

ভারতীয় নেতা মাননীয় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন সংবাদপত্র সম্মিলনীতে ( Press Conference ) এ ভারতের প্রতিনিধি হইয়া লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনায় তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যান। এবং সঙ্গে সঙ্গে মত প্রকাশ করেন, যে, "ভারতবর্ষের সঙ্গে এসমস্ত হত্যার কোন সংস্রব নাই, এরূপ নৃশংস হত্যার আমরা ঘোরতর প্রতিবাদ করি, আর এই সব হত্যার মূলে নিশ্চয়ই শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মন আছেন।" মিঃ উইনটন চার্চ্চিলও কমন্স সভায় ইঙ্গিত করেন যে এই সমস্ত হত্যার মূলে অন্তরীণে আবদ্ধ অশ্বিনী দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির নিশ্চয়ই ইঙ্গিত আছে। আবার বিলাতের কেহ কেহ বলেন, লাজপাত রায় ইহার ভিতরে আছেন। অবশ্য এই সমস্ত কথারই প্রতিবাদ হয়। শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মা ও প্যারিস হইতে Times কাগজে প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "কার্জ্জন ওয়েলীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। আমি তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার খুনের সহিত আমার বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই, তবে আমি এইরূপ হত্যাকে হত্যা (murder) আখ্যা দিতে পারি না। আমার মতে যাঁরা এরূপ রাজনৈতিক হত্যা অনুষ্ঠান করে, তারা প্রকৃতই ধর্ম্মার্থে কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপ কার্য্যেই দেশ স্বাধীন হইবে। দেশের মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠিত বলিয়া ইহা গর্হিত হইতে পারে না। জার্ম্মানী যদি ইংলণ্ড দখল করিত, তবে কি ইংরাজ এরূপ কার্য্য করিতে বিরত হইত? আর তাহা গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত? আমি ভবিষ্যৎবাণী করিতেছি যে, ইংরাজ

যদি ভারত ত্যাগ না করে, তবে তাহাদের ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।"

**Erelong there will be a catastrophy which will stagger humanity unless the British withdraw from India.**

এদিকে ৫ই জুলাই তারিখে লণ্ডনে কাক্সটন হলে ভারতবাসীগণের একটি সভায় এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়, কিন্তু নাসিকের বিনায়ক দামোদর সাভারকর বলেন "আমি এরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ করিনা"। তিনি তখন টেম্পল ইন্ এ ব্যারিষ্টারি পড়িতে গিয়াছেন। বলা বাহুল্য উন্মত্ত জনতা তাঁহার উপরে প্রধাবিত হয়, এবং তিনি হল হইতে প্রহৃত হইয়া বিতাড়িত হন। আর একজন ভারতবাসীও এই বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। ইনি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইনিও সভরকারের সহপাঠী ছিলেন। ইনি বিক্রমপুর পঞ্চসারের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্রীমতী সরজিনী নাইডুর সহোদর। তিনিও টাইমস্ পত্রিকায় মত প্রকাশ করিয়া বলেন, "এরূপ হত্যা যদি নিবারণ করিতে চাও, তবে একমাত্র পথ এই যে ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দান।" *

২৩শে জুলাই লর্ড এনভারষ্টোনের আদালতে ধীঙ্গড়ার বিচার হয় এবং সেই দিনই তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সাজার কথা শুনিয়া তিনি কেবল অবিচলিত এবং প্রফুল্লই রহিলেন না, সামরিক কায়দায় হাকিমকে সেলাম করিয়া বিনীত ভাবে বলেন—

* Coercion will drive India headlong to destruction. The catalogue of comming assassenation will probably be a long one and the responsibility for its length will have to be laid at the door of those who instead of espousing the cause of Indian freedom wish to hold India in the interest of the British.

বিপ্লব-গুরু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

"অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃ স্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।"

"রাজ ভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র ? তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবন ময়
তব ক্রোড়, স্বাধীন সে বন্দী শালে।"

"আপনাকে এই দণ্ডপ্রদানের জন্য আমি অভিনন্দিত করি। দেশহিতকল্পে মৃত্যু বরণ করিবার সম্মান আমি লাভ করিলাম—"

"Thank you my Lord, I am glad to have the honour of dying for my country."

যথাসময়ে ধিঙ্গড়ার ফাঁসী হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে ফাঁসীর গান গাহিয়া লণ্ডনের ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করেন। এই সব মরণজয়ী বীরগণ সম্বন্ধে কবি নজরুলের কয়টি ছত্রই ঠিক প্রয়োজ্য—

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান ?
আজি পরীক্ষা, জাতিরে, অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল কাণ্ডারি হুঁসিয়ার।

ধিঙ্গড়া পাঞ্জাব প্রদেশস্থ অমৃতসরের অধিবাসী। প্রবেশিকা পরীক্ষা বাড়ী থাকিয়া পাশ করেন ও অতঃপরে লাহোরে কলেজে পড়িতে যান। এফ এ পাশ করিয়া কিছুদিন জাহাজে লসকরের কাজ করেন। পরে তাঁহার পিতা ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার জন্য ১৯০৬ সালের মে মাসে লণ্ডনে পাঠাইয়া দেন। সেখানে ইণ্ডিয়া হাউসে ( হাইগেটে ) থাকিতেন, ইহা শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ধিঙ্গড়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। এই স্থানের খাওয়া পরা ছিল সবই ভারতীয় কায়দায় কিন্তু বাড়ীর লোকের সেরূপ অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম কুন্দন লাল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহোদর মোহন লাল এবং বেহারীলাল ; উভয়েই এম ডি ডাক্তার, চতুর্থ চমন লাল ব্যারিষ্টার। এই হত্যার পরে পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার লুইস ডেনকে বাড়ীর সকলেই চিঠি লেখেন,

"এই কার্য্যের আমরা নিন্দা করি। মদন একটু পাগলা মতন লোক ছিল। তাহার মস্তিষ্কের ঠিক ছিল না, নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কাজ করাই তাহার স্বভাব ছিল।"

যাই হউক ভারতীয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিলাতে তখন ইহাই একমাত্র বিপ্লবাত্মক কার্য্য। কিন্তু ধিঙ্গড়ার পকেটের কাগজে অনেক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির নাম লেখা থাকায়, অতঃপরে বহুদিন পর্য্যন্ত ভারত সচিব লর্ড মর্লির বাড়ীতে সতর্ক প্রহরী নিয়োজিত থাকিত। ইণ্ডিয়া আফিসের সাহেবদের মনে সর্বদা একটা আতঙ্কভাব ছিল।

যে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মার নাম এখানে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার একটু পরিচয় আবশ্যক। বিদেশে বিপ্লববাদ আন্দোলনের তিনিই প্রথম এবং বিশিষ্ট প্রবর্ত্তক।

ইনি ভারতের কচ্ছ (Cutch) প্রদেশবাসী। তাঁহার জন্ম হয় ঘোরতর বিপ্লবের বৎসরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। বর্ম্মা উপাধিধারী হইলেও ইনি ক্ষত্রিয় নহেন, বৈশ্য। আঠারো বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি কাটিওয়ার ছাড়িয়া বোম্বাই চলিয়া আসেন এবং এক ধনী ব্যবসায়ীর কন্যা বিবাহ করিয়া অনেক টাকা যৌতুক প্রাপ্ত হন।

প্রথমে তিনি রুশিয়া বাসী থিয়োজফিষ্ট প্রচারিকা ম্যাডেম ব্লাভাটস্কির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিষা থিয়োজফিষ্ট হন। পরে কিছু টাকা উঠাইয়া বিলাতে যান ও বেলিয়াল-এ (Balliol) তিনি প্রাচ্যভাষায় অধ্যাপনা করেন ও সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনা করিয়াও বিএ ডিগ্রী পান। বেলিয়লে পরবর্ত্তী ভাইসরয় লর্ড কার্জ্জন তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বৎসরে, ১৮৮৫ মিঃ শ্যামজীকৃষ্ণ বর্ম্মা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এখানে তিনি প্রথমে মধ্যভারতের দেশীয় রুটন রাজ্যে দেওয়ান হন, কিন্তু ইংরাজ এজেণ্টের সহিত মতভেদ হওয়ায় কার্য্য ছাড়িয়া দেন। আবার আজমীরে ব্যারিষ্টারী করেন। পরে কাটিওয়ারের জুনাগড়ের দেওয়ান হন। সেখানে ভারত সরকারের এজেণ্টের সহিত মতভেদ হওয়ায় স্যার উইলিয়াম কার্জ্জন ওইলীর সাহায্য চান, কিন্তু উহাতে বঞ্চিত হন। অনুমান ১৮৯৮।৯৯ সালে তিনি সস্ত্রীক বিলাত চলিয়া যান এবং সেখানে ডিমের ব্যবসা করেন। ক্রমে তিনি বিশেষ অর্থবান হইয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিলাতে

তিনি ভারতীয় ছাত্রগণের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করেন।.

'ইণ্ডিয়া হাউস' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালে তিনি লণ্ডনে 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই উহার প্রেসিডেণ্ট হন। এই সময়ে তিনি ৫০০০ টাকা দিয়া শ্রীবিপিনচন্দ্র পালকে পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য বিলাতে লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ পাল তাঁহার কার্য্যে যোগদান করেন নাই। তাঁহার দলের মতবাদ বুঝাইবার জন্য তিনি একখানি এক পেনি মূল্যের মাসিক পত্রিকা বাহির করেন, উহার নাম হয় "ইণ্ডিয়ান সোসিয়েলিষ্ট"। ইহাতে রাজনৈতিক হত্যার সমর্থন করা হইত।

বিনায়েক দামোদর সভারকার ও মদনলাল ধিঙ্গড়া তাঁহার মতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, ক্রমে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতে ইংরাজ রাজ্য উচ্ছেদ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া পার্লামেণ্ট তাঁহার কার্য্যকলাপ বিশেষ বিদ্বেষ ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই তিনি প্যারিসে একটি অনুরূপ সমিতি স্থাপন করেন। তবে লণ্ডনের সমিতিও নষ্ট হয় নাই। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান হইতেই সময় সময় পশ্চিম ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরিত হইত। এই কার্য্যে ম্যাডাম কামা তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করেন।

অতঃপর তাঁহার লণ্ডন অবস্থান কালে নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসন সাহেবকে (A. M. T. Jackson) নাসিকে হত্যা করা হয়। ২১ ডিসেম্বর, ১৯০৯, এই মোকদ্দমায় চীফ জাষ্টিস ও বিচারপতি চন্দ্র ভারকরের বিচারে অনন্ত লক্ষ্মণ কানাইয়ে, কৃষ্ণজী কোপাল কারভে, এবং বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডের মৃত্যুদণ্ড হয়, '১৯১০, ২৩ মার্চ্চ এবং আর তিনজনের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সাভারকার যে রিভলভার ভারতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারই একটী দ্বারা গুলি করা প্রমাণ হওয়ায়, মোকদ্দমায় সাভারকারকে হত্যার সাহায্যকারী রূপে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট বিলাতে লেখেন। ১৯১০-এর

১৩ই মার্চ্চ মাসেই সভারকারকে ধৃত করিয়া দেশে প্রেরণ করা হয়! সাভারকার যখন মোরিয়া জাহাজে ফরাসি দেশের মার্সেলিস বন্দরে পৌছিয়াছেন, তখন মলমূত্র ত্যাগের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দেন, এবং সেখান হইতে লাফ দিয়া সমুদ্রে পড়েন। তাঁহার প্রহরীরা পাইখানার বাহিরে ছিল। একজনকে তিনি কাপড় আনিবার ছলে কেবিনে পাঠাইয়াছিলেন। মার্সেলিসের তীরে সাঁতরাইয়া পৌছিয়া তিনি দৌড়াইয়া যান। অদূরে ম্যাডাম কামা মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাকে ধরিয়া হাতকড়ি দেওয়া হয় এবং পুনরায় মোরিরা জাহাজেই ভারতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহাকে মোরিয়া জাহাজে ৮ই জুলাই মার্সেলেস হইতে রওনা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাধীনরাজ্য ফরাসী এই বেআইনি কার্য্যের প্রতিবাদ করে ও সাভারকারকে প্রত্যর্পণের দাবী করে। ম্যাডাম কামাই এই বিষয়ে সব ব্যবস্থা করেন। প্যারিস হইতে ম্যাডাম কামা বোম্বাই সহরে তার পাঠান—

"Savarkar arriving Bombay by Steamer Morea—Inform him French Government demand his return. See Savarkar professionally and choose your solicitors."

ম্যাডাম কামা বরাবরই ভারতের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ অনুরাগিনী ছিলেন এবং ভারতীয় ছাত্র গণকে খুবই আদর যত্ন করিতেন।

১৯১০এর সেপ্টেম্বর মাসে স্যার বাসিল স্কট, স্যার ত্রনাজি চন্দ্রভারকার ও বিচারপতি হিলের নিকট এই নাসিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং ইহাতে বুঝা যায় সাভারকার ১৯০৫ এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই বিপ্লবাত্মক কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। স্বরাজলাভের জন্য তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে 'মিত্র মেলা' নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরে উহার নাম হয় "অভিনব ভারত-মণ্ডলী—New India Society. ইহাতে স্বাধীনতার যুদ্ধ করিবার আয়োজনের প্রতি বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইত। ১৯০৬এর মে মাসে তিনি ইংলণ্ড রওনা হন।

যাইবার পূর্ব্বে পুনায় একটী গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার লিখিত ম্যাজিনীর জীবনী পুনায় মারাঠা ভাষায় মুদ্রিত করিয়া প্রচার করা হইত।

সিপাহী বিদ্রোহের জয়ন্তীর বৎসরে ( ১৯০৭ ), তিনি বিদ্রোহ চিহ্ন mutiny badges পরিধান করেন। লণ্ডনে 'বোমা কাহিনী' পুস্তকাকারে লিখিয়া স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে অনুরাগীগণের মধ্যে বিতরণ করেন। সেখানে 'পিস্তল বুলেট' "O martyrs" এবং 'ষড়-শহীদ' ( Six martyrs ) প্রভৃতি প্রবন্ধ তিনি প্রকাশিত করেন।

লণ্ডনে বিনায়ক সাভারকার মিঃ বর্ম্মার ইণ্ডিয়া হাউসেই থাকিতেন। ম্যাজিনীর জীবনী মারাহাটি ভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি যে ভূমিকা সন্নিবেশ করেন তাহাতে স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার কথা ছিল। ইনিই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় লণ্ডনে চতুর্ভুজ নামক জনৈক সভ্যকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন এবং ২৫টি ব্রাউনিং পিস্তল সহ তাহাকে বোম্বাই পাঠান। ইহার ১৮টীই পরে নানা স্থানে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ-বর্ম্মা প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া হাউসের অন্যতম কর্ম্মধ্যক্ষ ছিলেন সাভারকার। লণ্ডনে ইনি দেশবাসীদের নিকট কলিকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রচার করিতেন।

মোকদ্দমা কয় মাস চলে, এবং নাসিকে তিনটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। একটিতে শঙ্কর বৈদ্য এবং দামোদর মহাদেও চন্দ্রাতা প্রমুখ ৩৫ জন আসামী ছিলেন, দ্বিতীয়টীতে ছিলেন রামচন্দ্র ভাবে, সখারাম রঘুনাথ কাশীকর এবং তৃতীয়টিতে বিনায়ক দামোদর সাভারকার। বিনায়ক দামোদর সাভারকার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরীত হন। কেশবচন্দ্র ভাকারকারের হয় ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর, তিনজনের হয় ৭ বৎসর এবং ৬ জনের হয় ৫ বৎসর কারাবাস। সাভারকারের সহোদর নারায়ণ দামোদর সাভারকারের হয় ৬মাস। অন্যতম ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকার তাঁহার ভ্রাতার আদেশে রচিত 'অভিনব ভারত মালা' পুস্তকের জন্য ইতিপূর্ব্বে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহাতে বোমা এবং হত্যার ইঙ্গিত ছিল। ধারা ছিল ১২১ দঃ বি অর্থাৎ রাজার বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করা। মসীর যুদ্ধে ১২১ ধারায় শাস্তি হওয়া এই প্রথম। বোম্বাই,আমেদাবাদ, আরঙ্গবাদ প্রভৃতি স্থানে সমিতির শাখা অফিস ছিল, প্রধান আফিস ছিল নাসিকে।

সাভারকারের তখন উদ্দেশ্য ছিল—ইটালির কার্য্য প্রণালী অবলম্বনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন। তাই গুপ্তসমিতি, সভ্যগণের সত্য রাখিবার প্রতিজ্ঞা, অস্ত্র সংগ্রহ, দলগঠন প্রভৃতির ব্যবস্থা সমিতিতে হয়। সাভারকার ২৪ বৎসর দ্বীপান্তর বাস করিয়া মুক্ত হন। তিনি চারি বৎসর যাবৎ বিশেষ যোগ্যতার সহিত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন।

তাঁহার দেশপ্রেমের তুলনা নাই। এদেশে তিনি বীর সাভারকার নামে পরিচিত। তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিতে ভালবাসে।

---

# চতুর্থ অধ্যায়

## অনুশীলন সমিতি ও মিঃ পি, মিত্র

বাঙ্গালা তথা সারা ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির দান অসাধারণ। এখানে উহার উৎপত্তি, বিস্তার ও কর্মপ্রচেষ্টার বিষয় কিছু বলিব।

বাঙ্গালার বিপ্লব আন্দোলনের অধিনায়কই ছিলেন মিঃ পি, মিত্র। কলিকাতার অনুশীলন সমিতি তাঁহার চেষ্টা যত্নের ফল। আত্মোন্নতি, সুহৃদ প্রভৃতি সমিতির তিনিই ছিলেন পরিচালক। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ওরফে বরোদার উপাধ্যায় ) ছিলেন তাঁহার প্রধান সহকারী।

গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আশাপ্রদ ছিলনা। ইতিপূর্বে নীলকর প্রতিরোধ আন্দোলন, সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে সরকারী অবিচারের প্রতিবাদ, এবং 'ইলবার্ট বিল' প্রভৃতির ব্যাপারে বাঙ্গালা অন্য সকল প্রদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও, সে যুগে মহারাষ্ট্রই ছিল অগ্রগামী। কংগ্রেসের নীতি ও গতি তখন খুবই নরম ও মন্থর। বাঙ্গলার অগ্রগামী দল তাই কংগ্রেসের সহিত তালে তালে চলিতে পারিতেছিল না।

স্বর্গীয় প্রমথনাথ মিত্র ( মিঃ পি, মিত্র ) * মহাশয়ের নিবাস ছিল নৈহাটি। ইহার নিকটবর্তী কাঁটালপাড়া গ্রামে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তিনি সর্বদা সাক্ষাৎ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের উৎপত্তির ইতিহাস তিনি

* ১৮৫৩ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর নৈহাটির বিখ্যাত মিত্র পরিবারে প্রমথবাবুর জন্ম হয়। ১৯১০ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর, ইহলোক ত্যাগ করেন।

জানিতেন। বিলাতে অবস্থান কালে সেখানকার স্বাধীনতা-পুষ্ট লোকের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। হাইকোর্টে ব্যবসায়ে সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি ক্রমে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে যান, কিন্তু ঐ সমস্ত স্থানেও সুবিধা না হওয়ায় অবশেষে বরিশালে আসেন ও এই স্থানে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি ব্যবসায়ে প্রচুর পসার প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রিপন কলেজ স্থাপন করিবার পর, ১৮৮৫ খৃঃ, তাঁহাকে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আনেন, এবং উক্ত কলেজে ইংরাজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহাকে হাইকোর্টে ব্যবসায় করিবার সুযোগ সুবিধাও করিয়া দেন। পরে যখন হাইকোর্টে ফৌজদারী বিভাগে বেশ পসার জমিয়া উঠে তখন তিনি অধ্যাপনার কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

১৯০৫ হইতে ১৯১০ খৃঃ পর্য্যন্ত মিঃ মিত্রকে দেখিবার সৌভাগ্য লেখকের অনেকবার হইয়াছিল। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ আসিয়াছিলেন। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর আন্তরিক চেষ্টা যত্নে তিনি ও বিপিনবাবু ময়মনসিংহ গমন করেন। ১৯০৬ খৃঃ মিঃ গার্লিকের আদালতে আমার ছাত্র শ্রীমান খগেন্দ্রজীবন রায়ের বিরুদ্ধে যে মোকর্দ্দামা হয়, তাহাতে তিনি আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়া যে সওয়াল জবাব করেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। লেখক যখন ১৯১০ খৃঃ ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষ্যে তাঁহার বাড়ীতে যান, তখন তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটে।

মিঃ মিত্র ভগিনী নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। নিবেদিতার ধর্মাশ্রিত কর্ম্মময় জীবন তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিত। মিত্র মহাশয়ও অত্যন্ত স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। স্বামী পূর্ণানন্দের তিনি মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের একটু পরিচয় দিব। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে পিতা বিপ্রদাশ মিত্র মহাশয় পুত্রকে ব্রাহ্ম সমাজে বা অপর কোন উন্নত সমাজে

বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন না এবং হিন্দু ভিন্ন অপর কোন সম্প্রদায়ের কন্যাও বিবাহ করিবেন না। তাঁহার অভিপ্রায় মতই বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়। মালখাঁনগরের প্রসিদ্ধ বসু পরিবারে তিনি প্রথম বিবাহ করেন এবং পত্নী বিয়োগের দুই বৎসর পরে আন্দুলের বসু মল্লিক পরিবারে দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। সকলেই জানেন, ভাটপাড়া, নৈহাটী সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল, তাহাদের নিকট এই উদার নীতি সম্পন্ন হিন্দু কায়স্থ পরিবারের আচার ব্যবহার বিসদৃশ বোধ হইত। সমাজপতিগণ কর্তৃক তাঁহাদের উপর অশেষবিধ সামাজিক নির্যাতন চলিতে লাগিল। তাঁহাদের ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ করা হইল। পিতা বিপ্রদাশ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইয়া সপরিবারে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু পুত্র প্রমথবাবু কিছুতেই হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের আশ্রয় ত্যাগ করিলেননা। তিনি বলেন "সমাজ ভ্রম বশে আজ অন্যায় করিলেও একদিন ত্রুটী বুঝিবে। হিন্দুসমাজে আসিয়াই সমাজ ও ধর্মের গ্লানি নিবারণ করা আমাদের কর্তব্য।" প্রমথনাথ মনে প্রাণে জাতীয়তাবাদী ছিলেন। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা না হইলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়না, এ সম্বন্ধে বেঙ্গলী প্রভৃতি নানা সংবাদ পত্রে তিনি বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি "তর্কতত্ত্ব" নামে Logicএর একখানি বাংলা সংস্করণ বাহির করেন।

ভারতের স্বাধীনতা তাঁহার একান্ত কাম্য ছিল। অনুমান ১৯০১।২ খৃঃ তিনি তাঁহার জাতীয়তার গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য দেশের যুবশক্তি নানাপ্রকার ব্যায়াম চর্চ্চা দ্বারা শারীরিক বল বৃদ্ধি করিবে ও কর্মশক্তি লাভ করিবে। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুৎসু প্রভৃতি ব্যায়ামে পুষ্ট হইয়া যুবকরা জাতীয় দৌর্ব্বল্য দূর করুক, জাতিকে সজীব করুক, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত কামনা। তিনি মনে করিতেন ইংরাজের অস্ত্র ধার করিয়া ইংরাজকে দমন করা যাইবেনা। ভারতের নিজস্ব যে ঐশী শক্তি উহারই প্রয়োজন। দ্রোণাচার্য্য

লব্ধ অস্ত্রশিক্ষাবল শত্রু দলনে যথেষ্ট নয় বলিয়াই অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্রের জন্য তপস্যা করিতে হইয়াছিল।

ঠিক এই সময় নিবেদিতা একদিন বলেন, "মিঃ মিত্র, আমি কুরুক্ষেত্র তীর্থের সমস্ত প্রাঙ্গন, প্রান্তর ঘুরিয়া, ক্লান্ত ভাবে তথাকার একটি বাঙ্গলোতে চেয়ারে বসিয়া আছি, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, তাহার গৌরবময় কীর্ত্তি কাহিনী তখন আমার মনকে অভিভূত করিয়াছে। মধ্য রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়াছে, সেই গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ যেন আমি শুনিতে পাইলাম, দূর—অতি দূর—হইতে একটি শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, মনে হইল যেন দেবলোক হইতে ঐ শব্দ নিনাদিত হইতেছে। যন্ত্র চলিতের ন্যায় শব্দ লক্ষ্য করিয়া আমি চলিতে লগিলাম। শব্দ ক্রমে স্পষ্ট তর হইতে লাগিল, আমি আরও অগ্রসর হইলাম, আমার চতুর্দ্দিক হইতে সেই শ্লোকই নিনাদিত হইতে লাগিল,

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

প্রকৃতই এই ভারতভূমিতে ধর্ম্ম সংস্থাপন অবশ্যম্ভাবী।"

প্রমথনাথ উপযুক্ত গুরুর নিকট যোগ অভ্যাস করিতেন। নিবেদিতার এই পবিত্র ভাব তাঁহার হৃদয়স্পর্শ করিল। এই প্রমথনাথই কলিকাতার অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইহার সভাপতি এবং সতীশচন্দ্র বসু ছিলেন সম্পাদক। ১৪৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও ৯২নং বেচু চাটার্জীর ষ্ট্রীটে ইহার কার্য্যালয় ছিল। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এইসময় বরোদা হইতে শ্রীঅরবিন্দের পত্র লইয়া বাঙ্গালায় আসেন ও ১০২নং সাকুর্লার রোডে একটি প্রতিষ্টান গঠন করেন। বারীন্দ্রকুমার ইহার পরে বরোদা হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। যতীন বাবুর পাঠাগার ও রাজনৈতিক ক্লাসের জন্য নিবেদিতা পুস্তকাদি দিয়া সাহায্য করিতেন। 'ডন-সোসাইটি'ও ছাত্রদিগের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ইহার কর্ম-

কর্ত্তা ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরে তিনি শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী হিসাবে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানএ (National Council of Education) অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর বীরাষ্টমী ব্রত ও সেকালে ছাত্র ও যুবক দিগকে বলবীর্য্য লাভ করিতে প্রেরণা দিত। তাঁহার অনুপ্রেরণাতেই ময়মনসিংহে 'সুহৃদ সমিতি' প্রতিষ্টিত হয়, এবং তিনি ইহার প্রধান পরিচালক ছিলেন। এই সমস্ত স্থানে ঢাকার বিখ্যাত মুসলমাম লাঠিয়াল মর্ত্তাজা লাঠিখেলা শিক্ষা দিতেন। যতীন্দ্রনাথ সমস্ত উত্তর বঙ্গে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতির কার্য্যের প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও নিরালম্ব স্বামী নামে খ্যাত হন। প্রসিদ্ধ আলিপুর মামলায় নরেন গোঁসাইর স্বীকার উক্তির বলে পরে তিনি ধৃত ও অভিযুক্ত হন। কিন্তু পরে মুক্ত হন। এই সমস্ত সমিতিই প্রমথবাবুর নেতৃত্বে ও পরামর্শে পরিচালিত হইত।—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারীন্দ্রকুমার বরদা হইতে আসিয়া যতীনবাবুর সহিত মিলিত হন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিতে বদ্ধ পরিকর হন। যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার মতাবলম্বী হন ও উক্ত সমিতিতে যোগদান করেন।— কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনও অরবিন্দের বাঙ্গালায় আগমনের পূর্ব্বে তাহা তেমন সুদৃঢ় হয় নাই। পরে ১৯০৫।৬ খৃঃ হইতেই মুরারী পুকুর উদ্যান প্রধান বিপ্লব কেন্দ্রে পরিণত হয়।

শিক্ষক সতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, হরিশচন্দ্র শিকদার, বিপিন গাঙ্গুলী, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অনুকূল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আত্মোন্নতি সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যে সময় জামালপুরে হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্ব বাধে সে সময় বিপিন বাবু ও ইন্দ্রনাথ উক্ত স্থানের লোক দিগের সাহায্যার্থে গিয়াছিলেন। মিঃ পি মিত্রের ২০৯ নং সার্কুলার রোডের বাটীতে ব্যারিষ্টার উড্রফ (পরে বিচারপতি), ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, কে, ঘোষ রজত রায়, সুরেন হালদার প্রভৃতি অনেকে মিলিত হইতেন। এখানে মধ্যে মধ্যে লাঠি খেলার প্রদর্শনীও হইত।

## ঢাকা অনুশীলন সমিতি

উপরোক্ত সমিতিগুলি সবই ছিল কলিকাতায়। পূর্ববঙ্গে বীরত্বব্যঞ্জক লাঠি খেলা কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল এইবার তাহা নিবেদন করিব।

ঢাকার অনুশীলন সমিতি কলিকাতাস্থ অনুশীলন সমিতির পরে গঠিত হইলেও ইহার কর্মকেন্দ্র ছিল অধিকতর ব্যাপক এবং ক্রমে ইহার কর্মধারাও বিপ্লবাত্মক হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই সব ব্যাপারে ইহা যুগান্তরের দলকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। বঙ্গ ভঙ্গের পর, ১৯০৫ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দ, সুবোধ মল্লিক, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ময়মনসিংহ যান। বিপিনবাবু বক্তৃতা করিতেন, অপর দুইজন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তারিণী মুখোপাধ্যায় নামে দারোগা ( বহুদিন পরে তিনি নিহত হন ), শেষোক্ত ব্যক্তিদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। ইহারই কিছু পরে মিঃ পি, মিত্র ঢাকায় আসেন। বিপিন বাবুর বক্তৃতায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইত। মিত্র মহাশয় বক্তৃতা দিতেন, কথোপকথনের ভাষায়। এই জন্যে ইহা খুব হৃদয়গ্রাহী হইত। ঢাকা বাবুরবাজারে পুলিশ ক্লাবের উপর তলায় তখন যুবকগণের এক সভা হয়। বিপিনবাবুর বলিবার পর পি. মিত্র সকলকে আহ্বান করিয়া বলেন, "তোমাদিগের মধ্যে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে কেহ প্রস্তুত আছ কি ?"

পুলিনবিহারী দাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পি মিত্র তাঁহাকে অনুশীলন সমিতি গড়িবার ভার দিয়া গেলেন। সমিতির উদ্দেশ্য হইল বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া দেশের যুবকদিগের শারীরিক, মানসিক উন্নতিসাধন। করদী তালুকদার বংশের ভূপেশ নাগ২ এবং আশুতোষ দাশগুপ্ত৩ পুলিন বাবুর প্রধান সহায় হন। আশুতোষ দাশ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন। ১৯০৫ খৃঃ

(১) ইনি বিক্রমপুর লোন সিংহ নিবাসী। ইহা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত।

(২) বারদির প্রসিদ্ধ নাগ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

(৩) বিক্রমপুর গাড়ুর গাঁ নিবাসী কাশীনাথ দাশগুপ্তের ছেলে।

৭ই আগষ্ট, ইনিও অন্যান্য ছাত্র নগ্নপদে মাত্র ধুতি ও চাদর লইয়া স্কুলে আসায় ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছাত্র দিগের জরিমানা করেন। ইহাতেই লক্ষ্মী বাজারে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আশুতোষ এখানেই প'ড়তে থাকেন। ক্রমে স্কুলটি ৫১ নং ওয়ারীতে উঠিয়া যায়। সমিতির বাড়ী ছিল ৫০ নং ওয়ারী। পুলিনবাবু জাতীয় বিদ্যালয়েও পড়াইতেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আশুতোষ খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন, পরীক্ষায় প্রথম হইতেন।

সমিতির প্রধান কাজ ছিল লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, কৃত্রিম বেয়নেট চালোনা শিক্ষা, আর জনৈক জাপানির নিকট জুজুৎসু অভ্যাস। পুলিন বাবু ১৯০৪ খৃঃ হইতেই মর্তাজার নিকট লাঠি খেলা শিক্ষা করিতেন। ক্রমে পুলিনবাবু মর্তাজার প্রিয় পাত্র হন। মর্তাজার একটি নিয়ম ছিল নিজে মুসলমান হইয়াও কোন মুসলমানকে তিনি লাঠি খেলা শেখাইতেন না। ক্রমে সমিতির সভ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, ঢাকার উকীল আনন্দ চক্রবর্ত্তী এই সময় অনুশীলন সমিতির সভাপতি হন।

তখন পূর্ব বঙ্গের মুসলমানেরা লর্ড কার্জ্জন ও সিভিলিয়ানগণের উৎসাহ পাইয়া হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিতে দ্বিধা করিত না। কিন্তু অনুশীলন সমিতির লাঠির ভয়ে তাহারা ঢাকার ন্যায় সহরেও অত্যাচার করিতে সাহস করিতনা। ঢাকা সহরে সমদর্শী নবাব আবদুল গণির সম্ভ্রান্ত পরিবার থাকা সত্ত্বেও, কুট্টী নামে পরিচিত একশ্রেণীর মুসলমান ঢাকা সহরে থাকায় এ পর্য্যন্ত হিন্দুদের নানা প্রকার দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। অনুশীলন সমিতির ক্রীড়া প্রদর্শনীকে বলা হইত 'মক ফাইট' কৃত্রিম যুদ্ধ। উহা এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক এবং আকর্ষণীয় মনে হইতে, যে, এক এক প্রদর্শনীর পর একদিনেই প্রায় সভ্য সংখ্যা দুই তিন শত বাড়িয়া যাইত। ক্রমে অনুশীলন সমিতির অন্তর্গত প্রায় পাঁচ ছয় শত শাখা সমিতি গড়িয়া উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে লাঠি সম্বন্ধে বলিতেন তুমি "ছার বাঁশের বংশ বটে কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিবে এমন কোন কাজ নাই, তুমি বাঙ্গালার আব্রু-

পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে সবার মন রাখিতে," এই কথার প্রত্যক্ষ্য ফল ফলিতে লাগিল।

ঢাকা সহর ও গ্রামস্থ মুসলমানগণ বলিত, "ছাত্র বাবুরা যেরূপ লাঠিতে ওস্তাদ আমরা সেরূপ নই।" ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যেরা লাঠির মারের বিশেষ কায়দা বেশ ভালই আয়ত্ত করেন। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের জামালপুরে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গা চারিদিকে ছড়াইয়া ব্যাপক হইতে পারে নাই কেবল অনুশীলন সমিতির লাঠির জোরে। ঢাকা সহরে যে একবার লাঠির শক্তি পরীক্ষা হইয়াছিল সে কথা এখন বলিতেছি।

১৯০৭ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রায় দুইশত মুসলমান অনুশীলন সমিতির চারি দিক ঘিরিয়া ফেলে, উহারা আক্রমণের একটা অছিলার উদ্দেশ্যে পুলিন বাবুর ৫০নং ওয়ারীস্থ বাটীতে একটি গরু প্রবেশ করাইয়া দেয়, গরুটি বাটীর সংলগ্ন বাগানের ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে, ইহাতে গরুটিকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে মুসলমানেরা তীব্র প্রতিবাদ করে এবং আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়।

পুলিনবাবু প্রাচীরের উপর উঠিয়া দেখিতে পান বহুসংখ্যক মুসলমান মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বাটী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তখন তিনি ৭।৮ জন শিষ্যসহ লাঠি হাতে জনতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভীত ত্রস্ত জনতা যে-যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল।

ইহার পর দুই পক্ষই দুইটি মামলা দায়ের করে। সমিতির উপর ঢাকার একদল লোক বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলনা। তাই উকীলেরও অভাব হইল না। পুলিনবাবুর দুই সপ্তাহের জেল হয়। কিন্তু পুলিনবাবুর আনীত মামলাটী তদবিরের অভাবে খারিজ হইয়া যায়। মিঃ পি মিত্র আপিলের সওয়াল জবাব করিবার জন্য কলিকাতা হইতে ঢাকা আসেন। এই সময় তিনি পুলিনবাবুকে বলেন—"পুলিন, তুমি বেশ ভাল কাজ করিয়াছ, কিন্তু এসব মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন

না করিয়াই কেবল ঘটনাটি বিবৃত করিয়া দিলেই যথেষ্ঠ ফল হয়। মারিয়াছ বেশ করিয়াছ, এর জন্য আবার আত্মপক্ষ সমর্থন কেন ?”

মোকদ্দমায় অসহোযোগের কথা মিঃ মিত্রের মুখ হইতেই প্রথম বাহির হয়। ভাল সওয়াল জবাব হওয়া সত্বেও পুলিনবাবুর দণ্ড বহাল থাকে। ঢাকা অনুশীলন সমিতি কলিকাতা সমিতির পরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার গঠনপ্রণালী ও কর্মতৎপরতার জন্য মিত্র মহাশয় এই সমিতির উপর খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

কারাগার হইতে বাহির হইয়া পুলিনবাবু তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে একেবারে গুপ্ত-সমিতিতে পরিণত করেন। ফলে যে বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠে উহার নিয়মকানন গুলিও বিশেষ কঠোর হয়।

সমিতির সভ্যগণকে কতকগুলি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইত। এই প্রতিজ্ঞাগুলির আবার ক্রম বিভাগ ছিল। (১) প্রাথমিক সভ্যদের জন্য আদ্য প্রতিজ্ঞা—(২) ইহার পর অন্তপ্রতিজ্ঞা—(৩) বিশেষ প্রতিজ্ঞা। (৪) অতিবিশেষ প্রতিজ্ঞা। সভ্যদিগকে সর্ব্ব-অবস্থায় মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিতে হইত। নেতার আদেশে সমিতির অনিষ্টজনক প্রচেষ্টা যে উপায়ে হউক রোধ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হত্যা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে। অতিবিশেষ প্রতিজ্ঞার একটি সর্ত্ত এই যে, নেতার নিকট কোন কথা গোপন রাখা হইবেনা এবং সমিতির কার্য্যে প্রয়োজন হইলে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞাগুলি সব দেবতা সাক্ষী করিয়া করিতে হইত।—শাখা সমিতির পরিদর্শকের জন্য অতিরিক্ত পৃথক কতকগুলি নিয়ম ছিল। সর্ব্বদাই যোগ্যতা বিচার করিয়া কার্য্যের ভার দেওয়া হইত।

ইহারা অনেকগুলি রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যা ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়ে। ইহার প্রতি ঘটনাই মারাত্মক রকমে দুর্দ্ধর্ষ।

# শশী সরকারের বাটীর ডাকাতী

সমিতির সভ্যগণ—১৯০৮এর ২রা জুন মাণিকগঞ্জের বাররা গ্রামে শশী সরকারের বাড়ীতে ডাকাতি করিতে গমন করে। এই ঘটনার একমাস পূর্বে যুগান্তর পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট অরবিন্দবাবু, বারীনবাবু প্রভৃতি ধৃত হইয়াছিলেন। আর 'বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীকে ধরাইয়া দিলেন"—প্রফুল্ল চাকির শেষ উক্তি সকলেরই তখন মুখে মুখে।

শশী সরকার ছিল অনেকগুলি গ্রামের চোর-ডাকাতদের 'থলেদার', অর্থাৎ চোরাইমাল গচ্ছিত রাখা ছিল তাহার ব্যবসায়। তাহার বাটীতে প্রচুর অলঙ্কার ও কাঁচা রূপা মজুত ছিল। আশুতোষ দাশগুপ্ত, অমৃত হাজরা, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় —প্রভৃতি প্রায় ত্রিশজন যুবক দুইখানি বড় নৌকায় লাঠি, বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঢাকা হইতে রওনা হয়। সমিতির অন্যতম সভ্য শশী সরকার নামে এক যুবক এই ডাকাতিব সংবাদ দাতা ছিল। ডাকাতগণ মুখস পরিধান করিয়া বাড়ী ঘিরিয়া ফেলে এবং অবিলম্বে চাবি আদায় করিয়া সিন্দুক খুলিয়া গহনা ও টাকা লইয়া প্রস্থান করে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়ীর এক ব্যক্তি কোন প্রকরে বাহিরে গিয়া চীৎকার করিলে বিস্তর লোক জমা হয় ও ডাকাতদের নৌকাগুলি অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে। অনুসরণ-কারীদের মধ্যে বিস্তর চোর ডাকাতও ছিল। অনুসরণ কারীরাও নৌকায় ছিল। ক্রমে তাহারা ধলেশ্বরী নদীতে আসিয়া পড়ে। সমস্ত দিবস নদীর দুইতীর ধরিয়া অসংখ্য লোক ছুটিয়াছে, সমিতির নৌকাও ছুটিয়াছে প্রাণপণে, ইতিমধ্যে সাভার থানার দারোগাও অনুসরণ কারীদের সহিত যোগদেয়। এবং তাহার নিক্ষিপ্ত একটি গুলিতে গোপাল নামক এক যুবক সাজ্ঘাতিক আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নৌকা দুইখানি চলিয়াছে, কখনও পালের সহায়তায়, কখন গুণের সহায়তায় কখনও টাকার সহায়তায়। কারণ মধ্যে মধ্যে টাকা দিয়াও লোকদিগকে

অনুসরণ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলা হইতেছিল। কিন্তু ফল হইল বিপরীত, টাকার লোভে অনুসরণ কারীর সংখ্যা আরও বাড়িয়া চলিল।

অমৃত হাজরা নদীর তীর ধরিয়া গুণ টানিয়া চলিতেছিল। কতকগুলি লোক অমৃতকে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাকে ধরিয়া যেখানে লওয়া হয় সে উলঙ্গ অবস্থায় সেখান হইতে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নৌকায় উঠে। এইভাবে চলিতে চলিতে রাত্র উপস্থিত হইল। ভগবান সহায় হইলেন। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে অনুসরণকারী জনতা আর অগ্রসর হইল না। এই ঘটনায় প্রসিদ্ধ দেবী চৌধুরাণীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এইভাবে তাহারা অমানুসিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া ডাকাতিলব্ধ প্রচুর টাকা ( প্রায় পোনর হাজার ) অলঙ্কার ইত্যাদি সহ ঢাকায় পুলিনবাবুর নিকট পৌছায়। কেহ ধরা পড়ে নাই, অথচ এইরূপ কঠিন পরীক্ষায় তাহারা সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহাতে পুলিনবাবুর আনন্দের সীমা রহিল না। এই ডাকাতির নেতৃত্ব করেন আশুতোষ দাশগুপ্ত। এই ডাকাতি উপলক্ষ্যে তদন্ত করিতে গিয়া ইনস্পেকটার চন্দ্রকান্ত দাস লাঞ্ছিত হন।

স্থানীয় অন্যলোক কর্ত্তৃক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে মনে করিয়া পুলিশ কয়েক জনকে চালান দেয়। কিন্তু স্পেসাল ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁহারা সকলেই মুক্ত হন। এখানে বিচারক ছিলেন স্যার লরেনস জেনকিনস্, স্যরে আশুতোষ মুখপাধ্যায়, এবং আরও একজন।

এই ডাকাতির দুইমাস পরে আর একটি ঘটনা ঘটে। একনিষ্ঠ কর্ম্মী, দেশসেবক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তীর নাম সকলেরই পরিচিত। তিনি সাঠির পাড়া স্কুলে পড়িতেন। স্কুলের কর্ত্তা ছিলেন ঢাকার উকীল ললিতমোহন রায়। এখানে যে সমিতি ছিল ত্রৈলোক্যবাবু ছিলেন উহার সম্পাদক। তিনি মাসিমপুর এলাকার ৩৬টি সমিতির অধিনায়ক ছিলেন। ত্রৈলোক্য, বিনোদ ও যদু প্রমুখ অপর কয়েকজন সভ্যসহ সাঠির পাড়া হইতে একখানি নৌকা লইয়া নারায়ণগঞ্জ আসেন। সভ্যদের ঢাকায় সমিতির প্রদর্শনীতে উপস্থিত

হইবার কথা ছিল। গোয়েন্দা নগেন্দ্র, হেমেন্দ্রই তাহাদের পরিচিত লোকের নৌকা লইয়া আসে। এবং নারায়ণগঞ্জ আসিলে নৌকার পাহারাদার ডাকিয়া আনিবার ছলে ছদ্মবেশী কনেষ্টবল নিয়া আসে। পরে মনোমোহন ঘোষ দারোগা সকলকে নৌকাচুরি মামলায় চালান দেয়। এই মিথ্যা মোকদ্দমার ফল অনেক দূর গড়ায়, তাহা পরে বলিব। ইহাতে সকলেই ধৃত হন। বিচারে তিনজনেরই ছয়মাস করিয়া জেল হয়।

মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর ত্রৈলোক্যবাবু আত্মগোপন করেন। কারণ তাঁহাদের তিনজনের উপরই ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলার ওয়ারেণ্ট ছিল। ১৯০৮ সালের ৩১শে অক্টোবর সমিতির সভ্যেরা ফরিদপুর জেলাস্থ নরিয়া বাজারে একটি ডাকাতি করে, কিন্তু এখানে সামান্য কিছু টাকা পাওয়া যায়। ভয় প্রদর্শন সত্বেও বাজারের দোকানদাররা চাবি হস্তান্তরিত করে না। ইহার পরই ১৫ নভেম্বর সমিতির বাটী খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ বিস্তর কাগজ-পত্র, মুখোস ইত্যাদি লইয়া যায়। এইসব ডাকাতির জন্য পুলিশের ডি-আই-জি বিস্তর গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করে। ইহাদের কেহ কেহ সমিতির সভ্য হইয়া গোপনে তথ্য প্রকাশ করে। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী কনেষ্টবল রতিলাল রায় একজন দক্ষ গোয়েন্দা ও তড়িৎগতি 'ওয়াচার' ছিল। সমিতির সভ্যদের গতিবিধি সে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিত। পুলিসের উচ্চ কর্মচারী বেকার সাহেব নিয়োজিত নগেন্দ্র রায়, হেমেন্দ্র রায়, উপেন্দ্র ঘোষ, সমিতির সভ্য হইয়া পুলিশের নিকট গুপ্ত সংবাদ দিত। সমিতির নিয়ম অনুসারে এইরূপ বিশ্বাস-ঘাতকদের হত্যাসাধনই একমাত্র শাস্তি ছিল। এই কারণ সুকুমার নামক ব্রাহ্মণ যুবককে রমনার কালী দেখিবার ছল করিয়া লইয়া যাইয়া হত্যা করা হয়। কর্ত্তিত হস্তের এক স্থানে সুকুমার শব্দটি লেখা থাকায় লাস সেনাক্ত হয়। কিন্তু খুনের কোন কিনারা হয় না। একই অপরাধে বীরেন গাঙ্গুলী নামক আর একটি যুবককে পদ্মানদীর চরে লইয়া যাইয়া হত্যাকরা হয়। অনেকবার তাহার পিতা সমিতিতে আসিয়া খোঁজ করেন।

ইহার পর 'ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট একট' নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইহার সহায়তায় ১৯০৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে * স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ যে নয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নির্ব্বাসন হয়, তন্মধ্যে পুলিনবাবু ও ভূপেশ নাগও ছিলেন। এই সময় অনুশীলন সমিতি, সাধনা সমিতি, সুহৃদ সমিতি, ব্রতী সমিতি, সবই বেআইনি বলিয়া ঘোষিত হয়, ফলে অনুশীলন সমিতির কার্য্য-কলাপ বন্ধ হইয়া যায়।

এই সময় আশুতোষ দাশগুপ্ত—কলিকাতায় আসেন ও মিঃ পি মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আশুবাবু তখন কলিকাতা অনুশীলন সমিতিতে বাস করিতেন। অপর দুই সভ্য দীনেশ (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ) ও শান্তি মুখোপাধ্যায়-এর সহিত সন্ন্যাসীর বেশে তিনি আগরতলায় যান।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। গবেশ চট্টোপাধায়, ওরফে যতীন চট্টোপাধায় নামে এক যুবক সমিতির সভ্য ছিল। পুলিশ ধাপ্পা দিয়া তাহার নিকট হইতে সমিতির বিরুদ্ধে একটি স্বীকারোক্তি আদায় করে। পুলিশ কয়েকজন যুবকের নাম উল্লেখ করিয়া বলে, উহারা তোমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছে। গবেশ ইহাতে বিচলিত হয় এবং প্রায় ১০০শত জন সমিতির সভ্যকে জড়াইয়া এক দীর্ঘ বিবৃতি দেয়। তাহাকে রাজ সাক্ষী করা হইবে বলিয়া আশা দেওয়া হয়, এবং পাছে কেহ তাহাকে হত্যা করে এই ভয়ে সর্ব্বদা দুইজন দেহরক্ষী তাহাকে পাহারা দিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমিতির নিয়ম ছিল বিশ্বাসঘাতক সভ্যকে যেমন করিয়া হউক হত্যাকরা। এইজন্য তিনজন যুবক ফরিদপুর জেলাস্থ তাহার ফতেজঙ্গপুর গ্রামের বাড়ীতে হানা দেয়। কিন্তু ভ্রম বশতঃ তাহারা তাহার ভ্রাতা প্রিয় মোহনকে হত্যা করে। দুই ভ্রাতার আকারের সাদৃশ্য বশতঃ এই ভ্রম হয়।

* স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন।

গণেশ সেদিন পূর্ব্বেই কনেষ্টবলদের রক্ষাধীন ঢাকায় রওনা হইয়া গিয়াছিল। প্রিয়মোহনের বিধবা জননী চীৎকার করিয়া উঠিলে নিকটস্থ বহু লোক ছুটিয়া আসে, কিন্তু আততায়ীরা তখন রাত্রের অন্ধকারে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। তবে এই পলায়ন বড় সহজসাধ্য হয় নাই। পলায়ন কালে একজন গায়ের চারদ ফেলিয়াই পলায়ন করে, দুইজন এক দিকে, এবং আর একজন অপর দিকে দৌড়াইয়া চাঁদপুর গামী এক নৌকায় উঠে, এবং অনেক কষ্টে ঢাকা পৌছে তখনও তাহার নিকট রিভলবার ও ছোরা ছিল, প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষার্থ ব্যবহার করিবে বলিয়া। এই সব যুবক ছিল এইরূপ শঙ্কাহীন, কর্ত্তব্য নিষ্ঠ। পুলিশ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ নামক এক যুবককে চালান দেয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ উকীল অম্বিকাচরণ মজুমদারের পক্ষ সমর্থনে সে মুক্তি পায়। এই মামলা ফরিদপুরে হইয়াছিল। এখানে একই ব্যক্তি এই তিনটি খুনের নায়ক ছিলেন।

দেশে তখন ডাকাতির হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। এই সময় রাজেন্দ্রপুরের নিকট এক রেল ডাকাতি হয়। মধ্যপাড়া নিবাসী সুরেশচন্দ্র সেন নামে এক যুবক এই কার্য্য করিয়া কয়েক সহস্র টাকা (২৩ হাজার) সংগ্রহ করে। সুরেশের পোনর বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর হয়। সুরেশ অনুশীলন সমিতির সভ্য থাকিলেও, শুনা যায় এ কার্য্য অন্য সমিতির সমর্থনে হইয়াছে। এইরূপ মোহনপুর ও রাজনগরে আরও দুইটি ডাকাতি সংঘটিত হয়।

১৯১০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পুলিনবাবু মুক্তি লাভ করিয়া ঢাকায় আসেন। তিনি এবার ১৪ মাস অন্তরীন ছিলেন। মুক্ত হইয়াই তিনি মিঃ পি, মিত্রের সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করেন।

ইতিমধ্যে সরকার ঢাকা ষড়-যন্ত্র মামলার সমস্ত কাগজ-পত্র তৈয়ারী করিয়া এক বিরাট মামলা রজু করেন। ১৯১০এর ৩রা আগষ্ট, রাত্র ২ ঘটিকার সময় ৪৫ জন লোককে এই মোকর্দ্দমায় গ্রেপ্তার করা হয়। রমনায় ময়দানে একটি নির্জ্জন বাটীতে আদালতের স্থান নির্দ্দেশ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বেন্টিক

প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ করেন। ২।৩ মাস সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়ার পরে ম্যাজিষ্ট্রেট টাঙ্গাইলের মোক্তার অমরেন্দ্রনাথ ঘোষকে মুক্তি দিয়া অবশিষ্ট ৪৪ জনকে দায়রা সোপার্দ্দ করেন। দায়রা বিচার আরম্ভ হয়, ডিষ্টিকট বোর্ডের বাড়ীতে এবং ঢাকা বিচার আরম্ভ হয় ১৯১১, ২রা জানুয়ারী ঢাকার অতিরিক্ত জজ মিঃ কূটসের আদালতে। আসামী পক্ষ সমর্থন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই মামলায় তিনি ছয়মাস যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সরকার পক্ষে ছিলেন প্রসিদ্ধ কৌঁসিলি, মিঃ গার্থ, অপটন, ও নলিনী গুপ্ত। বাবু প্যায়ারা মোহন ঘোষ, শশাঙ্ক বসু, বিভুচরণ গুহ ঠাকুরতা, নিবারণ চন্দ্র গুহ মুস্তাকা-শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন মজুমদার, মন্মথ বসু, তরণী পাইন প্রভৃতি অনেক উকীল মোকদ্দমায় দেশবন্ধুকে সহায়তা করেন। এ মামলায় একটি বিশেষত্ব এই যে সরকার কাহাকেও রাজসাক্ষী করিতে পারে নাই। বর্তমান লেখক এই মামলায় অন্যতম উকীল হিসাবে কাগজ পত্র বুঝাইতে কলিকাতায় দেশবন্ধু দাশের সহিত দেখা করিতেন। মিঃ মিত্রের সহিত ও তাঁহার অনেক আলোচনার সুযোগ হয়। তিনি বলেন এই সব ডাকাতি নরহত্যা প্রভৃতিতে তাঁহার সমর্থন ছিলনা। আনন্দ চক্রবর্তী মহাশয়েরও অনুমোদন ছিলনা। সমিতির প্রাচীন কর্মকর্তা ভুপেশ নাগ মহাশয়ও এই সমস্ত কাজে পুলিনবাবুর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। মিঃ মিত্র যুবকদের শরীর চর্চার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন, কেননা দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে বলিষ্ঠ, নিয়মনিষ্ঠ যুবকদলের প্রয়োজন। পুলিনবাবু এখনও মধ্য কলিকাতায় ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করিয়া যুবকদলের শরীর চর্চায় সাহায্য করিতেছেন।

লেখক একদিন পুলিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার এমন দেশ জোড়া বিরাট সুগঠিত দল ছিল, উহাদিগকে আরও উন্নত না করিয়া আপনি উহাদিগকে ডাকাতির কার্য্যে লিপ্ত করিলেন কেন?"

পুলিনবাবু বলেন, "দেশের লোক আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতনা।

অর্থাভাবে আমাদের সমিতির কার্য্যই বন্ধ হইয়া যাইতেছিল, তাই বাধ্য হইয়া এই কার্য্য করিয়াছি।”

মামলায় পুলিনবাবু, আশুতোষ দাশগুপ্ত ও জোতির্ম্ময় রায় এর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। জোতির্ম্ময় সমিতির যাবতীয় কাগজ পত্র রাখিতেন। মধ্যপাড়া গ্রামের বৃদ্ধ গোবিন্দ সেন ও ঢাকার ললিতমোহন রায় উকীল প্রভৃতি ৮জন মুক্তিলাভ করেন, বাকি সকলেরই দণ্ড হইয়া যায়।

হাইকোর্টে বিচার পতি হ্যারিংটন, স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি, স্যার কাসপার্স এর নিকট এই মামলার আপিল শুনানী হয়। বিচারে পুলিনবাবুর সাত বৎসর ও জোতির্ম্ময় ও আশুতোষের ৬ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর হয়। দীনেশ গুহ প্রমুখ ২১জন মুক্তি লাভ কার। প্রফুল্ল সেন, রাধিকা রায়, ক্ষীরোদ গুহ, শান্তি মুখার্জী, ভূপতিসেন গুপ্ত, নৃপেন সেনগুপ্ত, নিশিভূষণ মিত্র প্রভৃতির অল্পবিস্তর সাজা হয়। মুক্তিলাভ করিয়া পুলিনবাবু কলিকাতায় আসেন ও ১৯২০ খৃ° এর কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকগণের পরিচালক হন। আশুতোষ পুস্তকাদি লিখিয়া, শিক্ষকতা করিয়া ও লাঠিখেলা শিক্ষা দিয়া জীবন ধারণ করেন। বর্ত্তমানে তাহার স্বাস্থ্য ভাল নাই।

১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্ত্তৃক কংগ্রেসে যোগদান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও অসহযোগ আন্দোলনের সহিত সহযোগীতা না করিয়া পুলিনবাবু মাননীয় সতীশরঞ্জন দাশ [ বাঙ্গলার তৎকালীন এডভোকেট জেনারেল ] প্রমুখ সহযোগীদের সহিত যোগদান করেন।

পুলিনবাবু প্রভৃতি ধৃত হইলে শ্রীযুক্ত মাখন সেন অনুশীলন সমিতির তত্বাবধায়ক হন। কিন্তু কর্মপন্থা লইয়া মতদ্বৈধ হওয়ায় সমিতির কতিপয় সভ্য নরেন সেনকে নেতা নির্ব্বাচন করে এবং হিংসাত্মক কার্য্যে রত হয়। মাখনবাবু নুতন অবস্থার উদ্ভবে গঠনমূলক কার্য্যের পক্ষপাতি ছিলেন। কয়েকটি ডাকাতি করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহার দ্বারা মামলা পরিচালনায় সাহায্য করা হয়। এই সময় প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা কনেষ্টবল রতিলাল রায় নিহত হয়।

ঢাকা বড় যন্ত্র মামলার তকন্তকারী গোয়েন্দা ইনসপেক্টার শরৎ ঘোষকে কলিকাতায়, ১৯১০এর সেপ্টেম্বর মাসে গুলিকরা হয়। নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ও হিরণ্য গুপ্ত নামে দুইটি যুবক এই কার্য্য করে। কিন্তু শরৎ ইনসপেক্টর বাঁচিয়া যায়। যুবক দুইটি ধরা পড়ে কিন্তু পরে জজ নিউবোল্ডের আদালতের বিচারে মুক্ত হয়।

পুলিনবাবু, আশুতোষ দাশগুপ্ত প্রভৃতির দ্বীপান্তর হইলেও সমিতিতে তখনও অনেক দুর্দ্ধর্ষ সভ্য ছিলেন। তন্মধ্যে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, অমৃত হাজরা মদন ভৌমিক, রমেশ আচার্য্য প্রভৃতি ইহাদের অন্যতম। নরেন সেন যে পুলিনবাবুর মেকর্দ্দামার দায়রা বিচারের সময় হইতে অনুশীলন সমিতির নেতৃত্ব করিতে ছিলেন—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শরৎ ঘোষের প্রতি আক্রমণ, গাউদিয়া ডাকাতি, রতিলাল রায়কে হত্যা প্রভৃতি ঘটনার বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

১৯১০সাল হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত কতকগুলি ঘটনা ঘটে, এবং এইগুলি লইয়াই—বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়।

## বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

সাধারণের অবগতির জন্য ঘটনাগুলির উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। এই সময় বরিশালে একটি অনুশীলন সমিতির শাখা সমিতি হয়। ইহার পরিচালক ছিল যতীন্দ্রঘোষ, এবং পরে রমেশ আচার্য্য। অল্পবয়স্ক দুর্দ্ধর্ষ যতীন রায়ও ( ওরফে ফেগুরায়ও ) সমিতির একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্ম্মী।

প্রথমবারে গভর্ণমেণ্ট ৩৭জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। ৯জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ২৬ জনের বিচার বরিশালের দায়রা জজ ক্যামেইড ( Cammaide ) সাহেবের ঘরে হয়। ২জন এপ্রুভার হয়। ইহাদের নাম গীরিন্দ্র দাশগুপ্ত ও রজনীকান্ত দাস। এই ২৬ জনের, নরেন্দ্র সেন

মুনীন্দ্রভূষণ রায়, ধীরেন বসু, হেমেন্দ্র মুখুটি ( গাঁসাই দুর্গাপুর স্কুলের হেডমাষ্টার ) ১৪জনকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ১২জনের নিম্নলিখিত ভাবে শাস্তি হয়।

( ১ ) রমেশ আচার্য্য বানারীপাড়া ( ২) যতীন রায় ১২ বৎসর দ্বীপান্তর

রোহিনী গুহ, নিবারণ কর, যতীন ঘোষ ১০বৎসর দ্বীপান্তর

প্রিয়নাথ আচার্য্য, কুমুদনাগ,দেবেন্দ্র বণিক্, গোপাল মিত্র, কারাবাস ৭বৎসর

নিশি ঘোষ চণ্ডীবসু, দেবেন্দ্র ঘোষ ঐ ৫বৎসর

এই বিচারের রায়প্রকাশ হয় ১৫ জানুয়ারী—১৯১৪

এই মোকদ্দমায় কয়েকজন ফেরারী ছিলেন—ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলি, রমেশ চৌধুরী ও খগেন চৌধুরী। জজ্ ক্যামেইড্ সাহেব এই মোকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ করেন ১৯১৫ সালের ২৯মে আর ১৯১৬ সালে রায় বাহির হয়। ত্রৈলেক্য চক্রবর্ত্তীর হয় ১৫বৎসর দ্বীপান্তর, মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী এবং খগেন চৌধুরীর দশ বৎসর। হাইকোর্ট প্রতুল এবং রমেশ চেধুরীকে মুক্তিদান দিয়া বাকী তিনজনের দশবৎসরের দ্বীপান্তর আদেশ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজয় চাটার্জ্জি সহ হাইকোর্টে সওয়াল জবাব করেন।

এইতো গেল মোকর্দ্দমার অবস্থা। কিন্তু কি কি বিষয় লইয়া ষড়যন্ত্র মোকর্দমা উপস্থিত হয় তাহার একটী তালিকা দিতেছি—

(১) হলদিয়াডাকাতি ৩০সেপ্টেম্বর ১৯১০

(ঢাকা জিলা)—১৫০০৲ অপহৃত হয়। একজন নিহত ও কয়েক-জন আহত হয়।

(২) কলারগাঁও ডাকাতি ৭ই নভেম্বর ১৯১০

(ফরিদপুর) বারোহাজার টাকা লুট হয়

(৩) দাদপুর ডাকাতি ৩০নভেম্বর ১৯১০

থানা মেহিদিগঞ্জ বরিশাল প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা অপহৃত হয়।

(৪) পণ্ডিতসার ডাকাতি ৩০, ফেব্রুয়ারী ১৯১১
সাড়ে পাঁচহাজার টাকা অপহৃত হয়

(৫) গাউদিয়া ডাকাতি ২৯, ফেব্রুয়ারী ১৯১১
প্রায় আট হাজার টাকা অপহৃত হয়

(৬) সুকার ডাকাতি ৩১, মার্চ্চ ১৯১১
প্রায় হাজার টাকা পাওয়া যায়

(৭) মাদারীগঞ্জ ৬ই জুন, ১৯১১

(৮) গোলকপুর বন্দুক চুরি ২০ জুলাই, ১৯১১
কুশঙ্গল ডাকাতি ( বাখরগঞ্জ ) ১৭ এপ্রেল, ১৯১২

(৯) কাউকুড়ি ডাকাতি ২৯ এপ্রিল ১৯১২
বেশি টাকা পাওয়া যায় না

(১০) বিড়ঙ্গল ডাকাতি ( বরিশাল ) ১৯১২, ২৩ মে
৮০০০৲ ইহাতে এপ্রুভার রজনী দাসও ছিল।

(১১) পানাম ডাকাতি ( ঢাকা জিলা ) ১০ জুলাই, ১৯১২
২০০০০৲ টাকা অপহৃত হয়

(১২) সারদা চক্রবর্ত্তীর খুন, জুলাই ১৯১২

(১৩) কুমিল্লা সহরের ডাকাতির চেষ্টায় একত্র হওয়া, ১লা নভেম্বর ১৯১২, মুখস, হাতুড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়। রমেশ ব্যানার্জ্জি (বিদগাঁও) প্রমুখ ১০জনের ৭বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়।
আদিত্য চরণ দে, ঠাকুর দাস পাল খালাস পায়।

(১৪) লাঙ্গলবন্ধ ডাকাতি ১৪ নভেম্বর ১৯১২—
প্যারী শাখারীর বাড়ী ( ঢাকা জিলা ) ১৬০০০৲ টাকা ও গহনা অপহৃত হয়। গিরীন্দ্র দাশের ৫বৎসর জেল হয়।

## সোনারঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয়

১৯০৮ সালের মে মাসে শ্রীযুক্ত মাখন লাল সেন সোনারঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মাখনবাবু অনুশীলন সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পুলীনবাবুর ডিপোর্টেসন ও সমিতি বন্ধ হওয়ার পরে তিনিই ছিলেন সমিতির অধিনায়ক। তবে ১৯১১ সালের নূতন পরিস্থিতি হেতু তিনি গঠন মূলক কার্য্য তালিকা দেন এবং তাহাতে অন্যান্য সভ্যদের সহিত মতভেদহেতু তিনি সমিতির সংস্রব ছাড়িয়া দেন।

অনুশীলন সমিতি গভর্ণমেণ্ট ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বন্ধ করিয়া দিলে সোনারঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয়ে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, রমেশ আচার্য্য, নরেন সেন প্রভৃতি আসেন। রবীন্দ্র সেন, যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিও পরে আসেন।

সোনারঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয় অল্পদিন মধ্যেই গোয়েন্দা পুলিসের বিষনজরে পড়ে এবং অনেককে গোয়েন্দা করা হয়। পোষ্টাফিসের পিয়নের সঙ্গে উক্ত বিদ্যালয়ের কাহারও কাহারও বচসা ও হাতাহাতী হওয়ায়, কয়েকটি মুসলমান গোয়েন্দার অপচেষ্টায় পিওনের মেল ব্যাগ ছিনাইয়া নিয়াছে বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া হয়। তাহাতে ১৪জন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং বিচারে যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ৪মাসের জেল হয়, একজনের একমাস ও ৪জনের ২৫৲ করিয়া জরিমানা হয়। মোকর্দ্দমা শেষ হইয়া গেলে সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক ১৯১১, ১১জুলাই রসুল দেওয়ান, তাহার ভাই এবং আর একজন গোয়েন্দা নিহত হয়।

এই বৎসরে আরও কয়েকটি খুন হয়। বিক্রমপুর রাউৎভোগের মনোমোহন দে একজন গোয়েন্দা ছিল। ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় সাক্ষী দিয়া আসিবার পরেই ১৯১১, ১০এপ্রিল নিহত হয়।

গাউদিয়া নিবাসী রাজকুমার রায় ময়মনসিংহের গোয়েন্দা দারোগা

ছিলেন। ময়মনসিংহের সেরপুরের দিকে ডাকাতি উপলক্ষ্যে কয়েকজন সমিতির সভ্যকে প্রহার করিয়াছিল। ১৯১১, ১৯ জুন সে নিহত হয়।

মনোমোহন ঘোষ, নারায়ণগঞ্জের দারোগা থাকাবস্থায়—সাঠিরপাড়া নৌকা চুরির মোকদ্দমায় তদন্ত করিয়াছিল ও ঢাকার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সাক্ষীদের লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছিল। একজন সাক্ষী ছিলেন সাঠিরপাড়া স্কুলের শিক্ষক শীতল চক্রবর্ত্তী। তিনি পুলিসের শেখানো কথা বলিতে অস্বীকার করিলে মনোমোহন বাবু তাহার গালে চড় মারিয়াছিল। তারপর ইনস্পেক্টার হইয়া বরিশালে গিয়াছেন এবং লক্ষণকাটি ডাকাতি ব্যাপারে খুবই তৎপরতা দেখাইয়াছেন। ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর তাহাকে গুলির আঘাতে নিহত করা হয়।

১৯১২ সালেও দুইটি খুন হয়—একজন সারদা চক্রবর্ত্তী ও দ্বিতীয় রতিলাল রায়। রতিলাল একজন উৎসাহী গোয়েন্দা কনেষ্টবল। সে ২৪সে সেপ্টেম্বর নিহত হয় আর সারদা নিহত হয় জুন মাসে। রতিলাল ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় একজন প্রধান সাক্ষী ছিল।

উল্লিখিত এই সমস্ত খুন ও ডাকাতিই বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার বিষয়ভূক্ত ছিল। প্রথমে বিডঙ্গল ডাকাতির রজনী দাস স্বীকারোক্তি করে। এদিকে গিরীন্দ্র দাসের বাড়ীতে অনেক জিনিষপত্র পাওয়াতে একেবারে ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা তৈয়ারী হয়। গিরীন্দ্র দাস, প্রসিদ্ধ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট যামিনী মোহন দাশের পুত্র। সে সমিতির সভ্য ছিল, সরকারী লোকের বাড়ীতে খানাতল্লাসের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহার ওখানেই গয়নাপত্র এবং রিভালভার কার্ত্তুজ রাখা হইত। খবর পাইয়া একদিন পিতা আসিয়া তাহাকে বন্ধুবান্ধব সহ সেই ঘরে ধরিয়া ফেলে। দুইজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সময় তখন তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল—একজন ছিল পুলীনবাবুর আত্মীয়। তিনজনেই পরামর্শ করিয়া সমস্ত ব্যাপার ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইয়া দেয়। গোয়েন্দা পুলিস আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করে।

প্রথমতঃ রিভলভার ইত্যাদি রাখিবার জন্য গিরীন্দ্রের দেড়বৎসর এবং ডাকাতির মাল ( কুশঙ্গিল, কাকুরিয়া, বিডঙ্গল ) রাখার জন্য হয় ৫বৎসর। পরে যখন বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা আরম্ভ হয়, গিরীন্দ্র রাজসাক্ষী হওয়ায় তাহার দণ্ডভোগ করিতে হয় না। দুইটি মোকর্দ্দমায়ই (প্রথমটি এবং অতিরিক্তটি) সাক্ষী দেওয়ার পরে তাহাকে বিলাত পাঠানো হয়।

প্রিয়নাথ, রমেশ আচার্য্যের খুড়তুত ভাই। বিক্রমপুর বানারীপাড়া নিবাসী। বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার ৭বৎসর দণ্ড পাইয়া ত্রিচিনপলী জেলে অবস্থান করিতেছিল। সেখানে সুশীল ঘোষ নামে একজন গোয়েন্দা দারোগা গিয়া প্রলোভন দেখাইয়া স্বীকারোক্তি লয়। তাহার একটি সর্ত্ত ছিল যে সে রমেশ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না। অতিরিক্ত মোকর্দ্দমায় সে রাজসাক্ষী হয়। তাহার মাতুল নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য গোয়েন্দা পুলিসের ইনস্পেক্টার ছিলেন। তাহাদের অমত না থাকিলেও স্বীকার উক্তি ব্যাপারে বিশেষ হাত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহারা পূর্ব্বে সোনারঙ্গ মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন।

১৯১১ সালে রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র আচার্য্য এবং যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহের জামালপুরে সন্দেহ ক্রমে পুলিস কর্তৃক ধৃত হয়। পুলিশ সন্দেহ করে যে তাহারা ডাকাতির জন্য আয়োজন করিতেছিল।

সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১০৯ ধারানুসারে ইহারা একবৎসর কাল জেলে আটক থাকে।

## রাজাবাজার বোমাষড়যন্ত্র

অনুমান ১৯১২ সালের প্রথম দিক হইতে অমৃত হাজরা রাজাবাজারে ২৯৬।১ অপার সার্কুলার রোডে বোমা তৈয়ার করিবার একটী কারখানা করেন। বাড়ীটী ছিল ছোট, দুইতলা বটে, কিন্তু ছাত ছিল খোলার। বাড়ীর নীচে ট্রাম

কণ্ডাকটারদের মেস ছিল। উপরে অমৃত ( ওরফের শশাঙ্ক ) হাজরা বাস করিতেন। এখানে বোমার খোল তৈয়ার হইত। এবং বোমা তৈয়ারের অন্যান্য উপাদান সংগৃহীত ছিল। অমৃতের সহিত চন্দননগর সমিতির বিশেষ যোগ ছিল। অনুসন্ধান কালে নারিকেলের মালা, পিকরিক এসিড, নাইটিক এসিড প্রভৃতি পাওয়া যায়। যে ভাবের বোমার খোল পাওয়া যায়, তাহাই ইতিপূর্ব্বে ( ১ ) মৌলবী বাজার, ( ২ ) দিল্লী, (৩) ময়মনসিংহ ( ৪ ) লাহোর প্রভৃতি স্থানেও ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত বিপ্লবী রাস বিহারী বসু ও তাহার সহকর্ম্মী ও দক্ষিণ হস্ত শচীন্দ্র সান্যাল এখানে ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতেন। দিল্লীর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় ১৯১২, ২৩ ডিসেম্বর; মৌলভীবাজার ১৯১৩, ২৭ নভেম্বর; লাহোর লরেন্স উদ্যানে ১৭ মে ১৯১৩; এতদ্ব্যতীত কলিকাতার গোল দিঘিতে রিভলবারের গুলিতে হরিপদ দে নিহত হয়, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩, আর তারপর দিন ময়মনসিংহে ইনস্পেক্টার বঙ্কিম চৌধুরী বোমার আঘাতে নিহত হয়। ৩০ শে সে সেপ্টেম্বর, ১৯১৩। ইহারই পরে ২১ নভেম্বর এই রাজাবাজারের বাড়ীটিতে খানাতল্লাস হয়। বোমা বিশেষজ্ঞ বলেন এই সব বোমাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তৈয়ার হইলেও ইহাতে একই মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক রাসবিহারী বসু কি অন্য কেহ, কি সকলের সমবেত যত্নে তাহা সহজে ধরা কঠিন। তবে রাজাবাজারে প্রাপ্ত 'স্বাধীনতা পত্র' দিল্লীর "Liberty leaflet" এরই অনুরূপ।

চন্দননগরের তিনজন প্রসিদ্ধ লোকই আলিপুর বোমার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ১৯০৮ সালে অভিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কানাইলাল ভারতবাসীও ইংরাজ কর্তৃক সম্মানিত হন, অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ও (Extradition) ভিন্ন রাজ্য হইতে ধৃত বলিয়া অব্যহতি পান। উপেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল উভরেই চারুবাবুর ভুপ্রে

এই 'স্বাধীনতা পত্র' অনুশীলন সমিতির প্রচার কার্য্যের একখানি প্রধান যন্ত্র ছিল।

কলেজের ছাত্র ছিলেন। জামালপুরে মুসলমানদের অত্যাচার ও পীড়নের পরেই কানাইলাল বিপ্লব সমিতিতে যোগদান করিতে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি চাকুরী করিতে যাই বলিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া মুরারীপুকুর উদ্যানে যোগদান করেন।

## চন্দন নগরের কর্ম্মীদল

শ্রীঅরবিন্দ যে কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া চন্দননগরে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের গৃহে ( ১৯১০, মার্চ্চ ) আশ্রয় নিয়াছিলেন এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখানে শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণায় মতিলাল বাবু অতঃপর চন্দননগরে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছাড়া, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপধ্যায় এবং মহারাষ্ট্রীয় পারার খাঁ ( পরে কাশীর 'আজ' কাগজের সম্পাদক ) তিনজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইহারা চারিজন চুঁচুড়ার এক উদ্যানে মিলিত হইতেন। রাসবিহারী বসু এখানে আসিয়া সকলকে নূতন-ভাবে অনুপ্রাণীত করেন। এই বিষয়ে মতিবাবুর কথায়ই সমিতির বিশিষ্টতা সম্বন্ধে নিবেদন করিব :—

"১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন। চন্দন নগরের বিপ্লব গুরু ৺চারু চন্দ্র রায়, ফরাসী রাষ্ট্র আইনের বলে আলিপুর বোমার মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া তখন ঘরে ফিরিয়াছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হইলে, শ্রীঅরবিন্দ আমার বাটীতে আশ্রয়

---

* কানাইলালের জন্ম ১৮৮৭ জন্মাষ্টমীর দিনে। তাহার পিতা চুনীলাল দত্ত বোম্বাই থাকিতেন। কানাইলাল সেখানে আর্য্য হাইস্কুলে পড়েন। ১৯০৩ সাল আসিয়া চন্দননগরে ভর্ত্তি হন।

লাভ করেন। বাংলার বিপ্লবযুগের ইতিহাস এই যোগাযোগের ফলেই নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল! বিপ্লবী বাংলার প্রধান ঋত্বিকরূপে তাঁর সমস্ত কর্ম্মভার ধীরে ধীরে চন্দননগরের উপরেই ন্যস্ত হইল। তিনি শক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আত্ম সাধনে রত হইলেন। এই সময়ে তিনি আমার নিকটে—"কালী" নামেই আত্মপরিচয় দিতেন।

রাসবিহারী তখন দেরাদুনে থাকিতেন। শ্রীশ ঘোষ তাঁহার আত্মীয়, মতিলাল বাবু বন্ধু। রাসবিহারী মতিবাবুর কাছে শ্রীঅরবিন্দের যোগতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। আত্মসমর্পণ যোগ তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিল। এই রাসবিহারীও অনেক সময় চন্দননগরে আসিতেন। এবং আসিয়া শ্রীশবাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন। ১৯১৫ সালে তিনি যে দেশ ছাড়িয়া যান তাহাও মতিবাবু ও শ্রীশবাবুর সহায়তায়।

অনুশীলন সমিতির সভ্যগণও চন্দন নগরে আসিয়া ইহার সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। এই যোগাযোগ হয় অনুশীলনসমিতির অন্যতম প্রধান কর্ম্মী অমৃত হাজরার দৌত্যে। অনুশীলনের সহিত চন্দননগরের সংযোগ ঘটিল।"

প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ—আরম্ভ হইলে যখন উত্তর পাড়ায় সম্মিলন হয় তখন চন্দন নগরের মতিবাবু, শ্রীশবাবু, অমর বাবু সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তে রাসবিহারীও বিশেষ উৎসাহ লাভ করেন।

মতিবাবু অনুভব করিতেন ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া বিপ্লবীদের উন্নত ও কঠোর চরিত্র গঠনের প্রয়োজন, তাই শ্রীঅরবিন্দ যখন "আর্য্য" বাহির করেন, চন্দননগর হইতে "প্রবর্ত্তক" পত্রিকা প্রচার সুরু হয়, এবং সংগঠনের মন্ত্র সমস্ত বাঙ্গলায় প্রচারিত হয়।

চন্দননগরের সহিত সকল দলেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে ছিল, কারণ চন্দন নগরেই বোমা তৈয়ার হইত। এবং এক একটি বোমার জন্য মূল্য গ্রহণ করা হইত।

১৯১৮ খৃঃ চন্দননগরের প্রধান কর্ম্মী শ্রীশবাবু ইনগ্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়া এক্টএ হাওড়া ষ্টেশনে ধরা পড়েন, আর শ্রীঅরবিন্দও—মতিবাবুকে লেখেন, "**Arya and the bomb should not be forever together**" মতিবাবু অরবিন্দের কথা মাথা পাতিয়া নিলেন। বিপ্লবীগণের চরিত্র গঠনের প্রতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি কোন কোন যুবকের পদস্খলনে অত্যন্ত ব্যথিত হন, এবং পরে তাঁহার কর্ম্মধারা গঠনমূলক কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়। বর্ত্তমানে চন্দন নগরের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাঙ্গলার একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠান।

---

# সপ্তম অধ্যায়

## অনুশীলন সমিতি ও রাসবিহারী

এইবার আমরা ভারতের প্রসিদ্ধ নেতা রাসবিহারী বসু সম্বন্ধে বলিব। রাসবিহারীর, চন্দন নগর সমিতি, ঢাকা অনুশীলন সমিতি এবং রাজাবাজারে অমৃত হাজরার কার্য্য কলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাই রাজাবাজারের বাকী ঘটনাবলী ( যাহা আমরা ১২´ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি) সে সম্বন্ধে বিবৃত করিতেছি। রাজাবাজার বোমার মোকদ্দমায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই সম্বন্ধের কতকটা আভাষ দিয়াছেন।

তিনি রায়ে লিখিয়াছেন :

The circumstance that bombs of this particular type have been used in various places in British India as widely separated from Lahore, Delhi, Sylhet, Mymensing and Midnapur points to the conclusion that more than one person is engaged in these transactions. The bombs are not the handiwork of one individual, though they may be the work of one controlling mind. This inferance is confirmed by at least one revolutionary document found in the room of Sasanka which advocates the realization of India's freedom with the aid of heroic patriots by bloodshed and assassination.

যাহাই হউক অতঃপরে ঠিক সময়ে ( ২১ নভেম্বর ১৯১৩ ) বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের বাঁকীপুরে আসিবার কথা ছিল, সেখানে এই রাজাবাজার হইতেই হিরণ্ময় বানার্জীকে পাঠানো হয়। কাশীতে শচীন সান্যালের সহিত এই হিরণ্ময়ের যোগাযোগ ছিল।

মৌলভী বাজার প্রসঙ্গে এখানে কিছু বলা দরকার। স্বামী দয়ানন্দ অথবা

ঠাকুর দয়ানন্দ নামে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী শ্রীহট্ট জিলার মৌলভীবাজার মহকুমার অন্তর্গত জগৎসী গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্বামী হংসানন্দ, স্বামী চিদানন্দ, প্রজ্ঞানন্দ, প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গ ছিলেন। তাঁহারা কীর্ত্তন করিতেন এবং কীর্ত্তনের পদ ছিল "প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।" অনেক লোক আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শচীন্দ্র নামে একটি ১৬৷১৭ বৎসরের যুবক আশ্রমে আসিয়া স্বেচ্ছায় বাস করে। তাহার পিতার অভিযোগ মতে আশ্রমের বিরুদ্ধে পুলিস একটি বালক হরণ ( kidnapping case ) আনয়ন করে। পুলিসের লোক খানাতল্লাস করিতে আসিলে আশ্রমবাসীগণ খানাতল্লাস করিতে বাধা দেন। তাই মৌলভী বাজার মহকুমার হাকিম কাপ্তেন গর্ডন বহু পুলিস লইয়া আশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত হয়। উভয় দলে সংঘর্ষ হয়, আশ্রমের অনেক লোক আহত হয়, প্রায় পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আশ্রমের বিশিষ্ট সভ্য কাপ্তেন মহেন্দ্র দে আই, এম, এস গুলির আঘাতে নিহত হন। এই ঘটনা হয় ১৯১২ সালের শেষ দিকে।

এই গর্ডন সাহেবকেই মৌলভী বাজারে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হয় মার্চ্চ ১৯১৩। ঐরূপ একটি বোমা লইয়া যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী দুইটি সঙ্গী সহ মৌলভী বাজারে যায়। রেল লাইনে হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় বোমাটির বিস্ফোরণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগেন্দ্রের মৃত্যু হয়। সঙ্গী দুইজন দৌড়াইয়া চলিয়া যায়। এই যোগেন্দ্রেরই, রবি সেন ও রমেশ আচার্য্য সহ ১৯১১ সালে জামালপুরে এক বৎসর জেল হইয়াছিল। যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীদিগকে ধরাইয়া দিবার জন্য ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কেহই উহা পারে নাই।

রাসবিহারীর দল পাঞ্জাবে পর্য্যন্ত গর্ডন সাহেবের যে পশ্চাৎধাবন করিয়াছিল, সে কথা অন্যত্র বলিব।

হরিপদ দেব নামক যে হেড কনেষ্টবলকে গোল দীঘীতে [ College square ] খুন ( ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ ) করা সে রাজাবাজার প্রভৃতি স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিত। কে খুন করে, তাহার কোন সন্ধান হয় নাই।

রাজাবাজার বাসাটি খানাতল্লাসীর সময়ে দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদাগুহ, চন্দ্রশেখর দে সেখানে ধৃত হয়। তাহারা সেখানে শুইয়াছিল। এই মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত আলিপুরের সদর মহকুমার হাকিম মিঃ ভীচের আদালতে হয়। ইঁহারা ধৃত হন ২১ নভেম্বর। পরে কালীপদ ঘোষ [ ওরফে উপেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী ] স্বাধীনতা পত্র ( Liberty Leaflet ) সহ গ্রেপ্তার হয় কলেজ ষ্ট্রীটে ৬ই ডিসেম্বর। প্রায় দুই মাস পরে ২৬ জানুয়ারী ১৯১৪ খগেন্দ্র চৌধুরী, [ ওরফে সুরেশ ] বরাহ নগরে ভিক্টোরিয়া রোডের বাড়ীতে ধৃত হয়!

দায়রার বিচার করেন আলিপুরের অতিরিক্ত জজ মিঃ প্যানটন [ পরে হাইকোটের বিচারপতি ] রাজাবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে আপিলে হাইকোর্টের তিনজন জজই একমত হইয়া বলেন—"শশাঙ্ক এই ষড়যন্ত্রের প্রধান ব্যক্তি এবং যদিও ভারতবর্ষের বাহিরে তাহার নির্মিত বোমা ব্যবহৃত হইতেছে প্রমাণ নাই কিন্তু ভারতের নানাস্থানে যে উহার ব্যবহার হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত।

আপিলের বিচারে দীনেশ, সারদা, চন্দ্রশেখর, কালিপদ [ ওরফে উপেন্দ্র ] মুক্তিলাভ করে। ইতিপূর্ব্বে আলিপুরের জজ তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের [ওরফে অমৃত হাজরা] পোনের বৎসরই দ্বীপান্তর বহাল থাকে! বরাহনগরে মোকদ্দমায় খগেন্দ্র চৌধুরী এবং তাহার সঙ্গীর তিন বৎসর জেল হয়। তাহাদের কাছে রিভলভার পাওয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে মিঃ ডেনহাম ছিলেন সংবাদ বিভাগের বড় কর্ত্তা [ D. I. G. I. B ] মিঃ টেগার্ট ও মিঃ বার্ড তাহার সরকারী ছিলেন।

এই রাজাবাজার মোকদ্দমার সাক্ষীর সময়ে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ ময়মনসিংহের ইন্‌স্‌পেক্টর বঙ্কিম চৌধুরীকে যে বোমার সাহায্যে হত্যা করা হয় ইনস্‌পেক্টর শরৎ মুনসী রাজাবাজার বোমার সাদৃশ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। বঙ্কিম চৌধুরী—ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম তদন্তকারী ছিল, এবং শরৎ ঘোষের মামলা উপলক্ষ্যে ঢাকা কোতোয়ালীর ভার প্রাপ্ত অফিসার

রূপে প্রথম এতলাই বিচারের উপযোগী করিয়া বদলাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া কৌঁসিলি জে. এন. রায় বিচারকের নিকট বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সওয়াল জবাব করেন।

রাজাবাজার কারখানার সংশ্লিষ্ট অন্যতম পুলিশ ইনস্‌পেক্টর নৃপেন্দ্র ঘোষকে (১৯১৪, ১৯ জানুয়ারী) চীৎপুর রোডে হত্যা করা হয়। আসামীকে ধৃত করিবার চেষ্টায় নিকটস্থ দোকানদার অনন্ত তেলি নিহত হয়। নির্ম্মলকান্ত রায় নামক এক যুবক অনেক ধস্তাধস্তির পর ধৃত হয়। ইনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রজনী গুপ্ত মহাশয়ের দৌহিত্র। নির্মল তখন সেণ্ট্রাল কলেজে এফ এ পড়িত। তাহাকে দেখিতে যেমন সুশ্রী ছিল পড়াশুনায়ও ছিল তেমনি ভাল। সে মানিকতলার একটি মেসে থাকিত। নির্ম্মল বিশেষ সেবাপরায়ণ ও পরোপকারী ছিল। একবার নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জল হইতে একটী ছেলেকে উঠাইয়াছিল।

বিচারে, ব্যারিষ্টার নর্টন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, এটর্নি হীরেন্দ্র দত্ত ইঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। প্রথমবার বিচারে খুনের অভিযোগ হইতে সে মুক্ত হয়। একটি চার্জ্জে সকলে একমত হন না (৫ : ৪)। দ্বিতীয়বার বিচারেও ১লা এপ্রিল অধিকাংশ জুরী (৭:২) তাহাকে নির্দ্দোষ বলেন। কিন্তু জজ এবারও পুনর্বিচারের কথা বলে, কিন্তু তৃতীয় বার (৮ই এপ্রিল ১৯১৪) বিচার প্রার্থনা না করিয়া সরকার মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লন।

কিছুদিন পরে ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, মদন ভৌমিক প্রভৃতি ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়। ইহাই অতিরিক্ত বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। এই সময় ১৯১৪ সালের ২রা আগষ্ট ১ম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ বাধে। এই সময় যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয় সে সম্বন্ধে পরে বলিব। এই সময় যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলার সমস্ত বিপ্লবী দল মিলাইতে চেষ্টা করেন। সমস্ত দলই মিলিত হয়! কিন্তু অনুশীলন দলের যাঁহারা বাইরে ছিলেন নেতাগণের অনুপস্থিতিতে তাঁহারা এই সম্মিলিত দলে যুক্ত হন নাই। অন্যান্য দলের সহিত অনুশীলন সমিতির দল নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য মিলিত না হইলেও বিপ্লবাত্মক কার্য্য তাহারা সমানে চালাইয়া যাইতেছিল।

শৃঙ্খলা হিসাবে অনুশীলন সমিতির সভ্যরা বেশ উন্নত ছিল। অনুশীলন সমিতির বাঙ্গলার বাহিরের দল রাসবিহারীকেই অধিনায়ক স্থির করিয়াছিলেন।

রাসবিহারীর নেতৃত্বে বিপ্লবাত্মক কার্য্যে তাহাদের সমান উৎসাহ ছিল, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ শচীন সান্যালের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে। শচীনবাবু লিখিয়াছেন :—

"পুলিন বাবুর পর যাহারা ঢাকা সমিতির নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশের বিভিন্ন দল মিলিয়া সম্পূর্ণরূপে একমত হইতে না পারিলে দেশের মঙ্গল নাই। তাই তাঁহারা দেশের সকল দলের সহিতই মিলিতে ইচ্ছুক হইলেন। সম্ভবতঃ সেইজন্যই বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে ঢাকা সমিতি চন্দননগর দলের সহিত মিলিত হইয়া যায়। কাশীর দলও এই ঢাকা সমিতির মারফতই রাসবিহারীর উত্তর ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপে আমাদের দল পূর্ব বাঙ্গলা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া এক যোগে কাজ করিতে থাকে। পাঞ্জাবের বিপ্লবীগণের সংবাদ ও অধিকাংশ স্থলে এই ঢাকা সমিতির মারফতই বাঙ্গলার বিভিন্ন দলের নিকট পাঠান হইত। লাহোর, দিল্লী, কাশী, চন্দননগর ও ঢাকার বিপ্লবী দল এইরূপে সর্বাংশে এক হইয়া যায়। একথা কিন্তু বাঙ্গলার অবশিষ্ট বিপ্লবী দল ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।"

অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ও লিখিয়াছেন—

"অনুশীলন সমিতির কর্মীগণ পূর্ব হইতেই গৃহহারা ছিলেন। তাঁহারা ছদ্মবেশে বাংলার সর্বত্রই ছড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ ত্যাগ ও তপস্যার কথা বাঙ্গালী কোনদিন ভুলিবেন না। তাঁহারা কখনও নৌকার মাঝি হইয়া নদী পথে বিচরণ করিতেন। বিপ্লবীর বিচার কালে আদালত প্রাঙ্গণে এক ঝাঁকা ডাব লইয়া বেচিতে বসিয়াছেন। নানা কলেজের ছাত্র হইয়া, বহু গ্রাম্য শিক্ষকের পদ লইয়া ছদ্মবেশে তাঁহারা বাস করিয়াছেন, বিপ্লবযুগে অনুশীলন সমিতির সহায়তা লাভের আশা সকলেই করিতেন। পরবর্তী যুগেও

ব্যাধির প্রবল আক্রমণে মৃত্যুমুখী হইয়াও সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁহারা কখনও বাহ্য আন্দোলনে উন্মত্ত হইতেন না। লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বিপ্লব প্রচারে সর্বদাই রত থাকিতেন।"

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, রমেশ আচার্য্য, প্রতুল গাঙ্গুলি, জ্ঞানেন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আশু কাহিলী লেখকের বিশেষ পরিচিত ও বন্ধু। ইহাদের কর্মশক্তি, সহিষ্ণুতা এবং চারিত্রিক বল দেখিয়া লেখক মতিবাবুর প্রত্যেকটি কথা সমর্থন করেন।

অনুশীলন সমিতির মন্ত্রদাতা মিঃ পি মিত্র এবং সংগঠনকর্ত্তা পুলিন বাবু বিপ্লবযুগের ইতিহাসে একটা প্রধান ও গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

* বঙ্গবাসী ভাদ্র ১৩৩০, বন্দীজীবন

‡ প্রবর্ত্তক ভাদ্র ১৩৫৩,

# অষ্টম অধ্যায়

## ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী—রাসবিহারী বসু

আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মা এবং মাডাম ক্যামার কথা বলিয়াছি। উভয়েই প্যারিসে থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতার উপায় উদ্ভাবনে রত ছিলেন। হরদয়ালও আমেরিকায় থাকিয়া শিখ এবং পাঞ্জাবীদের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে ছিলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ—আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সমগ্র উত্তর ভারতে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে ছিলেন। কেবল উত্তর প্রদেশে নয়, বাঙ্গলার সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

রাসবিহারী বসুর ধারাবাহিক ত্রিশবৎসরের ঘটনাবহুল কার্য্যকলাপ অনুধাবন করিলে মনে হইবে ইহার কর্ম্মপন্থার সহিত মতভেদ হইলেও স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার যে তীব্র আকাঙ্খা ছিল তাহা কেহ সন্দেহ বা অস্বীকার করিতে পারে না। স্বাধীনতা সংগ্রামে রাসবিহারী খাঁটি নায়ক। তাঁহার কোনরূপ নেতা হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, নাম যশ তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। অভিমানও তাঁহার ছিল না। তিনি ইংরাজী, ফরাসী, বাঙ্গলা, হিন্দি, উর্দ্দু, গুরমুখী, মারহাটি, গুজরাটি—প্রভৃতি ভাষা জানিতেন আর সকল সময়ে, সকল অবস্থায় পুলিসের চক্ষে ধূলা দিয়া এমন ভাবে পোষাক বদ্‌লাইয়া ফেলিতে পারিতেন, অতি অন্তরঙ্গ ব্যক্তিও তাহা ধরিতে পারিত না। দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়ই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান, গভীর পরিতাপের বিষয় আর তিনি জন্মভূমির ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পাইলেন না। 'আজাদহিন্দ গভর্ণমেণ্ট' ও 'আজাদহিন্দ ফৌজ' তিনি গঠন করিয়া নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেন। দেশের স্বাধীনতা তিনি দেখিয়া যান নাই

বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তিনি স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়াই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

১৮৮৪ খৃ: অ: বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারী জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি কালনা ষ্টেশনের ৩৪ মাইল পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে! তাঁহার পিতা বিনোদ বিহারী বসু সিমলাতে সরকারী ছাপাখানার প্রধান সহকারী ছিলেন ( Head Assistant )। ৬।৭ বৎসর বয়সেই রাসবিহারীর মাতার মৃত্যু হয়। নিজ গ্রাম প্রায় জলে ভাসিয়া যাইত বলিয়া পত্নীবিয়োগের পর বিনোদবাবু চন্দননগর ফটক গোড়ায় একটি বাটী করেন। রাসবিহারী ডুপ্লেকলেজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী ( বর্ত্তমান class ix ) পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেন, স্কুলের পড়াশুনা তাঁহার ভাল না হইলেও তিনি ইংরাজি লিখিতে, বলিতে ও অনুধাবন করিতে খুব ভালই পারিতেন। তাঁহার রচিত বহু ইংরাজি প্রবন্ধ আছে, এবং তাহা অমৃতবাজার প্রভৃতি কাগজে বাহির হয়। পড়া ছাড়িবার পর তিনি সিমলাতে পিতার নিকট আসিতেন এবং নানা প্রদেশের লোকের সহিত মিশিয়া নানা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে অভ্যস্ত হন। ছোট-খাটো বিষয়ের মধ্যে পাহাড়ে একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়া যে গহ্বর করিয়াছিলেন—তাহা দেখিয়া বন্ধুবান্ধবরা তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির ভূয়শী প্রশংসা করে।

বাল্যকাল হইতেই রাসবিহারী নানাপ্রকার ব্যায়ামসাধ্য ক্রীড়ায় পটু ছিলেন। তিনি সঙ্গীদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন, তাহারা তাঁহার সঙ্গ পাইলে বিশেষ আমোদ পাইত। তাঁহার মন ছিল অত্যন্ত সহানুভূতি পূর্ণ, কাহারও কোন প্রকার উপকার করিতে পারিলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। এই সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা তাঁহার চরিত্রে বাল্যকাল হইতে দেখা যাইত।

তাহার রং ছিল ময়লা, কিন্তু স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। তিনি বিশেষ ভোজন-পটু ছিলেন।

১৯০৮ সালে, ২রা মে মুরারী পুকুর উদ্যান তল্লাসে রাসবিহারীর দুইখানি

পত্র পাওয়া যায়। সেই দুইখানি পত্রে তাহার বিপদাশঙ্কা করিয়া শশীভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয় তাহাকে দেরাদুনে তাঁহার নিজের শিক্ষকতাটি দিয়া পাঠাইয়া দেন। সেখানেই তিনি কয়েকমাস মধ্যেই বনবিভাগের একটি কাজে নিযুক্ত হন।

এবার আমরা পাঠককে ১৯১০।১১ খৃঃ লইয়া যাইব। এই সময় রাসবিহারী দেরাদুনে ফরেষ্ট রিছার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে হেডক্লার্ক, বেতন পান একশত টাকা; তবে তথাকার সাহেবরা তাঁহার নিকট হিন্দী ও বাঙ্গালা পড়িত—ইহাতে তাঁহার বেশ কিছু আয় হইত। রাসবিহারী দেরাদুন হইতে মধ্যে মধ্যে চন্দননগরে আসিতেন এবং অরবিন্দ অনুপ্রাণিত চন্দননগর-সমিতিতে যাইতেন। সমিতির আদর্শবাদ ও যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহার ভাল লাগিত। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় ছিলেন তাঁহার বন্ধু এবং শ্রীশচন্দ্র ঘোষ সমপাঠি ও আত্মীয়*। রাসবিহারীর সহোদরা ভগ্নী বালবিধবা সুশীলা, মাসীমা ব্রজবালা ঘোষের সঙ্গে কাশীবাস করিতেছেন। তাঁহার দুইটি বৈমাত্র ভাইও রহিয়াছেন।

দেরাদুনে রাসবিহারী পূর্ব্বে এক বাসায় থাকিতেন, পরে উহা পরিবর্ত্তন করেন। ১৯১১ নভেম্বর হইতে ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট পর্য্যন্ত শঙ্কর লাল মুদির চৌবারায় অবস্থান করেন। তিনি যে অর্থ আয় করিতেন তাহা হইতে মাত্র ২০টি টাকা নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সবই জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল দুঃস্থ অসহায় নরনারীর সেবায় ব্যয় করিতেন। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট তিনি 'বোসবাবু' বলিয়া পরিচিত ছিলেন আর সাহেবরা বলিত Mr. Bose. তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতেন বলিয়া সাহেবরা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত! হিন্দুস্থানীরা বলিত 'বোসবাবু দেবতা হ্যায়' আর সাহেবরা বলিত Mr. Rasbehari Bose is an angel'

• এই শশীবাবু অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে মিঃ মিত্রের সহকারী ছিলেন। এবং বিশেষ ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পরে দৌলতপুর কলেজেও অধ্যাপনা করিতেন। ইহার নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার তেঘরা।

• রাসবিহারী শ্রীশবাবুর কাকীমার বোনের ছেলে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাসবিহারী চন্দননগরে আসিয়া অরবিন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বুঝিলেন মর্লি মিণ্টো শাসন সংস্কার উপহাস মাত্র, বুঝিলেন, কেন অরবিন্দ ইহার বিরুদ্ধে গিয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মনে প্রাণে বুঝিলেন ইংরাজ শাসনের অবসান না হইলে এদেশের কোন আশা ভরসা নাই। শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ যোগ [ Joga of Consecration ] তিনি গ্রহণ করিলেন।

রাসবিহারী স্থির করিলেন, মুরারীপুকুর দল ও ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যেরা যাহা করিয়াছে, সুনিয়ন্ত্রিত হইলে এই সকল লোক দ্বারাই অসাধ্য সাধন হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি চন্দননগরের অনুপ্রেরণায় উত্তর ভারতীয় যুবকদের লইয়া দল গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন।

এই সময় অনুমান ৪৫ বৎসর বয়স্ক এক শিক্ষকের সহিত দিল্লীতে তাঁহার পরিচয় হয়। ইনি দিল্লীর সেণ্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন এবং পাদরী সাহেবদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ইনিই স্বামী রামতীর্থের প্রধান শিষ্য আমির চাঁদ।

আমির চাঁদই অতঃপর রাসবিহারীকে অবোধ বিহারী, বালমুকুন্দ, রঘুবর শর্ম্মা, বালরাজ, হনুমন্ত সহায় ও দীননাথ তলোয়ার প্রভৃতির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইহারা সকলেই হরদয়ালের ভক্ত ও অনুবর্ত্তী ছিলেন। এই ভাবে ক্রমে হরদয়ালের সহিত রাসবিহারীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

## হরদয়াল

হরদয়াল দিল্লীর বাসিন্দা, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিয়া তিনি একটী ষ্টেট্ স্কলারসিপ, (বৎসরে দুইশত পাউণ্ড বৃত্তি) পান, তাহাতে অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯০৬ ও ১৯০৮ দুই বছর তিনি ভারতে আসিয়া লাজপত রায়ের বাড়ী থাকেন এবং উহার সহিত যোগাযোগ করেন। দ্বিতীয় বারে বিলাত প্রত্যাগত হইয়া গভর্ণমেণ্টের অবশিষ্ট বৃত্তির টাকা গ্রহণ

করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহার পড়াশুনা এইখানে শেষ হয়, কিন্তু প্রবাসে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের নানা সমিতি হইতে তিনি সাহায্য পাইতেন। অনেকেই মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইত। হরদয়ালের স্বাধীনতা প্রীতি লাহোর ও দিল্লীর সভ্যগণকে স্পর্শ করে। এবং তাঁহারা ভবিষ্যৎ কাজের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। হরদয়াল তাঁহার অনুচরগণকে The Career of a Nihilist, the war of Independence এবং Terror under conspiracy প্রবন্ধ পড়িতে দেন।

লালা লাজপত রায়ের অন্যতম সঙ্গী সর্দ্দার আজিত সিং অন্তরীন হইতে মুক্তিলাভ করিবার পরে ইউরোপ চলিয়া যান। সেখানে হরদয়ালের সঙ্গে সর্দ্দারজীর এবং ঠাকুর দাস ( ফেরারী আসামী ) এবং সুফী অম্বা প্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। হরদয়ালের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে স্বাধীনতাকামী যে সমস্ত যুবক বিলাত যান তাহাদের মধ্যে ভাই পরমানন্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাইজীর আশা ছিল ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করুক, আর উহার শাসনতন্ত্র নেপালের মহারাজের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হউক।

হরদয়াল অতঃপরে কালিফর্ণিয়া হইতেই যে 'গদর' পত্রিকা বাহির করেন সেই বিষয়ে পরে বলিব। লালা লাজপত, শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মার নিকটে টাকা চাহিয়া পরমানন্দকে চেষ্টা করিতে লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক রাসবিহারী চন্দননগর হইতে ঘুরিয় আসিবার পরে লাহোরের দিকে তাহার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলা বাহুল্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিশ্বাস করিত বলিয়া তাহাদের অনেক কথা তাঁহার জানিবার সুবিধা হইয়াছিল। তিনি দিল্লীর আমির চাঁদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং লাহোরেও দীননাথের সহযোগিতায় বালমুকুন্দ, বালরাজ আবেদ বিহারী প্রমুখ যুবকের সহিত পরিচিত হন। আবেদ বিহারী ও আমির চাঁদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল, বালরাজ লাহোর সেণ্টাল ট্রেনিং কলেজে পড়িত।

রাসবিহারী ভিত্তি করিলেন মিণ্টোমর্লি সংস্কারের উপরে। তিনি বুঝাইতে লাগিলেন মিণ্টোমর্লি সংস্কারে আমরা কিছুই পাই নাই। এখন স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। **The life of a man is for working**

independence. সমস্ত বিদেশী শ্বেতাঙ্গগণের বধসাধনাই (General massacre of all foreigners in India. আমাদের প্রধান কাজ"। রাসবিহারী আরও বুঝাইয়া বলেন আমাদের আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় নয়, আমাদের আন্দোলন নির্ভর করিবে আত্মত্যাগের উপরে। ভারত ইউরোপ নয়। এখানে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগী হইতে হইবে। গীতার উপরে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। এইরূপে বন্ধুগণকে নিজের মতানুবর্ত্তী করিয়া, রাসবিহারী 'লিবার্টি' পত্রের খসড়া করেন। আবেদ বিহারী পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া উহা কর্পূরতলা হইতে মুদ্রিত করিয়া আনে। বালমুকুন্দ লোক বাছিয়া তাহাদের মধ্যে উহা বিতরণ করে ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেয়। এইবারে আমরা বসন্ত বিশ্বাসের কথা বলিব।

## বসন্ত বিশ্বাস কে ?

উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চন্দননগর সমিতির অন্যতম সভ্য। তিনি কলেজ ষ্ট্রীটে ওভারটুন হলের নীচে যে "শ্রমজীবি সম্প্রদায়" করেন,সেখানে বিপ্লবীদের পরস্পর মিলন হইত। এইখানে নদীয়া জেলার পোড়াগাছ নিবাসী মন্মথ বিশ্বাসের সহোদর বসন্ত বিশ্বাস কাজ করিত। উহার বয়স ছিল ১৫।১৬ বৎসর। কাজের উপযুক্ত লোক মনে করিয়া রাসবিহারী অমরবাবুর সম্মতিক্রমে বসন্তকে লইয়া দেরাদুনে চলিয়া যান। এবং কিছু দিন পরে বালরাজকে বলিয়া লাহোরে তাহার একটী চাকুরী করিযাদেন। বালরাজের পিতা ছিলেন আর্য্য সমাজের অধিনায়ক, লাহোরে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বালরাজ বসন্ত কুমারকে লাহোরে লালা অমরনাথের 'পপুলার' ডিস্পেন্সারীতে কম্পাউণ্ডারের কাজে ভর্ত্তি করাইয়া দেন।

এই সময়ে একটি সুযোগ আসিল। তখন আন্দামানে যে সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদী ছিল, বারীন্দ্রঘোষ, উল্লাস দত্ত, হেমদাস, উপেন বন্দোপাধ্যায়,পুলীন দাস, সুরেশ সেন, শচীন্দ্র মিত্র প্রভৃতিদের উপরে বড় অত্যাচার হইত। তাঁহাদিগকে

দিয়া লবণের বস্তা উঠান হইত, তাঁহাদের ছোবরা পিটাইতে হইত ; কাহাকে কাহাকে ঘানিতে দেওয়া হইত। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়াই মুরারীপুকুর মোকদ্দমার ইন্দুভূষণ রায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন এবং অনেকেই কঙ্কালসার হইয়াছেন। প্রতিকারের জন্য ভারতগভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে ভারতবর্ষে আসিয়া বঙ্গভঙ্গ রদ ও দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের আদেশ দিয়া যান। এবং ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা খুব শান্তিপূর্ণ বলিয়া প্রশংসা করেন। রাসবিহারী বুঝিলেন পদস্থ ইংরাজ শাসক হত না হইলে, ভারতের অবস্থা ইংরাজের কানে পৌঁছিবে না। তাই প্রথমেই তিনি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার আয়োজন করিলেন।

## লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি বোমা নিক্ষেপ

১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক শোভাযাত্রা করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'দেওয়ান আম্'এর দিকে যাইতেছিলেন। নূতন রাজধানী দিল্লীতে তিনি রাজকীয় ক্ষমতা প্রথমে গ্রহণ করিবেন। তিনি হাতীতে চড়িয়া কুইনস গার্ডেন হইয়া চাঁদনী চক্ দিয়া যাইতেছিলেন। কত রাজা মহারাজা, সরকারী কর্ম্মচারী, সাধারণ লোক, সৈনিক বাহিনী প্রভৃতির একটি বিরাট শোভাযাত্রা আসিতেছিল। লোকের অসম্ভব ভিড় আর বাদ্যবাজনা। কে কাহার দিকে তাকায়, কে কাহার কথা শুনে, সকলের দৃষ্টিই সপত্নীক লাটসাহেবের উপরে নিবদ্ধ। দর্শকের অন্ত নাই। বিভিন্ন বাড়ীতে বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাঞ্জাব ন্যাসনাল ব্যাঙ্কের বাড়ীটি তিনতলা, এখানে প্রায় দেড়শত দুইশত লোক একত্রিত হইয়াছে। দোতলা ঘরও বারেন্দায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থান। বসন্তও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বেশে সেমিজ শাড়ী পরিয়া সেই দলেই থাকিয়া শোভাযাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

সে ১৯শে ডিসেম্বর লাহোর হইতে রওনা হইয়া দিল্লী পৌছিয়াছিল। সেই জনতায় বসন্তকে বড় সুন্দর মানাইতেছিল। তাহার হাতে লুক্কাইত বোমাটি কেহই দেখিতে পায় নাই। শীতকাল, গায়ে গরম কাপড়ও ছিল। বসন্ত একেবারে সম্মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। মুখে যেন রংটা একটু বেশী ছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল 'তেরি নাম ক্যা বহিনি', বসন্ত হাসিয়া উত্তর করিল মেরি নাম্ লীলাবতী। মেয়েটি পুনরায় অন্য দিকে চাহিল। বসন্ত বেশী কথা কহে না। শোভাযাত্রার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

চতুর্দ্দিকে প্রহরী কিন্তু তেমন সতর্ক নয়। বড়লাট বুঝিয়াছিলেন যে অসন্তোষের হেতু বঙ্গচ্ছেদ রহিত করিয়া বাঙ্গালী বিপ্লবীগণের মনোরঞ্জন করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন। তাই বাঙ্গালী বিপ্লবী তাঁহার উপরে অস্ত্রক্ষেপ করিবে না। তিনি পত্নী লেডী হার্ডিঞ্জ সহ হাসিতে হাসিতে কথা বলিয়া আসিতেছেন। এদিকে বসন্ত দেখিল সকলের দৃষ্টি শোভাযাত্রার দিকে নিবদ্ধ। দেখিল এইতো সুযোগ উপস্থিত, কিন্তু কে একজন তাহার দিকে চাহিয়াছিল অমনি লীলাবতী ( স্ত্রীবেশী বসন্ত ) বলিল 'বড় আজব, সাম্‌নে দেখো বহিনী।"

মেয়েটি চোখ ফিরাইল আর বসন্তও অলক্ষ্যে বড়লাটের দিকে তাহার লক্ষ্য ছুঁড়িল। কেহ দৃষ্টি করিল না। স্বয়ং লর্ড হার্ডিঞ্জও নয়। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যস্থ দিয়া কি একটা গিয়া একেবারে পশ্চাতে চোপ্‌দারের উপরে পড়িল। সে ঢলিয়া পড়িতে লেডী হার্ডিঞ্জই প্রথমে লাটসাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। পশ্চাতে চাহিয়া একেবারে তড়িতাহতের মত নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। তাঁহারও পৃষ্ঠভাগে বোমার ছিট্‌কানি ( Splinters ) আসিয়া লাগিল। ক্ষণকালমধ্যে তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

কি হইল, কি হইল, চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল—কে কাহাকে দেখে—নিজের প্রাণ লইয়া সকলেই ব্যস্ত।

মাহুত হাতী থামাইল, শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হইল। অবিলম্বে বড়লাট

বাহাদুর হাস্‌পাতালে স্থানান্তারিত হইলেন। তাঁহার দেহ হইতে বোমার প্রোথিত অংশগুলি বাহির করা হইল, তিনি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, সমস্ত রাত্রি অস্থিরভাবে কাটাইলেন। এদিকে স্যার Guy Fleet Wood Wilsen কোনরকমে দরবারের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন।

বসন্ত বোমাটি নিক্ষেপ করিয়াই কৌশলে সরিয়া পড়িল। অদূরে রাসবিহারী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনিই বসন্তকে অপরূপ সজ্জায় ভূষিত করিয়া দিয়াছিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া বসন্তকে লাহোরের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া তিনিও পরের পরের গাড়ীতে দেরাদুন চলিয়া গেলেন। এদিকে ধর পাকড়ের হিড়িক পড়িয়া গেল।

দেরাদুনে সকালে যাহার সঙ্গে দেখা হয়, এই প্রসঙ্গ উঠিলেই রাসবিহারীর ক্রোধের পরিসীমা থাকে না। কি পাশবিক ব্যবহার! বড়লাটের উপরে গুলি! সেই দিনই সন্ধ্যায় বড়লাটের মঙ্গল ও স্বাস্থ্য কামনা করিয়া ও ঐ নৃশংস কার্য্যের নিন্দা করিয়া এক সভা আহূত হইল। সভাপতিই হইলেন রাসবিহারী। ও কি সে জ্বালাময়ী বক্তৃতা! বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপ এই গর্হিত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া (Expresing indignation at the dastardly Crime) কখনও দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কখনও অশ্রুসিক্ত নয়নে ওজস্বিনী ভাষায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। সকলে বলিল 'দেওয়া', সাহেবরা বলিলেন Oh! what an angel Rasbehari!

স্বাস্থ্য ভাল করিবার জন্য বড়লাট বাহাদুর ইহার পর সস্ত্রীক দেরাদুনে সার্কিট হাউসে আসিয়া থাকিলেন। এখানে রাসবিহারীর ছিল অবারিতদ্বার। বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী রাসবিহারীর কাছে বাঙ্গলা পড়িত।

এতবড় একটা প্রলয়কাণ্ড হইয়া গেল কিন্তু কেহই ঘুণাক্ষরেও আততায়ীর কোন সন্ধান পাইল না।

ইহার তিনমাস পরে ১৯১৩, ২৮ মার্চ্চ তারিখে আইনের একটি নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা পিনাল কোডের ১২০ক ধারা। ইহাতে যে খুন করে,

সে ভিন্ন, যদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ পরামর্শ করা হইয়াছে প্রমাণিত হয়, তবে অনুপস্থিত থাকিলেও দ্বিতীয় ব্যক্তিরও সমান দণ্ড হইতে পারে। ইহার পরেই রাসবিহারী প্রমুখ লাহোরের বিপ্লবী দল স্থির করে যে বাঙ্গলার জগৎশীর আশ্রমের ব্যাপারে যে গর্ডন সাহেব লিপ্ত ছিল, এবং যাহাকে খুন করিবার চেষ্টা মৌলবী বাজারে নিষ্ফল হইয়াছে, বোমার আঘাতে যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিজেরই মৃত্যু হইয়াছে, পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত সেই কাপ্তেন গর্ডনকে খুন করিতেই হইবে। এই গর্ডন সাহেবই মৌলবী বাজারে হাকিম থাকিবার সময়ে জগৎশী আশ্রমে নির্দ্দোষীর উপরে অত্যাচার হইয়াছে, নিরীহ ডাক্তার মহেন্দ্রদেকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। সুতরাং ইহার প্রাণনাশ করতেই হইবে।

ইহার পরে গভর্ণর স্যার জেমস্ মেষ্টনকে এবং তারপরে বড়লাট বাহাদুর যখন কর্পূরতলায় আসিবেন তাঁহাকে খুন করিতেই হইবে। আর বড়দিনের সময় সাহেব বিবিরা যেখানে আসিয়া নৃত্য ( Ball dance ) ও আমোদে রত হইবে, সেইখানে বোমা নিক্ষেপ করিতে হইবে। ১৯১৩ সালের মার্চ্চ মাসে রাসবিহারী চন্দননগর হইতে কয়েকটি বোমা নিয়া আসেন।

১৯১৩ সালের ১৭ মে তারিখে লাহোর লরেন্স উদ্যানে উক্ত গর্ডন সাহেব আসিয়াছিলেন। বসন্ত গুপ্ত সাইকেলে চড়িয়া বোমা নিয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে গর্ডন সাহেরের উদ্দেশেই বসন্ত একটী বোমা বাগানের রাস্তায় রাখিয়া আসে। কিন্তু ইহাতে গর্ডন বা অন্য কোন সাহেবের কিছু হয় না; রামপদর্থম নামে দারোয়ানটি নিহত হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের মূল কোথায়, কে এইরূপ কার্য্য করিয়াছে, কয়েকমাস পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ১৯১৩ সালের ২১ নভেম্বর তারিখেই রাজাবাজারে অমৃত হাজরার বাসায় খানাতল্লাস করিয়া একজন সভ্যের পকেটে একখানি সাঙ্কেতিক কাগজ পাওয়া যায়। ইহাতে যাহারা সাহায্য করিত তাহাদের সাঙ্কেতিক নাম লিপিবদ্ধ ছিল। কিছুদিন পরে ইহার অর্থ আবিষ্কার করা

হয় এবং দিল্লীর আমির চাঁদের নাম ও আরও কয়েক জনের নাম ইহাতে থাকায় পুলিশের পক্ষে ইহা বিশেষ সহায় হইল।

কলিকাতা পুলিশের ডি, আই, জি ডেনহাম সাহেব এই কাগজের সহায়তায় দিল্লীর ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

আমির চাঁদের বাড়ীতে 'লিবার্টি পত্র' এবং দীননাথ তলোয়ার প্রভৃতি কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। যখন দিল্লীতে ধর-পাকড় হইতেছে, রাসবিহারী তখন লাহোরে গিয়াছিলেন। দয়ানন্দ এঙ্গলো বৈদিক কলেজের একটী ছাত্র আসিয়া রাসবিহারীকে রাত্রে খবর দিল, এই লাহোরেই দীননাথ ধরা পড়িয়াছে। সেই রাত্রেই, ১৯ ফেব্রুয়ারী, রাসবিহারী দিল্লী চলিয়া যান। তখনও রাসবিহারীর নাম বাহির হয় নাই। দুই একদিন পরে দীননাথ পুলিশের কাছে (২১শে ফেব্রুয়ারী) সব কথা স্বীকার করিয়া ফেলে। পুলিশ তখন জানিতে পারে রাসবিহারী ১৯শে ফেব্রুয়ারীও লাহোরে ছিল। পুলিশ তখন ভারী বিমর্ষ হইল কারণ একদিন আগে জানিলেই তাহার ভয়ানক বিপদ হইত।

বিচারের সময়ে দীননাথ রাজসাক্ষী হয়। সুলতানচাঁদও স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হয়। বিচারে সকলেরই দণ্ড হয়। বালরাজ ও বসন্ত-কুমারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, আর আমিরচাঁদ, বালমুকুন্দ, ও আবেদ বিহারীর ফাঁসির আদেশ হয়। বালমুকুন্দ ভাই পরমানন্দের খুড়তুত ভাই।

দীননাথ তলোয়ার, হরদয়াল এবং রাসবিহারী উভয়েরই বড় প্রিয় ছিল কিন্তু আজ সে বিশ্বাসঘাতকতা করিল! দীননাথের সাক্ষীতেই পাওয়া যায়—"রাসবিহারী বলিতেন জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার এইরূপ রাজনৈতিক খুনের প্রয়োজন হইয়াছে, তারা ভয়ানক জড়তায় অভিভূত, ঘোর নিদ্রিত, দেশবাসী এখন বুঝিতে পারেনা বিদেশী শাসন আমাদিগকে কিরূপ পঙ্গু করিয়াছে। এইরূপ কার্য্যের ফলেই ক্রমে প্রকাশ্য বিদ্রোহ সম্ভব হইবে। ভারতের বাহিরে এখনই হাজার দশেক লোক আমাদিগকে সাহার্য্য করিতে প্রস্তুত।"

দীননাথ আরও কুড়ি বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার পরে হরিদ্বার গিয়া গঙ্গাস্রোতে

ডুব খাইয়া অসুস্থ হয়, তাহাতেই একমাত্র স্ত্রী শকুন্তলা ও দুই সহোদর ভ্রাতা রাখিয়া মারা যায়। এই বিশবৎসর পর্য্যন্ত তার প্রাণের আতঙ্ক এক-দিনের জন্যও অন্তর্হিত হয় নাই। শকুন্তলা তাহার জন্য প্রায়ই শঙ্কিত থাকিত।

এই মোকর্দ্দমাই 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা' নামে অভিহিত। ১৯১৪ সালের ২৩ মে তারিখে এই মোকর্দ্দমা আরম্ভ হয়। দিল্লী দায়রা কোর্টে জজ ছিলেন মিঃ হ্যারিসন। ইহার কয়েকমাস পূর্ব্বেই ধরপাকড় আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সময়ে রাসবিহারী ছিলেন কখনও অমৃতসরে, কখনও লাহোরে, কখনও দিল্লী কখনও কাশী, আবার কখনও কলিকাতা ও চন্দননগরে। তাঁহাকে কেহ ধরিতে পারে নাই। তিনি তখনও দেরাদুনে কাজ করেন, তবে কয়েকটা দিন ছুটিতে ছিলেন। দিল্লী ও লাহোরে যখন ধরপাকড় হয়, তখন তিনি নানাস্থানের সৈন্যগণকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন। যখন দীননাথকে ধরা হয়, রাসবিহারীর ট্রাঙ্ক এবং কাপড় জামাও দিল্লীতে পাওয়া যায়। এমন কি কোন অফিসের সার্টিফিকেট এবং কাগজ-পত্রও পুলিসের হস্তগত হয়। কিন্তু তিনি যে বাটীতে ছিলেন, পুলিস তাহার সন্ধান পাইল না পুলিসের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি দিল্লী চলিয়া গেলেন।

ষ্টেশন হইতে আমিরচাঁদের বাড়ী রওনা হইলেন। পথে তাঁহার ভৃত্যকে খাবার হস্তে দেখিয়া আমীর চাঁদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, ভৃত্য সতর্ক করিয়া দেয়—"বাবু আমাদের বাড়ী যাইবেন না। বাবুজীকে পুলিস ধরিয়া নিয়া গিয়াছে।"

রাসবিহারী সেখান হইতে চন্দননগরে চলিয়া যান। এখানে প্রায় আট দশ মাস ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমারের পক্ষ সমর্থনের জন্য Mr. S. K. Sen ব্যারিষ্টারকে পাঠাইয়া দেন। দিল্লীর উকীল বাবু সমরেন্দ্র নাথ বসু বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে মামলার প্রাথমিক অবস্থায় বেয়াড়া হাকিমকে সোজা করিবার জন্য নিয়া আসেন।

তিনি ৩।৪ দিনের জন্য আসিয়াছিলেন। সাক্ষীসাবুদ ও বিচারের ফলে আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ ও আবেদ বিহারীর ফাঁসীর হুকুম হয়। ইহারা তিনজনই ছিলেন বয়স্ক, প্রায় ৪০ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স। তাঁহার স্ত্রী রামরাখি স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনিয়া শোকাবেগে সেইদিনই প্রাণত্যাগ করলেন।

বসন্তকুমারের অল্প বয়স থাকায় তাঁহাকে জজ সাহেব যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট লাহোর হাইকোর্টে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করিলে তাহারও মৃত্যুদণ্ড হয়। যথা সময়ে বসন্ত বিশ্বাসেরও ফাঁসী হইয়া যায়।

বালরাজের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ইহার পিতা ছিলেন আর্য্য সমাজের প্রধানতম ব্যক্তি।

ষড়যন্ত্রের সময় দেওয়া হইয়াছিল ১৯১০ সালের অক্টোবর হইতে ১৯১৪ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত। দিল্লীতে যখন ধর পাকড় হয়, তাহার পূর্ব্বে রাসবিহারী কাশীতেই অনেক সময় থাকিতেন। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেও তিনি কাশীতে ছিলেন। পরেও কাশীতে যান ও থাকেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি দেরাদুনের কাজে ছুটি নিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বাহির হইয়া যাইবার পরে আর কাজে যোগদান করেন নাই। তাঁহার গতিবিধিসম্বন্ধে উভয় দণ্ডের কাউন্সিলই বক্তৃতায় বলেন যে রাসবিহারী একটী পরীরাজের মত আজ লাহোরে কাল কলিকাতায়; আজ পাঞ্জাবী, কাল বাঙ্গালী; আজ গুম্ফ-শ্মশ্রুমণ্ডিত, কাল একেবারে সাদা মুখ। বেশ পরিবর্ত্তনে তিনি ছিলেন ওস্তাদ, আর বহু ভাষা জানিতেন বলিয়া সব অবস্থায়ই আত্মগোপন করিতে পারিতেন।

"Rashbihari floats down Lahore into the Precidency of Bengal. He goes down with a moustache and comes up clean shaven—He goes down a Punjabi but comes a Bengali."

পুলিশ নিঃসন্দেহে তাঁহার নাম জানিবার পরে, তাহার নামে ৭৫০০৲ টাকার পুরস্কার ঘোষণা হয়, অর্থাৎ কেহ ধরাইয়া দিতে পারিলে এই পুরস্কার পাইবে। পরে ইহা বাড়াইয়া সাড়ে বার হাজার করা হয়।

কাশীতে প্রথমে তিনি অনেক সময় মিছরী পোক্‌রায় থাকিতেন। এখানে প্রায় ৮।১০ মাস ছিলেন। এখানে কখনও নাম দেন নরেন সেন, কখনও নরেন ঘোষ, কখনও বা সুরেন দত্ত। আশুদত্ত রায় নামে একটি তাঁহার লোক রান্না করিয়া দিত। এখান হইতে অমৃতবাজার পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। রাসবিহারীর এই সময়কার লিখিত Repeal of the Arms Act খুব সুলিখিত প্রবন্ধ।

কাশীতে শচীন সান্যাল রাসবিহারীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। বেনারস, সিকোল, দানাপুর, জব্বলপুর, এলাহাবাদ, মীরাট, দিল্লী, রাওলপিণ্ডি ও লাহোরের সমস্ত সিপাহীদলের একই সময়ে উত্থানের পরামর্শ শচীন সান্যালের সহযোগিতায়ই হয়। হিরণ্ময় ব্যানার্জ্জি নামক একটী যুবক অমৃত হাজরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই যুবকের মারফতই সংবাদ, বোমা ও রিভলভার চালাচালি হইত। সমস্ত স্থানের বোমার কার্য্য যেন রাসবিহারীর ইঙ্গিতেই হয় বলিয়া মনে হইত।

শচীন সান্যাল ঢাকা অনুশীলন সমিতির কাশী শাখা সমিতির অধিনায়ক ছিলেন এবং উক্ত সমিতির কার্য্যধারাতেই অনুপ্রাণিত ছিলেন। অমৃত হাজরাও ঢাকা অনুশীলন সমিতির খুব কৃতকর্ম্মা সভ্য ও অন্যতম স্তম্ভ ছিল।

রাসবিহারীর সঙ্গে অমৃত হাজরারও বিশেষ যোগাযোগ ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালাদেশে যদিও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অনেকগুলি দল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল; অনুশীলন সমিতি কিন্তু রাসবিহারীকেই নেতা বলিয়া জ্ঞান করিত। এই সম্বন্ধে শচীন সান্যালও লিখিতেছেন—"ঠিক বলিতে গেলে বাঙ্গালার এই সময়ে দুইটি মাত্র বিপ্লবদল ছিল! একটির নেতা ছিলেন যতীনবাবু। দ্বিতীয় দলকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, একটি বাঙ্গালার বাইরে কাজ করিতেছিল, অপরটি বাঙ্গালার ভিতরেই নিজেদের কর্ম্মের গণ্ডী সীমাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল! বাঙ্গালার বাহিরের সকল কর্ম্মভার রাসবিহারীর উপর ছিল। কিন্তু বাঙ্গালার ভার কোনও একজন ব্যক্তি বিশেষের উপর ছিল না!" —"নারায়ণ" পৃ. ৫৯৯

অমৃত হাজরার রাজাবাজার বাসায় যে "স্বাধীনতা পত্র" পাওয়া যায় তাহা দিল্লীর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার নথিভুক্ত রাসবিহারী রচিত 'লিবার্টি' পত্রেরই অনুরূপ। যদিও রাসবিহারীর সহিত অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তথাপি মনে হয় রাসবিহারী সকল দলেরই উর্দ্ধে ছিলেন। তিনি ছিলেন সমগ্র বিপ্লবী ভারতের অধিনায়ক। রাওলপিণ্ডি হইতে আরম্ভ করিয়া সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, সাঁওতালী দলের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। যুগান্তর প্রভৃতি অন্যান্য দল যেমন বাঙ্গালাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিয়া বিপ্লবকার্য্য প্রসার করিয়াছিল, রাসবিহারীর দলের সহিত বাঙ্গালার বাহিরে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণও একসঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করে। শচীন সান্যাল তাই ক্রমে রাসবিহারীর দক্ষিণ হস্ত হন। এই বিষয়ে তিনিও মতিলাল বাবুর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন :—

"কাশীর দলও এই ঢাকা সমিতির মার্ফতই রাসবিহারীর উত্তর ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। লাহোর, দিল্লী, কাশী, চন্দননগর, ও ঢাকার বিপ্লবদল এইরূপে সর্ব্বাংশে এক হইয়া যায়।"

দিল্লীর মোকদ্দমার যে ভাবে যবনিকা পাত হইল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বিষয়ে রাসবিহারী স্বয়ংই তাঁহার সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এইখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি—

"এটা ১৯১৪ সাল, আজও যখন আমিরচাঁদ, আবেদবিহারী, বসন্তকুমার, বালমুকুন্দ, পিঙ্গলে, কর্ত্তার সিং, মথুর সিং, জগৎ সিং, নিধান সিং ইত্যাদির কথা মনে পড়ে তখন নয়নধারায় বুক ভাসিয়া যায়। এর কারণ কি? এরাতো আমার আত্মীয় নয়? তবে এদের জন্য আজ পর্য্যন্ত কেন কাঁদি? এরা যে আমার আত্মীয়ের চেয়েও আপনার লোক, এরা যে আমার প্রাণের ভাই। সেই জন্য এদের জন্য এখনও কাঁদি। এদের কথা মনে হইলে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইবার মত হয়। বিপ্লবপন্থীদের মধ্যে একটা গাঢ় ভালবাসা আছে, তা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। নিজেদের বাপ, মা, ভাই, বন্ধুর চেয়েও

এরা পরস্পরকে ভালবাসে। এই ভালবাসা না থাকিলে কেহ কখনও বিপ্লবপন্থী হইতে পারে না এবং বিপ্লবমূলক কার্য্যও করিতে পারে না।" শুনা যায় অর্থাভাবে যখন বিপ্লবের কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখন রাসবিহারী তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু সে প্রস্তাব কেহ সমর্থন করে নাই।

ইহাই রাসবিহারীর পরিচয়। আমির চাঁদ, আবেদবিহারী, বসন্তকুমার, বাল মুকুন্দের কথা দিল্লী ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা সম্পর্কে বলিয়াছি। পিঙ্গলে, কর্ত্তার সিং, মথুর সিং, জগৎ সিং, নিধান সিং প্রভৃতির কথা লাহোর ষড়যন্ত্র ও ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে বলিতে ইচ্ছা করি।

# নবম অধ্যায়

## খুলনা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

ঢাকা অনুশীলন সমিতি যেরূপ অনেকগুলি ডাকাতিতে লিপ্ত হয়, কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সেরূপ না করিলেও ইহার কোন কোন শাখাসমিতিতে বিপ্লবাত্মক কার্য্য হইত। খুলনা এবং যশোহরে কতকগুলি শাখা সমিতি ছিল। শ্রীযুক্ত শচীন মিত্র ছিলেন সাতক্ষীরা সমিতির সম্পাদক*। বিধুভূষণ দে পাইকপাড়ার, অবনীভূষণ চক্রবর্ত্তী ধুলগ্রামের আর সুধীরকুমার দে আল্‌কা সমিতির ভারপ্রাপ্ত কর্মী। শচীন্দ্রবাবুর উপর সাতক্ষীরা ও খুলনা সদর মহকুমা সংগঠনের ভার ছিল। তিনিই এই সমিতি দুইটির প্রধান ও একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন।

---

শচীনবাবু কুমিরার প্রাচীন জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ কালিদাস মিত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন—প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রতিষ্ঠান কমলা বুক ডিপোর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শ্রীঅরবিন্দ বলিতেন গভর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতি (Repression) প্রাবল্যেই বিপ্লবাত্মক (terrorism) কার্য্যের উদ্ভব হইয়াছে। কথাটা বিশ্লেষণ করিলে তাহাই দাঁড়ায়। খুলনা ষড়যন্ত্রের ইহাই কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯০৬ সালের বঙ্গভঙ্গের পরে স্বদেশীর জন্য সর্ব্বত্রই উদ্দীপনা সঞ্চার হয়। খুলনায়ও হইয়াছে। সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। ১৯০৬ সালে খুলনা রাষ্ট্র সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় কপোতাক্ষ নদীতীরে ইস্লাম কাঠি পল্লীতে। সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক সমবেত হয়, আর তাহাদের কার্য্য হয় খুবই শৃঙ্খলাপূর্ণ ও প্রশংসার্হ! কিন্তু পুলিশের ডেপুটি সুপারিটেণ্ডেণ্ট ভবানী নন্দীর এই দৃশ্য চক্ষুঃশূল হয়! তিনি হুকুম দেন "লাঠি হাতে কোন স্বেচ্ছাসেবক মণ্ডপে আসিতে পারিবে না!" এই অন্যায় আদেশে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অসহ্য তিক্ততার সঞ্চার হইল তাহারা লাঠি ছাড়িয়া দিল; কিন্তু পুলিশের ইচ্ছাতে এবং তাহাদেরই প্রকাশ্য সমর্থনে দেখিতে দেখিতে দুই হাজার টাকার খাদ্যভাণ্ডার লুট হইয়া গেল—এই জুলুমের পর হইতেই সমিতিগুলি সন্ত্রাসবাদী হইয়া পড়িল আর দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যোগদান করিতে লাগিল। তাহাদিগকে নিয়মমত দীক্ষা দেওয়া হইত এবং 'মুক্তি কোন পথে' 'বর্ত্তমান রণনীতি' প্রভৃতি পুস্তক পড়িতে দেওয়া হইত। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পাঠে প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। ক্রমে অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হইতে লাগিল। ইহার পরে কয়েকটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়।

শচীনবাবু খলিশখালির জমিদার গোপাল বসু নামে এক ব্যক্তির বাটীতে থাকিয়া শিক্ষকতা করিতেন। ইহা তাঁহার মাতুলালয়ও বটে। ১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি চলিয়া যান। তার পরেই সেখানে একটি ডাকাতি হয়। টাকায় ও গয়নায় প্রায় আড়াই হাজার টাকা অপহৃত হয়। ইহার পরে গোগাছি এবং দক্ষিণদিতে ডাকাতি হয়। ১৯০৯ সালের মে মাসে আবার সস্ত্রীক চন্দননগরের মেয়রকে বোমা মারিবার কথা হয়। কিন্তু এবারও চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯০৯ সালের ১৬ই আগষ্ট নাংলাতে মথুর পোদ্দারের বাড়ীতে ডাকাতি

হয়। এই লোকটি ছিল ভয়ানক সুদখোর এবং অর্থপিশাচ। কলিকাতা ও খুলনা হইতে লোকজন আসিয়া ডাকাতিতে লিপ্ত হয়। ইহাতে মুখোস ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ডাকাতির পূর্ব্ব রাত্রিতে ঐ সমস্ত লোক আসিয়া সাগরদাঁড়িতে অবস্থান করে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও লোহার সিন্দুকের চাবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কারণ চাবিগুলি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদের নিকটে ছিল। তাহাদিগকে কোন প্রকার পীড়ন করা হয় নাই। মৃত্তিকা প্রোথিত টাকারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু এই ডাকাতি উপলক্ষ্যেই যথেষ্ট ধরপাকড় হয়। মৌলবী সামসুল আলম তদন্তের প্রধান কর্ত্তা হন। অবনীভূষণ চক্রবর্ত্তী ধৃত হইয়া হুগলী জেলে প্রেরিত হয়।

কিছুদিন পরে ফুলতলা সমিতির যোগী রায় পুরস্কারের লোভে এবং কতকটা নেতৃত্বপদের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ পুলিসকে অনেক কথা বলিয়া দেয়। তাহাতে কাহাকেও বেনারস হইতে, কাহাকেও ফুলতলা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কাহাকেও কুমিরা হইতে ধৃত করা হয়। শচীন মিত্র অজ্ঞাতবাসে যান। মোট ১২ জন ধৃত হন। যশোহর জিলার বিধুভূষণ দে ( পাইকপাড়া ), অবনীভূষণ চক্রবর্ত্তী ( ধূলগ্রাম ), অশ্বিনীকুমার বসু ( বসুন্দিয়া ), কালিদাস ঘোষ মূলপুর, নগেন্দ্রনাথ সরকার ঐ, নগেন্দ্রনাথ চন্দ ঐ, মোহিনীমোহন মিত্র ঐ, প্রিয়নাথ গুই ( ধূলগ্রাম ), আর খুলনা জিলার সুধীর কুমার দে ( আল্‌কা ), কানাইলাল চক্রবর্ত্তী সাজিয়াড়া, মন্মথ নাথ মিত্র কুমিরা। পরে শচীন বাবু নগেন্দ্রনাথ বক্‌সি উকীলের সহায়তায় কোর্টে হাজির হন্। পুলিস মিথ্যা প্রচার করে যে বিধুভূষণ দে প্রমুখ কয়েকজন সব কথা স্বীকার করিয়াছে। অবনীবাবুও পুলিসকে জব্দ করিবার জন্য ৩০শে সেপ্টেম্বর একটি স্বীকারোক্তি করেন এবং সকলকেই ডাকাতিতে সংশ্লিষ্ট করেন। ইহার পরে তিনি রাজসাক্ষীও হন। এই নাংলা ডাকাতি মোকদ্দমা খুলনা হইতে হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইব্যুন্যালে সোপর্দ্দ হয়। বিচার করেন হাইকোর্টের তিনজন জজ—উড্রফ, ক্যাসপার্স ও নলিনী চ্যাটার্জ্জি। বিচারের সময় অবনী রাজসাক্ষীরূপে

সাক্ষী দেয় যে পুলিসের শেখানো মতে সে ঐরূপ স্বীকারোক্তি করিয়াছে কিন্তু বাস্তবিক কোন কথাই সত্য নয়। এই মোকদ্দমায় অবনীর স্বীকারোক্তিতে ছিল যে লোহার সিন্দুকের ডালাটি উঠান যায় নাই আর মথুর পোদ্দারের কথায় ছিল যে লোহার সিন্দুক খোলা হইয়াছিল। আর সে মিথ্যা খবর দিয়াছিল যে ১০৭০ টাকা অপহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে কিছুই অপহৃত হয় নাই। ট্রাইব্যুন্যালের বিচারে সব কয়জনকেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অতঃপরে অবনীর স্বীকারোক্তির জন্য বিচারে তাহার ৭ বৎসর জেল হয়। অবনী স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিল যে ঢাকার প্রবোধ দাস; বন্দুকের জন্য তাহাকে ৩০০৲ দেয়।

কিন্তু ইহার পরে পুলিশ সবকয়টি ডাকতি যুক্ত করিয়া 'খুলনা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা' খাড়া করে। এবং পূর্ব্বোক্ত সবকয়জনকেই আসামী করে। মোট ১৯ জন আসামীকে পুলিশ চালান দেয়। মাজিষ্ট্রেট ৩জনকে ছাড়িয়া দেয়। তিনজন ফেরার ছিল। বাকী ১৩ জনকে ট্রাইবুন্যালে সোপার্দ্দ করে। এনকোয়ারী হয় গোপনে। সরকার পক্ষে আসেন আলিপুরের সরকারী উকীল নীরদ বন্দ্যোপধ্যায় তদন্ত করেন মৌলভী আলম। আর সাক্ষীদিগকে খুব গড়া পিঠানো হয়।

ট্রাইবুন্যালের বিচারক হন জাষ্টিস হ্যারিংটন, হমউড ও দাস। ১৮ই জুলাই হাইকোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। মিঃ জে এন, রায়, মিঃ নিশীথ সেন, মিঃ শৈলেন সেন আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন। আর সরকার পক্ষে থাকেন এড্‌ভোকেট জেনারেল ডক্টর কেনরিক্ ও মিঃ ই, সি, ঘোষ।

বিচারপতিত্রয় মনে করেন ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হইয়াছে। ফলে ১৯১০ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে অবনী চক্রবর্ত্তী, শচীন মিত্র, অশ্বিনী বসু, বিধুভূষণ দে, নগেন্দ্র চন্দ, ও কালিদাস ঘোষকে ৭ বৎসর করিয়া দীপান্তর দেওয়া হয়। প্রিয়নাথ পাই, নগেন্দ্র সরকার, সুধীরদে কে ৫ বৎসর ও সতীশ চাট্যার্জ্জি ও ব্রজেন দত্তকে তিন বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সতীশ ভট্টাচার্য্য ( ভুগিলহাট, যশোহর ), ব্রজেন্দ্র দত্ত ( বিক্রমপুর, ঢাকা ), সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ( নাংলা, খুলনা ), ইঁহাদের হয় তিন

বৎসর, অবনী চক্রবর্ত্তীর দুই শাস্তিই এক সঙ্গে হয়। অবনী যে বিঘাতি ডাকাতি সম্বন্ধে তথাকার আসামী ললিত চক্রবর্ত্তীকে একরার করিতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে, সেই সম্বন্ধেও একখানি কাগজ সামসুল আলম্ পাইয়া নিম্ন আদালতে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল। মোহিনী মিত্র ও মন্মথ মিত্রকে খালাস দেওয়া হয়।

অবনীবাবু ছিলেন 'খুলনা' পত্রিকার ম্যানেজার। সুধীরবাবু বি, এ পড়িতেন অশ্বিনীবাবু ই. বি রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। নগেন সরকার প্রবেশিকা পড়িতে ছিল, মোহিনী বাবু ছিলেন সিঙ্গার কোম্পানীর ম্যানেজার।

খুলনায় ১৯১০ সালেও কয়েকটি ডাকাতি হয়। যশোহর জিলার ধূলগাঁয়ে হয় ফেব্রুয়ারী মাসে ; তাহাতে ছয় হাজার টাকা অপহৃত হয়। মহিষাতেও হয় জুলাই মাসে।

খুলনা জেলায় সোলোগাঁতিতে ৭ই ফেব্রুয়ারী একটী ডাকাতি হয় ; আবার পরের মাসেই নন্দনপুর একটী ডাকাতিতে ৬৫০০ টাকা অপহৃত হয়। এইসব ডাকাতি লইয়া খুলনা গ্যাঙ্গ ( Gang Case ) নামে একটী মোকদ্দমা খাড়া করা হয়। ৭ জন আসামী হয়, কিন্তু তাহারা অপরাধ স্বীকার করিয়া শান্তিরক্ষা করিবে মুচেলকা দিয়া খালাস পায়।

অতঃপরে আর খুলনায় স্বদেশী ডাকাতির কোন কথা শুনাযায় নাই।

# দশম অধ্যায়

## যতীন্দ্রনাথ ও হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলার অন্যতম সাহসী ও স্বাধীন চেতা বীর। তাঁহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপধ্যায়, নিবাস যশোহর জিলার ঝিনাদহ মহকুমায় বিশয়খালি গ্রামে। তবে তিনি মাতুলালয়েই থাকিতেন। মাতুলবাড়ী নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার অপর পারে কয়া গ্রামে। তিনি মাতুলবাড়ীর সঙ্গেই বেশী সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কৃষ্ণনগরে বড়মামা উকীল বসন্তকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের বাসায় থাকিয়া A. V. School হইতে এণ্টাস পাশ করেন। এই স্কুলে কোন ব্যায়ামাগার ছিল না। কৃষ্ণনগর কলেজে ছিল। ব্যায়াম করিবার জন্য উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ W. Billy এর নিকট হইতে বিশেষ অনুমতি লইয়া তিনি এখানে ভর্ত্তি হন। ব্যায়াম শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়। উপেন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়, ললিত বন্দ্যোপধ্যায় (মিয়াং মিয়ার এড্‌ভোকেট) এবং যতীনবাবুর মাতুল ললিতবাবু ও অনাথবাবু এবং প্রভৃতিও ব্যায়াম করিতেন।

এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া যতীন তাঁহার মেজমামা ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপধ্যায়ের, ২৭৫নং অপার চীৎপুর রোডের বাসায় থাকেন। তাঁহার চতুর্থ মাতুলের নাম অনাথবন্ধু চট্টোপধ্যায়। তিনি নদীয়ার মহারাজার কলিকাতায় এজেণ্ট ও বাঙ্গলা সরকারের সহকারী অনুবাদক ছিলেন। পঞ্চম মাতুলের নাম ললিতকুমার চট্টোপধ্যায়, যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনাও করিতেন।

১৯১০ সালে যতীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ত্রিশ। এই হিসাবে তিনি বোধহয় ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এফ্‌ এ পড়িবার সময় সর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিংও শেখেন এবং পরে সরকারী চাকুরী করেন। আমরা যে সময়ের

কথা বলিতেছি সে সময়ে হুইলার সাহেবের অধীনে তিনি সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপিষ্ট ছিলেন, বেতন পাইতেন মাসে আড়াইশত টাকা। হুইলার সাহেব (Mr. A. H, Wheeler, I. C. S একজন জাঁদরেল সিভিলিয়ান। এক সময়ে বাঙ্গলা সরকার তাঁহার নির্দ্দেশেই চলিত। এই সময়ে তিনি ছিলেন, রাজস্ব সভ্য (Finance Member)। হুইলার সাহেব যতীন্দ্রনাথকে পছন্দ ও বিশ্বাস করিতেন। অনেক রাজা মহারাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া যতীন্দ্রনাথের সহিতই প্রথমে আলাপ করিতেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাপ যতীন্দ্রনাথকে বিশেষ খাতির যত্ন করিতেন।

যতীন্দ্রনাথ অতিরিক্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি 'বাঘা যতীন' নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। একটী ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্যঘ্রটিকে ভোজালির সহায়তায় মারিয়া ফেলিতে সক্ষম হন। ব্যাঘ্র বা সেই জাতীয় পশুর সহিত ব্যবহারে এইরূপ সাহসের আরও পরিচয় আছে। তাঁহার গুরুদেব হরিদ্বারের সাধু ভোলানন্দ গিরি তাঁহাকে 'বাঘের বাচ্চা' বলিতেন। বাঙ্গলায় আর একজন সাহসী পুরুষ ছিলেন ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্ত, তিনি বন্যশার্দ্দুলের সঙ্গেও অকুতো-ভয়ে লড়াই করিতে পারিতেন। আর আটদশ মণ পাথর বুকে রাখিয়া হাতুড়ির পিটুনীতে ভাঙ্গিতে দিতেন। ইনি পরে 'সোহং স্বামী' হইয়া হিমালয় বাস করিতেন। শ্যামাকান্ত ও যতীন্দ্রনাথই বলিতে পারিতেন।

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি<br>
অমারা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি"

যতীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশে বালক ও যুবকগণকে যেমন শরীরে সবল রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে,তেমনি ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বেও তিনি সম্পুর্ণ বিশ্বাস করিতেন। কার্য্যোপলক্ষ্যে প্রতিবৎসরই তাঁহাকে দার্জ্জিলং যাইতে হইত এবং সেখানকার লোকদের কাছে শুনিয়াছি, যে সমস্ত যুবক তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইত, তিনি তাহাদের অনেককে একজোড়া ডাম্বেল ও একখানা করিয়া ভগবদ্ গীতা দিতেন। এই

ব্যাপারে প্রতিবৎসরই তাঁহার বেশ খরচ হইত। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সাক্ষাৎ গীতা।

একসঙ্গে গীতা ও শরীর চর্চ্চা!—পুলিশের নজর তাহার উপর পড়িল; ইহার পরে একটী ব্যাপারে পুলিশের দৃষ্টি আরও প্রখর হইল।

অনুমান ১৯০৯ সালে তিনি কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলং যাইতেছিলেন। ঘুম ষ্টেসনের কয়েকটি মিলিটারী লোকের সঙ্গে রাস্তায় তাঁহার বচসা হয়, ক্রমে বচসা হাতাহাতিতে এবং পরে ঘুষোঘুষিতে পরিণত হয়! সৈনিক কয়জন বেশ শিক্ষা পাইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে একজন লেফটেন্যাণ্টও ছিল। এই ব্যাপারে দার্জ্জিলংএ মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। কথাটা হুইলার সাহেবের কাণেও আসে; তিনি তো হাসিয়াই আকুল। একজন নিরস্ত্র বাঙ্গালীর হাতে চারজন সৈনিক পুরুষ মার খাইয়া আবার নালিস করিতে আসিয়াছে! লেফটেন্যাণ্টকে মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিতে বলেন। যতীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ছিল, এই ব্যাপারে সেই স্নেহ একটুও হ্রাস পায় নাই।

তবে ঘুম দার্জ্জিলংএর খুব কাছে। পাছে সৈনিকেরা প্রতিহিংসাবশতঃ তাঁহার উপরে অতর্কিতেও কোনরূপ জুলুম করে, এইজন্য হুইলার সাহেব কার্য্যের অছিলায় যতীন্দ্রনাথকে কলিকাতা পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অচিরেই এমন কতকগুলি ব্যাপার সংঘটিত হইল যে যতীন্দ্রনাথকে গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হয়।

১৯০৯ সালের গোড়ায় যে পাবলিক প্রসিকিউটার আশুবাবু নিহত হন, তাহার পর হইতেই সি, আই, ডি পুলিশ যতীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ নজর রাখিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অরবিন্দবাবু প্রভৃতির মোকদ্দমা তখনও চলিতেছিল।

১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থানসমূহে কয়েকটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে কলিকাতা অনুশীলন সমিতির দলও ছিল, অন্যান্য দলও ছিল, বারীনবাবুদের দলেরও কেহ কেহ ছিল। এই দল কর্ত্তৃক ১৯০৮ সালের

গোড়ায় শিবপুরে একটি ডাকাতি হয়। এই ডাকাতিতে পুলিশ কৃষ্ণনগরেরউকীল ললিত চট্টোপধ্যায় এবং তাহার মোহরী নিবারণ মজমদারকে সন্দেহ করে এবং কিছুদিন পরে গ্রেপ্তারও করে। নরেন চাটার্জ্জিও গ্রেপ্তার হয়। অতঃপরে বিঘাতিতে (হুগলী) ১৬ সেপ্টেম্বর একটী ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা পুলিশ সাজিয়া ডাকাতি করিতে যায়। যাহাহউক তাহাতে একজনের ৬ বছর সাজা হয়, পাঁচবৎসর করিয়া হয় দুইজনের ও সাড়ে তিন বৎসর হয় একজনের। এই মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে পণ্ডিত মোক্ষদা সামধ্যায়ী মহাশয় নিগৃহীত হইয়াছিলেন।

ইহার পরের ঘটনা ৯ই নভেম্বর নন্দলাল বানার্জ্জির হত্যা। মোকদ্দমার সময়ে এপ্রুভার বলে হেম সেন, নরেন বসু প্রভৃতি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন। তারপরে উপর্য্যুপরি দুইটি ডাকাতি হয়, একটী নদীয়া জেলার রায়তা (২৯ নভেম্বর) গ্রামে, বিধবার বাড়ীতে আর একটী হুগলী জেলার মোহরেল গ্রামে, শশীভূষণ দের বাড়ী। রায়তায় প্রায় দুইহাজার টাকা অপহৃত হয়। মোহরেলে বিশেষ কিছু না হইলেও বিচারে মন্মথ রায় চৌধুরীর ৭ বৎসরের দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কয়েকজন গ্রামবাসী তাহাকে ঘটনাস্থলেই ধরিয়া ফেলিয়াছিল।

১৯০৯ সালের ২৩এ এপ্রিল ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী নেত্রাতে রামতারণ মিত্রের বাড়ী ডাকাতি হয়। প্রায় আড়াই হাজার টাকা অপহৃত হয়। ডাকাতদের মুখে মুখোস ছিল, হাতে ছিল রিভলভার। চাইবা মাত্র চাবি পায় এবং টাকা লইয়া আসে। ফিরিয়া যাইবার সময়ে তাহারা বলিয়া যায়, "এই টাকা আমরা ইংরাজ তাড়াইবার জন্য ধার নিচ্ছি"।

এই ডাকাতিতে নরেন ভট্যাচার্য্য (পরে মানবেন্দ্র রায়) সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নেত্রায় নরেন বসুও ছিলেন।

নেত্রা ডাকাতির তদন্ত করেন সামসুল আলম্। এতদ্‌সম্পর্কে কৃষ্ণনগরের উকীল ললিত মোহন চাটার্জ্জির বাড়ীও খানা তল্লাস হয়। নিবারণ মজুমদার ছিলেন ললিতবাবুর মোহরী।

(১৯০৮–১৯০৯) এই মৌলবী সামসুল আলমের উপরে আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র

মোকদ্দমার তদবিরের ভার ছিল। আসামীরা ইহার উপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাহাকে দেখিলেই ছেলেরা গান ধরিত—

"ওগো সরকারের শ্যাম তুমি আমাদের শূল
কবে ভিটেয় চর্‌বে ঘুঘু, দেখবে চোখে সরষে ফুল!"

ইহার পরেই একটি ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করিবার সঙ্কল্প চলে। এদিকে মৌলভী সামসুলকেও পৃথিবী হইতে সরাইয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র চলে।

নেত্রার পরে মহারাজপুরে ডাকাতি হয় ১৯০৯এর ২৭শে জুলাই, একজন মাড়োয়ারীর বাড়ীতে।

ইহার পরে নদীয়া জেলার হলুদবাড়ীতে ডাকাতি হয় ২৯শে অক্টোবর ১৯০৯। এই ডাকাতিতে ৫জনের আটবৎসর করিয়া জেল হয়, একজনের হয় ৭বৎসর, একজনের পাঁচবৎসর। দেড়হাজার টাকা লুট হয়। এই মোকদ্দমায় ধৃত শৈলেন দাসের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য হরেন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তি কুষ্ঠিয়ায় যান। তিনি তখনও গ্রেপ্তার হন নাই। সেখানে একজন জেল প্রহরীর নিকট গোপনে একখানি চিঠি দেন, যে, শৈলেন যেন স্বীকারোক্তি করিয়া সকলের অনিষ্ট না করে। মিঃ আলম এই চিঠিখানিও পান। বিচারে হরেন বাবু দণ্ডপ্রাপ্ত হন।

ইহার পরে ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী নামক একব্যক্তি ১৯০৯এর ৫ই নভেম্বর তারিখে দার্জ্জিলিং হইতে ডায়মণ্ডহারবার নীত হয় এবং সেখানকার মহকুমার হাকিম মিঃ চারুচন্দ্র চাটার্জ্জির কাছে স্বীকারোক্তি করে। ললিত এই স্বীকারোক্তিতে ৩২ জনের নাম করে, তন্মধ্যে ননীগোপাল সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র মুখোপধ্যায় (বাঘা যতীন), নরেন ভট্যাচার্য্য, ভূষণ মিত্র, কেশব দে, শরৎ মিত্র, সুরেশ মিত্র, চারুঘোষ, তারানাথ চৌধুরী প্রভৃতির নাম করে। ননীগোপালকে বলে হাওড়া প্রভৃতি জায়গার নেতা, যতীনকেও এইরূপ বিভাগীয় নেতা (Sectional Leder) বলিয়া আখ্যা দেয়। ললিত, যতীনবাবুর মাতুল ললিত চাটার্জ্জি ও তাহার মুহুরি নিবারণ মজুমদার (ওরফের কেরুদাস), নরেন বসু,

হরিদাস চক্রবর্ত্তী, হেমচন্দ্র সেন, পবিত্র দত্ত, সতীশ সরকার, শ্রীশ সরকার, বিজয় চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকের নাম করে। নন্দলাল বন্দ্যোপধ্যায়কে খুন করিবার জন্য চারু ঘোষএর নিকট হইতে রিভলভার আনিয়া নরেন বসু ও হেম সেনকে দেয় তাহাও বলে।

ললিত আরও বলে সমিতিতে প্রতিজ্ঞা লইতে হইলে তুলসী, তামা, তরবারি, গীতা ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া করিতে হইত। মুক্তি কোন পথে, বর্ত্তমান রণনীতি, যুগান্তর, গীতা, আনন্দমঠ সকলকে পড়িতে হইত। ললিত রাজসাক্ষী (approver) হইবে স্থির হয়।

এইরূপে হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা যখন সামসুল আলম তৈয়ারী করিতেছিলেন, হঠাৎ উপর হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল। সামসুল আলমের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয় ২৪শে, জানুয়ারী ১৯১০।

কলিকাতার হাইকোর্টের জনৈক বিশিষ্ট উকীল স্বর্গীয় কিশোরীলাল সরকার ১২১ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে (শ্যামবাজার) বাস করিতেন। তাঁহার নিবাস ছিল পাব্‌না জিলায়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার (আনন্দ বাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী) তখন কিশোরীবাবুর বাসায় থাকিতেন। তাহার ডাকনাম ছিল পরাণ। নিরারণ মজুমদার ও সুরেশবাবু কৃষ্ণনগর আর্য্যফ্যাকটারীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ললিতবাবুও নিবারণ বাবু ডাকাতি ব্যাপারে সামসুল আলমের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন।

কিশোরী বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ সরকারের (Dhencanal এর প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার) শ্যালক পূর্ণচন্দ্র মৌলিক এই সময়ে কয়েক দিন কিশোরীবাবুর বাসায় আসিয়া থাকেন! তিনি তখন জাজপুরের (কটক) সব ডিভিসান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার হাতব্যাগে একটী ৬৬০৮ নম্বরের ওয়েলভি রিভলভার ছিল। এই রিভলভারটী অপসারিত হয়। আর ইহার দ্বারাই সামসুল আলমের নিধন সাধন হয়। মোকদ্দমায় পূর্ণবাবু সাক্ষী দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্দেহের কথা বলেন।

ঘটনার দিন মিঃ আলম বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালত হইতে বেলা পাঁচটার সময় পূর্ব্বের সিঁড়ির দিকে যাইতেছিলেন। আলিপুরের বোমার মামলার আপিল যে প্রধান বিচারপতি ও কার্ণডাফ সাহেবের ঘরে হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পাঁচজন আসামীর জন্য তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায়, জজ হ্যারিংটনের কাছে উল্লেখ (refer) হয়। এই বিষয়ে শেষোক্ত বিচারকের বিচারের সময়ে মৌলভী সাহেব রোজই হাইকোটে আসিতেন। ২৪শে জানুয়ারী যাই সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইবেন, আলোয়ান গায়ে একটী যুবক হঠাৎ তাঁহার বুকে গুলি করে। গুলি খাইয়া তিনি হত্যাকারীকে ধরিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্‌স্ তখনও আদালত গৃহ ছাড়িয়া যান নাই। তিনি এবং অন্যান্য জজ্‌রা আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এডভোকেট জেনারেল কেনরিকও আসেন। নিকটস্থ দুই একটি লোক আসামীকে ধরিতে যায়।

বীরেন সিঁড়ি দিয়া দৌড়াইয়া ওল্ডপোষ্ট আপিস ষ্ট্রীটে পড়ে, আর দুইতিন জন চাপরাশী তাহার পিছনে 'খুন খুন' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসে। সম্মুখ হইতে অস্ত্রধারী কনেষ্টবল ধুরা সিং তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসে। বীরেন তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া দুই একটী গুলি করে, কিন্তু উহা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, গুলি কনেষ্টবলের মাথার উপর দিয়া যায়! ইত্যবসরে হাইকোর্টের চাপরাশি রাম অধীন সিং ও রামজানি সিং আসিয়া বীরেনকে পিছন হইতে ধরিয়া ফেলে। জিজ্ঞাসিত হইয়া সে একই উত্তর করে "যাহা করিতে হয় কর, আমি কিছু বলিবনা!"

পরদিন পুলিস পরিচয় পাইয়া তাহার সহোদর ধীরেন্দ্র দত্তগুপ্তের, ৬১নং মির্জ্জাপুরের বাসা (বোধ হয় মেস) খানাতল্লাস করিয়া কিছু কাগজ পত্র লইয়া যায়। ইতিমধ্যে হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার জন্য যে সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম হইয়াছিল পুলিস তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। ২৭৫নং আপার চীৎপুর রোডে ডাক্তার হেমন্ত চাটার্জ্জির বাসা, তাহার ভ্রাতা অনাথবাবুর ৫৯নম্বর

বেনিয়াটোলা লেনের বাসা, এবং অন্যতম ভ্রাতা যতীন্দ্র চাটার্জীর কৃষ্ণনগরের বাসা খানা তল্লাস হয়। ২৭ জানুয়ারী যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ধরা হয়। কিশোরীবাবুর বাসাও খানা তল্লাস হয় এবং যতীন ও সুরেশবাবুকে, ললিত চাটার্জি এবং তাহার মোহরি নিবারণ মজুমদার সহ হাওড়া Gang Case এর আসামী করিয়া সেখানে পাঠানো হয়। ৩১শে জানুয়ারী অনাথ বাবুকে এক হাজার টাকা জামিন দিয়া বাকী সকলকে স্যার ফ্রেডারিড হ্যালিডে ( পুলিশ কমিশনার ) মিঃ Dally ( D.I.G. C.I.D. ) সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চালান দেন। যতীনবাবুর ঘরে একখানা কাগজ পাওয়া যায়। উহাতে পুলিসের নিকট হইতে সতর্ক করিবার কথা আছে ( A Document with the scheme of the formation of Vigilance Committee ) ডেপুটি কমিশনার টেগার্ট কাগজখানি নথি ভুক্ত করেন। অতঃপর যতীনবাবু, সুরেশ বাবু, ললিত বাবু ও নিবারণ বাবুও হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার অন্যতম আসামী হন।

দুই একদিনের মধ্যেই চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সুইনহো সাহেবের ঘরে বীরেনের মোকদ্দমা উঠে কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে প্রথমে সে কোন কথাই বলে নাই। দুই একটী ব্যাপারে তাহার উচ্চহাসি শুনা যায়। হাইকোর্টের পিওন রামঅধীন সিংকে আসামীর দিকে তাকাইতে বলায় যখন হাকিমের দিকে তাকায় তখন আর সে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। আর একবার সে হাসিয়াছিল ধুরা সিংহ বীরেনের হাত হইতে যে পিস্তলটি কাড়িয়া লইয়াছিল সেই কথা বলিতে বলিতে যখন আদালতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়! টেগার্ট সাহেব তাহার কাছে বসিয়াছিলেন, সাহেবের সঙ্গে সে বেশ কথা বলিতেছিল, আর সাহেবও তাহার কথা বেশ উপভোগ করিতেছিল।

যাহা হউক সুইনহো সাহেব মোকদ্দমাটি দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়া দেন। ইহার একদিন পরে ন্যায়পরায়ণ প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স এর ঘরে বীরেনের মোকর্দ্দমার শুনানী হয় এবং একদিনেই শেষ হইয়া যায়!

বীরেনের পক্ষে কোন কৌসিলি উপস্থিত না হওয়ার স্যার লরেন্স মিঃ নিশীথ সেনকে সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আসামী বীরেন, মিঃ সেনকে কোনরূপ কথা বলিতেই (instruction দিতে) রাজী হয় না! মিঃ নিশীথ সেন অতঃপরে প্রধান বিচারপতি স্যার জেঙ্কিনসকে বলেন, "হুজুর, দেখিতেছি, আসামী উন্মাদ, সে নিজ পক্ষ সমর্থনে বা কোন বিষয়েই কোন কথা বলিতেই রাজী নয়, এর পক্ষ সমর্থন আমি কিরূপে করিতে পারি?" তিনি মোকদ্দমাটি ছাড়িয়া দেন।

বিচার একদিনেই শেষ হইয়া যায় এবং বিচারপতি বীরেনকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কিছু বলিতে চাও? উঃ—না।

প্রধান বিচারপতি—তুমি কোন সাক্ষী প্রমাণ দিবে? উঃ—না।

প্রঃ—সওয়াল জবাব করিবে? উঃ—না।

প্রধান বিচারপতি বীরেন্দ্রের প্রাণ দণ্ডাদেশ দেন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল আসামীর কোন ভ্রূক্ষেপই নাই এবং একেবারে অবিচলিত ভাবে আসামীর কাঠগড়া হইতে বাহিরে আসে। ২৩ই ফেব্রুয়ারী ফাঁসীর দিন নির্দ্ধারিত হয়।

এই সময় মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেলে ঘন ঘন গোয়েন্দা পুলিশের আবির্ভাব হইতে লাগিল। একজন ইনস্পেক্টর একখানি যুগান্তর পত্রিকা আনিয়া আসামীর সম্মুখে উপস্থিত করে। পত্রিকাখানি কৃত্রিম এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা বিভাগ হইতে বিকৃত ভাবে তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল!

যুগান্তর কাগজের মামুলি জিনিষ দেওয়ার পরে ঐ কাগজখানিতে লেখা ছিল, "বীরেন কাপুরুষ, নেতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইলেও দৃঢ়ভাবে কাজ করিতে পারে নাই। বিনা কারণে গুলি ছুঁড়িয়া ধরা দিয়াছে। দলকে ফাঁসাইবার জন্যই ধরা দিয়াছে।" তাহার নিয়োজিত কাজ খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হওয়া এবং আদালতে ব্যবহার খুব বীরত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহার সম্বন্ধে নকল যুগান্তরের অপবাদ বীরেনের অসহনীয় হইল। বিচার শূন্য পুরুষের ন্যায় সে সম্বিত হারাইয়া ফেলিল। এইবার গোয়েন্দা লোকদের হাতে সে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করিল।

তাহারা তাহাকে বলিল, "আপনি যতীন বাবুকে বাঁচাইয়াছেন, যতীনবাবু নেতা থাকা সত্ত্বেও আপনাকে এই অপবাদ দিয়াছে!"

বীরেন—বটেইত! যতীনদাদা কি জানেন না যে আমি কাপুরুষ নই?

তৎক্ষণাৎ পুলিসও কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত। বীরেন ছোটলাট স্যার এড ওয়ার্ড বেকারের কাছে মার্জ্জনা চাহিয়া দরখাস্ত করে। সেখান হইতে প্রার্থনা নামঞ্জুর হইলে বড়লাট বাহাদুরের কাছে আবেদন করা হয়। তাহাও নামঞ্জুর হয়। এই সব উত্তরের অপেক্ষায়ই ১৫ ফেব্রুয়ারী হইতে ফাঁসীর তারিখ ২১শে ফেব্রুয়ারী করা হয়। ভাইসরয়ের উত্তর আসিলে বীরেনকে সুপারিণ্টেণ্ট Lt. Col. Hunterএর কাছে উপস্থিত করা হয়। সে বলে গুরু যতীনের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই খুন করিয়াছে। এবং চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সুইনহো সাহেব আসিয়া তাহার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে। ইতিপূর্ব্বেই যতীন্দ্রনাথ হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছেন। অতঃপরে সুইনহো সাহেব যতীন্দ্রনাথকে খুনের সহায়তা করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া ফাঁসীর পূর্ব্ব দিনে (২০শে ফেব্রুয়ারী) যতীনের সাক্ষাতে বীরেনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং যতীনবাবুকে জেরা করিতে বলে। তাহার কৌন্সিলি মিঃ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় (J. N. Roy) এত অল্প সময় মধ্যে জেরা করিতে অস্বীকার করেন এবং এডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে বেলভিডিয়ারে গিয়া স্যার এডওয়ার্ড বেকারকে ফাঁসীর দিন মুলতুবি করিতে প্রার্থনা করেন কিন্তু স্যার এডওয়ার্ড সেই আবেদন অগ্রাহ্য করেন। বীরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে ২১ ফেব্রুয়ারী ভোরে ফাঁসীকাষ্ঠে আরোহণ করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে জানিতে পারিল না যে যতীন বাবু তাহাকে কত ভালবাসেন আর কৃত্রিম যুগান্তরের সংবাদ ভিত্তিহীন!

এই মোকর্দ্দমায় দুইটি রাজসাক্ষী হইলেও (ললিত চক্রবর্ত্তী এবং যতীন হাজরা) এবং ৺পূর্ণমোলিক প্রভৃতি সাক্ষী দিলেও যতীনবাবু এবং সুরেশবাবুর

বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। আর স্যার লরেন্স বীরেন্দ্রের বিবৃতি বা জেলে বীরেনের সাক্ষ্য তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

এদিকে হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুভাল ৪৬ জনকে হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে সোপর্দ্দ করেন। অভিযোগ ছিল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র (১২১ ক ধারা দণ্ডবিধি) ইহার ৭জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া হয় সুতরাং বিচার হয় ৩৯ জনের। বিচারক ছিলেন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিংস, মিঃ জাষ্টিস, দিগম্বর চাটার্জ্জি ও মিঃ জাষ্টিস ব্রেট্। অভিযুক্ত-দের মধ্যে ননীলাল সেনগুপ্ত (হাওড়া), যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেন ভট্যাচার্য, সুরেশ মজুমদার, তারানাথ রায়চৌধুরী, শরৎ মিত্র, কেশব দে প্রভৃতি ছিলেন।

তারানাথ রায়চৌধুরী সেই সময়ে যুগান্তর পত্র সম্পাদনা করিতেন। ছাত্রভাণ্ডার ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র বলিয়া সরকার পক্ষ উক্তি করে। ইতিপূর্বে তারানাথ বাবুর অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অপরাধে তিন বৎসরের জেল হইয়াছিল।

এই মোকদ্দমায় ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী এবং যতীন্দ্র হাজরা দুইজন রাজ-সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও মোকদ্দমায় হলুদবাড়ীর দল ব্যতীত সকলেই মুক্তিলাভ করে। আসামীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা হয়—যেমন শিবপুর গ্রুপ, খিদিরপুর গ্রুপ, মজিলপুর গ্রুপ, হলুদবাড়ী গ্রুপ, কৃষ্ণনগর গ্রুপ, যুগান্তর গ্রুপ, ছাত্রভাণ্ডার গ্রুপ, রাজসাহী গ্রুপ।

ট্রাইবুন্যাল বলেন যে 'আমরা দেখিব সকলেই এক গ্রুপের কিনা, ভিন্ন ভিন্ন ষড়যন্ত্র দেখিবার অবকাশ আমাদের নাই'।

বীরেন্দ্র যে যতীন মুখার্জ্জি সম্বন্ধে সুইনহো সাহেবের কাছে জেলখানায় যতীনবাবুর সম্মুখে বিবৃতি দেয়, ট্রাইবুন্যাল তাহা গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র হলুদবাড়ী গ্রুপের যে দণ্ড ছিল তাহা রাখিয়া আর সকলকে তিনি মুক্তি দেন।

চাংড়ীপোতা ডাকাতিও (১৯০৭) উক্ত মোকদ্দমার বিষয়ভূত ছিল এবং তাহাতে নরেন ভট্যাচার্য্য সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই মোকদ্দমায় সরকার পক্ষে ছিলেন মিঃ পি, এল, রায়। আসামীদের পক্ষে ছিলেন মিঃ জে, এন, রায় মিঃ ই, পি, ঘোষ মিঃ এন, সি, সেন, মিঃ শৈলেন্দ্রকুমার সেন, মিঃ সারদাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মিঃ সুরিটা প্রভৃতি। মিঃ জে, এন, রায় বিশেষ দক্ষতার সহিত আসামীদের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন।

এই মোকদ্দমায় প্রাথমিক অভিভাষণে মিঃ পি, এল্, রায় বলেন—

"যতীন্দ্রনাথ ছিলেন ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা, এবং তাঁহার উপরে ছিল নদীয়া, রাজসাহী, যশোহর এবং খুলনা জিলার ভার। ননীগোপাল সেনগুপ্ত ছিলেন কলিকাতা ও ২৪ পরগণার নেতা, আত্মোন্নতি সমিতির ইন্দ্রনাথ নন্দী অস্ত্রাদি যোগাড় করিতেন।"

শেষাশেষি মিঃ রায় যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ একরকম প্রত্যাহারই করিয়াছিলেন।

এই মোকদ্দমার পরে পশ্চিমবঙ্গে ২।৩ বৎসর মধ্যে আর বিশেষ কোন খুন ডাকাতি হয় না। তবে পূর্ব্ববঙ্গে সমভাবে হিংসাত্মক কার্য্য চলিতে থাকে। যতীনবাবু ইহার পরে সংসার নির্ব্বাহের জন্য যশোহর ঝিনাদহ লাইনের কনট্রাক্টারী কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

---

# একাদশ অধ্যায়

## রাসবিহারী ও লাহোর-ষড়যন্ত্র

### হরদয়াল

রাসবিহারী যখন দিল্লী, লাহোর, কাশী এবং বাঙ্গলা দেশে বিপ্লব কার্য্যের প্রসার করিতেছিলেন, ১৯১৩-১৯১৪ ; হরদয়ালও সেই সময় ক্যালিফর্ণিয়ায় আসিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন। হরদয়াল কলিকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকার অনুরূপ স্যানফ্রান্সিস্কোতে একটি প্রেস স্থাপিত করিয়া উহার নাম রাখেন 'যুগান্তর ছাত্রাবাস'। শিখ্ এবং পাঞ্জাবীদের মধ্যে তিনি ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে আমাদের অবস্থা এবং ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বুঝাইতেন। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় 'গদর' পত্রিকা বাহির করেন। 'গদর' অর্থ বিদ্রোহ। ক্রমে তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের সহায়তায় উক্ত পত্রিকা গুরমুখী ভাষায়ও প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় ভারতের স্বাধীনতার অনল প্রবাহ জ্বলিয়া উঠিল। গদর কাগজের নামানুসারেই হরদয়ালের দল—'গদর দল' নামে অভিহিত হয়।

এই সময়ে জার্ম্মানদের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ লাগিবার উপক্রম হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভনবার্ণহার্ডি তাঁহার লিখিত "Germany and the next war" পুস্তকে যুদ্ধারম্ভে ভারতীয়গণ যেন পশ্চাদপদ না থাকে এই ভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। হরদয়াল আমেরিকায় আর ভারতে রাসবিহারী ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিলেন।

যুগান্তর আশ্রমের দরজায় প্লাকার্ডে লিখিত—থাকিত "Dont fight the Germans. They are our friends."

যুদ্ধের-পূর্ব্বে হরদয়ালের ভারতবর্ষে দুইজন ভক্ত ছিল, একজন পাঞ্জাবী দীননাথ আর একজন বাঙ্গালী জে, এন্ চাটার্জ্জি। চাটার্জ্জি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই দীননাথকে রাসবিহারীর অনুরক্ত করিয়া দিয়া যান। দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সম্পর্কে দীননাথের বিশ্বাসঘাতকতার কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, আর চাটার্জ্জির মারফত তাহার পিতার সতর্কতা সত্ত্বেও রাসবিহারী ও হরদয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ রহিয়াই গেল!

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই হরদয়াল জার্ম্মাণ যুদ্ধ এবং ভারতীয় বিপ্লবী যাহারা ইউরোপে রহিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে প্রয়াস পান। ১৯১৩, ৩১ ডিসেম্বরে Sacramentoতে একটি ভারতীয় সম্মেলন হয় এবং তাহাতে হরদয়াল বলেন জার্ম্মানী শীঘ্রই ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে এবং আমাদের এই উপযুক্ত সময়। আমরাও একটি বিপ্লবের জন্য তৈয়ার হইব। এই বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করেন রামচন্দ্র পেশোয়ারী।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চেম্পাকরাম পিল্লাই নামে একজন মাদ্রাজী যুবক জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি লইয়া Zurich (জুরিচ্ হইতে আসিয়া বার্লিনে ভারতের জাতীয় সমিতি Indian National Party নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তিনি পূর্ব্বে সুইজারল্যাণ্ডে বিপ্লবীগণের সভাপতি ছিলেন। হরদয়ালও এই পার্টির সহিত যুক্ত হন। হরদয়াল এইসময় আমেরিকা হইতে চলিয়া আসিয়া সুইজারল্যাণ্ডে বাস করিতেছিলেন। আমেরিকায় তিনি উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধাদির জন্য ১৯১৪ ১৪ মার্চ্চ গ্রেপ্তার হন। জামিনে খালাস হইয়া সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া আসেন। সুইজারল্যাণ্ডে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরে উভয়ে একসঙ্গে বার্লিনে আসেন। আরও যাঁহারা সভ্য ছিলেন তাঁহাদের নাম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ দাস, বরকতউল্লা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, হেরম্বলাল গুপ্ত। হরদয়াল প্রভৃতি জার্ম্মানীর খরচায়ই বার্লিনে পরামর্শ করিবার জন্য উপস্থিত হন। ভারতীয় যুবকগণের সহায়তায় ইউরোপ, আমেরিকা, এসিয়ার তুরস্ক, আফগানিস্থান, জাপান

প্রভৃতি স্থানে যাহাতে ইংরাজ বিদ্বেষ প্রচারিত হয়, এরূপ ছিল জার্ম্মাণীর অন্যতম উদ্দেশ্য এবং এই জন্য জার্ম্মাণী অর্থব্যয়ে কোনরূপ কার্পণ্য করে নাই। শ্যামরাজ্যের দিকেও এমন ব্যবস্থা করেন যে নিকটবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধে জার্ম্মণীর অনুকূলে প্রচার কার্য্য চলিতে থাকে।

হেরম্বলাল গুপ্ত* এবং চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী আমেরিকা হইতে প্রচার কার্য্য চালাইয়া জার্ম্মাণীর সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই দুইজন ভদ্রলোকই আমেরিকায় জার্ম্মাণীর প্রতিনিধি ছিলেন। কিছুদিন পরে হেরম্ববাবু শ্যামরাজ্যের ব্যাঙ্ককে যান এবং চন্দ্রকান্ত বাবু নিউইয়র্কেই থাকিয়া যান।

সুফী অম্বাপ্রসাদ ও অজিৎ সিং পারস্যে ও কাবুলে থাকিয়াই কাজ করেতেছিলেন। ব্যাঙ্ককে প্রত্যাবৃত্ত শিখদের সহায়তা লাভ হইল আর বিদ্রোহীদের সুবিধা হয় কমাগাটামারু ব্যাপারে। ভারতবর্ষে এই প্রসঙ্গে কিরূপ অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় পরে বিবৃত করিব।

এদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক, চীন, প্রভৃতি ১৮টি রাজ্য ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে প্রতিশ্রুত হয়।

ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরের ( ১৯১৪ ) মাঝামাঝি 'এম্‌ডেন' নামে একটী নাতিবৃহৎ জাহাজ ( Light Cruser ) মাদ্রাজ, পুরী, বাঙ্গালোর, সিংহল প্রভৃতি স্থানে আগ্নেয় গোলা নিক্ষেপ করে। এই সমস্ত স্থানের বিশেষ ক্ষতি হয়, কিছু কিছু মেল ব্যাগের জাহাজও আটকানো হয়।

ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মানীস্থ ভারতীয়গণ সভরকার ভ্রাতৃদ্বয়, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমদাস, উপেন বন্দ্যো, পুলীনবিহারী দাস প্রভৃতিকে আন্দামান হইতে জার্ম্মানীতে আনিবার পরামর্শ দিয়াছিল। এমডেনের সেইরূপ কোন অভিপ্রায় ছিল কিনা ঠিক বলা যায়না।

* যশোহরের কালিয়া নিবাসী পণ্ডিত প্রবর উমেশ বিদ্যারত্নের পুত্র। বিদ্যারত্ন মহাশয় "প্রাচ্য বিদ্যাবারিধি", মানবজাতির আদিম বাসভূমি" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

হরদয়ালের অনুপস্থিতিতে রামচন্দ্র পেশোয়ারী যুগান্তর আশ্রম ও গদর পত্রিকা পরিচালনা করেন। গদর পত্রিকার পূর্ব্বাপর সুরই ছিল ইংরাজকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। গদর দলের প্রতিনিধি হিসাবে আসিয়া তিনি এই সম্বন্ধে কয়েকবার বক্তৃতাও করিয়াছিলেন।

যাহাহউক এইবার আমরা কমাগাটামারুর ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে প্রদান করিতেছি।

## কমাগাটা মারু

কমাগাটামারু শিখবাহিনীর অধিনায়ক বাবা গুরুদিত সিং অনুমান ১৮৯০ সাল হইতে মালয় ও সিঙ্গাপুরে কনট্রাক্‌টারী কার্য্যে বেশ দুইপয়সা রোজগার করিতে সক্ষম হয়েন। শিখজাতির বিশেষত্ব তাহারা একসঙ্গে মিলিয়া থাকিতে চায় এবং যেখানে যায়, একটি গুরুদ্বার প্রতিষ্টা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। বাবা গুরুদিতের ইচ্ছা হয় যে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার রাজধানী ভেঙ্কবারে স্বদেশস্থ শিখদিগকে নিয়া আসিবেন, তাগদের অনেকে কনট্রাকটারী কাজে সঙ্গতিলাভ করিতে পারিবে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া কেনেডার অধীনস্থ একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ।

কলিকাতায় জাহাজ পাওয়া সম্ভব হইলনা দেখিয়া বাবা গুরুদিত কমাগাটা মারু নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া (Charter) করিয়া হংকং হইতে প্রায় ৩৫০-৪০০ শত শিখ যাত্রী সহ ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে রওনা হন। এই দলটির অনেকে ভবিষ্যতের লাভের আকাঙ্খায় সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও সংস্থান লইয়া আসিয়াছিল।

জাহাজে করিয়া তাহারা হংকং হইতে প্রথমে সাংহাই আসে। সেখানকার গুরুদ্বারে সকলের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এবং কিছু অর্থ সাহায্য লইয়া মজি, ইওকোহামা (জাপানস্থ) হইয়া তাহারা ২৩মে ভেঙ্কবারে পৌঁছে। সব জায়গায় তাহারা 'গদর' পত্রিকা দেখতে পায় এবং ইওকোহামার কয়েকটি

বিপ্লবপন্থী ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। কিন্তু কলাম্বিয়ায় তাহাদিগকে উঠিবার অনুমতি দেওয়া হয়না। তখন সেই জাহাজে সাড়ে তিনশতের উপরে শিখ্ ছিল আর ২০।২১ জন পাঞ্জাবী মুসলমানও ছিল। তাহারা নিরাশ হইয়া বসিয়া রহিল, ক্যানেডার চীফ্ কোর্টে আবেদনও অগ্রাহ্য হইল। দুই একবার তাহারা ডাঙ্গায় উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষে অনেকে আহত হয়। অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া তাহাদিগকে আবার এসিয়ার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। দুইমাস বসিয়া থাকিয়া ২৪শে জুলাই উক্ত জাহাজ ভেঙ্কোবার ছাড়িয়া আসে।

যখন তাহারা পুনরায় ইওকোহামায় পৌছে তখন ইউরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সেখানকার ব্রিটিশ কনসাল তাহাদিগকে পর্য্যাপ্ত খাদ্যের বন্দোবস্ত না করিয়াই বিদায় করিয়া দেয়। অজুহাত দেয় যে ইহাদের দাবীর পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। এদিকে নূতন প্রকাশিত 'গদর' তাহাদের রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল। উক্ত স্থানে তাহারা শুনিয়াছিল তাহাদিগকে হংকং কি সিঙ্গাপুর কোথাও নামিতে দেওয়া হইবেনা। তাহারা সিঙ্গাপুরে পৌছিয়াছিল ১০ সেপ্টেম্বর, কিন্তু নামিবার অনুমতি পাইল না। যাত্রীর দল চতুর্দ্দিকে বিফলকাম হইয়া দুইমাস পরে ২৭ সেপ্টেম্বর বজবজের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে বাঙ্গলার অবস্থা এইরূপ। রাজাবাজার বোমার মোকদ্দমা তখনও চলিতেছে। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামীগণ নিরুদ্দেশ, দিল্লীতেও ষড়যন্ত্রের মামলায় ৪ জনের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে, রাসবিহারীর নামে পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯১৪), কলিকাতায় আবার একটি 'ইনগ্রেস ইনটু ইণ্ডিয়া' অর্ডিনান্সও পাশ হইয়াছে। ইহার বলে অন্যদেশ হইতে ভারতে আগত ব্যক্তির সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। গ্রেপ্তার, অন্তরীণে অবরোধ এবং অন্যস্থানে প্রেরণ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন হইল। এই অবস্থায়ই পঞ্জাব প্রদেশস্থ এই অসন্তোষচিত্ত শিখবাহিনী বহন করিয়া দুষ্টগ্রহের ন্যায় কমাগাটামারু আসিয়া বাঙ্গলার দ্বারে ভাগিরথী বক্ষে উদিত হইল।

সেদিন বিজয়া, গঙ্গানদীর উভয় তীরে খুব ভিড়। কৌতূহলে সকলে এতগুলি শিখের কার্য্যকলাপ দেখিতে ষ্টেসনের দিকে ছুটিয়া আসিল। গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেসনে একখানি ট্রেণ তৈয়ার রাখিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য তাহাদিগকে শিয়ালদহ-নৈহাটি-হুগলীর রাস্তায় দেশে পৌঁছাইয়া দিবে। তাহারা জানিত পাঞ্জাবের গাড়ী যায় হাওড়া হইতে, সুতরাং সন্দেহ হওয়ায় এপথে যাইতে রাজী হইলনা। তাহারা পদব্রজে কলিকাতার দিকে রওনা হইল। ৩।৪ মাইল দূরে যখন মহেশতলায় গিয়া পৌঁছে, কলিকাতার পুলিস কমিসনার স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে ও কয়েকজন ইংরাজ সৈনিক আসিয়া উপস্থিত হন। কমিসনার তাহাদিগকে অডিন্যান্সখানা দেখাইয়া মিষ্ট কথায় বজবজে নিয়া আসেন। তিনি বলেন, "তোমরা বজবজে চলো, সেখানে গেলে সব কথা হইবে।"

বজবজে আসিয়া তাহারা ট্রেনে চড়িতে অস্বীকার করিল। ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডোনাল্ড সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন, "তোমাদিগকে এই ট্রেনে লাহোর যাইতে হইবে। এই জরুরী আইনে আমি তোমাদিগকে যাইতে বাধ্য করিব।" অতঃপরে সাহেবদের সঙ্গে তাহাদের তর্কাতর্কি হয়। তাহারা বলে—"আমরা বাড়ী হইতে কাজের জন্য আসিয়াছি, ব্যর্থকাম হইয়া আবার ঘরে ফিরিয়া যাইব কেন? তখন দুই একজন সাহেব উত্তেজনাবশে কাহাকেও কাহাকেও ধাক্কা দিয়ে ট্রেনে উঠাইতে বল প্রয়োগ করে। ক্রমে উভয় পক্ষেই গুলি চলে। ফলে প্রায় ৪০৫০ জন নিহত হয়। গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ ১৮ জন শিখ নিহত হয়। সরকার পক্ষেও অনেকে হতাহত হয়। স্যার ফ্রেডারিকের পায়ে গুলি লাগে, মিঃ হাম্ফারী সাংঘাতিক আহত হন, এ সষ্টাণ্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডের মিঃ লোমেক্স (Lomax) নিহত হয়। আরও কেহ কেহ আঘাত পায়। সংঘর্ষের ফলে

* ২৯শে আগষ্ট ১৯১৪, Foreigners' Ordinance নামে আর একটি জরুরী আইনও বাহির হয়।

অনেক শিখ পালাইয়া যায়, ৬০ জনকে ( তন্মধ্যে ১৭ জন মুসলমান ছিল ) ট্রেনে চড়াইয়া দেওয়া হয়, বহুলোক পরে ধৃত হয়, ৩১ জনকে অন্তরীণাবদ্ধ রাখা হয়, ধৃত বাকী সব কয়জনকে ৪মাস পরে জানুয়ারী মাসে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাবা গুরুদিতকে পাওয়া যায় না।

কমাগাটামারুর ন্যায় আর একখানি জাহাজ টসামারুও আমেরিকা হইতে ভারতের উপকূলে পৌঁছে। ক্রমে আরও জাহাজ আসে। এই সব জাহাজেই আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক শিখ্ আসিয়া পৌঁছে।

অতঃপরে এই ঘটনা আশ্রয় করিয়া রামচন্দ্র পেশওয়ারী 'গদরে' উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। আর শিখসম্প্রদায়ের অসন্তোষ ভারত-ভূমিতে রাসবিহারীর প্রধান সহায় হইল। তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন :—

"যুদ্ধ বেধেছে, এবার ভারত স্বাধীন হবে। কোমাগাটামারু এবং অন্যান্য জাহাজে ৪০০০ শিখ বিদ্রোহের উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছে। ভারতের সিপাহীগণের অভ্যুত্থানের এই উপযুক্ত সময়।"

কমাগটামারুর ব্যাপারের পরে গণেশদত্ত পিংলে ও বিনায়ক রাও কাপ্‌লে আমেরিকা হইতে আসিয়া ১৯১৪ সালে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে উপস্থিত হন এবং কাশীতে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করেন। উভয়ে মারাঠা দেশবাসী এবং উভয়েই বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ। এই দুইজনের আগমনে রাসবিহারীর বুক দশহাত ফুলিয়া উঠিল। রাসবিহারী বিনায়ককে পাঠান বাংলা দেশে ও এলাহাবাদে কারণ তিনি খুব ভাল বাংলা জানিতেন, চেহারাও ছিল কতকটা বাঙ্গালীর ন্যায়। তাঁহার একটি বাঙ্গালী নামাকরণও হয়। আর পিংলেকে পাঠাইলেন পাঞ্জাবে। শচীন সান্যালসহ তিনি থাকেন বেনারসে। কিন্তু সতত যাতায়াত করিয়া পিংলে ও বিনায়ককে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সত্যেন সেন নামক আর একজন বাঙ্গালীও আমেরিকা হইতে আসিয়া কলিকাতায় কাজ করেন। তাঁহারও রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পাঞ্জাবের আর একজন যুবকের নাম

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনিই ২২ বৎসরের যুবক কর্ত্তার সিং; বড় উৎসাহী কর্ম্মী। ফিরোজপুর ও লাহোর কানটনমেণ্টে ইনি বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখান। কর্ত্তার সিং পূর্ব্বে হরদয়ালের সঙ্গে স্যানফ্রান্সিস্কোতে কাজ করিতেন। তাঁহার উৎসাহেই 'গদর' পত্রিকা সেখানে প্রথমে প্রচারিত হয়।

কর্ত্তার সিং ও অন্যান্য কয়েকজন ভারতে আসিয়া রাসবিহারীকে নেতৃত্বপদে বরণ করেন। তাঁহাকে তাঁহারা একাদশ গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। আমেরিকা থাকিতেই কর্ত্তার সিং প্রমুখ শিখগণ রাসবিহারীর গুণগ্রাম অবগত হইয়া তাঁহাকেই নেতৃপদে বরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

কর্ত্তার সিং, পিংলে ও বিনয়ক বিপ্লব-কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই রাসবিহারী কাশীতে বোমা সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পশুপতি নামক একটি কর্ম্মীর মারফত কলিকাতা হইতে কয়েকটি বোমা আনাইয়াছেন, পরীক্ষা করিবার সময় ১৯১৪ অর্থাৎ ১৩২১ সালের দুর্গা পূজার সময়ে উহার একটি বোমা হঠাৎ ফাটিয়া যায়। তিনি ও শচীন উভয়েই আহত হন।

এই ঘটনার পরেই অবিলম্বে রাসবিহারী কেদারঘাটের কাছে একটি বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। এইখানেই পিংলে ও বিনায়ক তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন।

অল্পদিন মধ্যেই তিনি হরিশচন্দ্রের ঘাটে একটি বাটিতে উঠিয়া যান।

অতঃপরে রাসবিহারী শচীন স্যান্যালের সহায়তায় একটি জরুরী সভা করিয়া এলাহাবাদের সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে দামোদর স্বরূপ নামক একজন শিক্ষককে পাঠাইয়া দেন। কাশী সিক্রোলের সৈন্য দিগকে উত্তেজিত করে বিভূতি হালদার ও প্রিয়নাথ নামে দুইটি বাঙ্গালী যুবক। ইহারা রামনগরের সেনাবারিকেও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। রাম নগরের ভার গ্রহণ করে বিশ্বনাথ পাঁড়ে ও মঙ্গল পাঁড়ে। সিক্রোলের ভার গ্রহণ করে দিল্লা সিং। রাসবিহারী জব্বলপুরের সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে নলিনী মুখার্জিকে পাঠাইয়া দেন। নলিনীর পিতা সেখানে থাকিতেন।

লাহোর, আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে পিংলে ও কর্ত্তার সিংহের চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়া আশা করা গেল।

নানাদিক হইতে ব্যবস্থা করিয়া রাসবিহারী পিংলের সঙ্গে পাঞ্জাবের নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। অমৃতসরেই তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্ধারিত হয়।

১৯১৫ সালের ২৫ জানুয়ারী রাসবিহারী ও পিংলে উভয়ে লাহোরের "ভারত হোটেলে" উঠেন। সেখান হইতে আসেন আনারকলিতে এক স্থানে। সেটি ছিল মহারাষ্ট্র আবাস। পিংলে বলিলেন "এবার এলাম বাড়ীতে, এবার যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরো, এবার দাদা যুদ্ধ ঘোষণা করুন।"

সৈনিক মহলে সর্ব্বত্র যুদ্ধের বাণী ঘোষিত হইল। স্থির হইল যে ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র সিপাহী মণ্ডলীর একই সময়ে অভ্যুত্থান হইবে। ঘটনা চক্রে ইহার পরে স্থির হইল ১৯ ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের দিন। কিন্তু সব আশাই ব্যর্থ হইল—

"না হইতে বোধন<br>ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গলঘট"

বিপ্লব অসাফল্যে পরিণত হইল বিশ্বাস ঘাতকের গুপ্ত সংবাদ প্রদানে। একজন মুসলমান ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ড কৌশল করিয়া কৃপালসিং নামক একব্যক্তিকে গোয়েন্দা করিয়া দলে ঢুকাইয়া দেয়। ক্রমে তাহার গতিবিধি সকলের সন্দেহ জন্মাইল। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখটি ইতিপূর্ব্বেই কৃপালসিংহের কৃপায় পুলিশের গোচরীভূত হইয়াছে! রাসবিহারী তখন লাহোরে। বাধ্য হইয়া ২১শে ফেব্রুয়ারী বদলাইয়া ১৯শে করা হয়; এবং কৃপালসিংকে বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না। সকলের কাছে কাছে রাখা হয়। তাহাকে এই সময়ে নিহত করিলে একেবারে ধর পাকড়ের হিড়িক পড়িয়া যাইবে ও আয়োজন ব্যর্থ হইবে, তাই সেরূপ কাজ হয় নাই।

এই দ্বিতীয় তারিখটি কর্ত্তার সিং সর্ব্বত্র জানাইয়া দিয়াছে বলিয়া একজন কর্ম্মী রাসবিহারীকে আসিয়া বলেন, কিন্তু কৃপালসিং তখন কাছে ছিল। সকলে

নিঃসন্দেহে জানিতে পারে নাই যে কৃপালসিং গোয়েন্দা; তাই এত গোলযোগ হইল। কারণ অল্পক্ষণ পরে অন্যান্য সভ্যগণের চক্ষুগোচরের মধ্যে থাকিয়াও একটু অবকাশ পাইয়াই কৃপালসিং বাহির হইয়া পড়ে আর গোয়েন্দা পুলিসকে এই উনিশ তারিখের কথাটিও বলিয়া দেয়।

স্যার মাইকেল ওডায়ার এই সময়ে পাঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাট। তিনি উক্ত গোয়েন্দার মারফত সংবাদ অবগত হইয়া এক ছাউনীর সৈন্য অন্য ছাউনীতে পাঠাইতে লাগিলেন। নানা স্থানে তল্লাস আরম্ভ করিলেন; অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং একই তারিখে সিপাহীদিগের উত্থান আর সম্ভব হইল না। লাহোরে পাড়ায় পাড়ায় খানাতল্লাসী হইতে লাগিল, দোষী নির্দ্দোষী গ্রেপ্তার হইল। রাসবিহারী তখন লাহোরই ছিলেন কিন্তু তাঁহার বাসা কেহ খুঁজিয়া পাইল না। তিনি নিতান্ত অন্তরঙ্গ ২।১ জন ব্যতীত কাহাকেও নিজের বাসস্থানের সংবাদ বলিতেন না। সব উদ্যম পণ্ড হওয়ার উপক্রম দেখিয়া রাস-বিহারীর ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি শচীন সান্যালও পশুপতিকে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইলেন। রাসবিহারী কাশীতে চলিয়া আসিলেন এবং সেখানে থাকিয়া কেবল বাসার পরে বাসা বদলাইতে লাগিলেন! তারপরে আজ কাশী, কাল কলিকাতা, পরশ্ব চন্দননগর, তার পরদিন নদীয়া ঘুরিতে লাগিলেন। আবার এদিকে দিল্লীতে শ্বেতাঙ্গ উচ্চ কর্ম্মাধ্যক্ষদের প্রতি বোমা নিক্ষেপের পরামর্শ করিলেন। অবস্থা বুঝিবার জন্য শচীন সান্যালকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন! কিন্তু শচীন সেখানে গিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন।

ইতিমধ্যে রাসবিহারী লাক্ষ্ণৌতেও আসিয়াছিলেন, ইনস্পেকটার নলিনীমোহন মুখার্জ্জি তাঁহাকে ধরিতে গিয়া বিফল মনোরথ হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি নগেন্দ্র দত্ত ও প্রিয়নাথকে চন্দননগরে পাঠাইয়া দেন। নগেন্দ্র দত্তেরই ছদ্মনাম ছিল গিরিজাবাবু।

রাসবিহারী এত শাঘ্র শীঘ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন যে এক

বাড়ীতে রাসবিহারীকে খুঁজিতে খুঁজিতে পুলিশ আসিয়া ঘেরাও করিয়াছে, নির্গমনের কোন সম্ভাবনা নাই। রাসবিহারী দ্বরোয়ান সাজিয়া এমন সুন্দর ভাবে পুলিশ পার্টির সহায়তা করিলেন যে পুলিশ পার্টি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে তবে ইনি নিজ বেশে চলিয়া যান। রাসবিহারী বলিতেন—"আমি বেঁচে থাক্‌তে ধরা দিবনা। মৃত্যুর অবধারিত কাল নেই, তাই আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত!"

কিন্তু সব আশাই নিষ্ফল হইবার মত হইল। এই সময় আরও দুইটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা খাড়া হইল। এদিকে তাঁহাকে না পাইয়া পুলিশ তাঁহার মাথার দাম দিয়াছে দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ৭৫০০, লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ২৫০০, আর বেনারস ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় ২৫০০, একুনে ১২৫০০, টাকা! দিল্লীর মোকদ্দমাটি পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, আর দুইটিও প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ইতিমধ্যে তাহার তিনচারটি প্রধান সহকারী ধরা পড়ায় আর কোন আশাই রহিল না

এদিকে পূবে যে ভারতীয় জার্ম্মানীর দলের কথা বলিয়াছি, তাহাদের উৎসাহ পাইয়া রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ,* সুফী অম্বাপ্রসাদ প্রভৃতি কয়েকজন দৌত্য লইয়া তুরস্কে আসিয়া সহানুভূতি পান। সেখান হইতে আফগানিস্থানের আমীরের নিকট তাঁহারা আসেন। আমীর ইংরাজের বিরুদ্ধে যাইতে রাজী হন না, কিন্তু প্রধান-মন্ত্রী এই ভারতীয় দৌত্যটীকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন বলিয়া আমীর আর বিশেষ কিছু বলিতে পারেন নাই। তাঁহার সহায়তায় কাবুলে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে সুফী অম্বা প্রসাদ ও অজিৎ সিংকে লইয়া অস্থায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট ( Provisional Government ) স্থাপিত হয় এবং স্থিরীকৃত হয় সেই ১৯ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমপ্রান্তস্থ বন্দী ভারতীয়গণ সহ পশ্চিম দিক হইতে ভারত আক্রমণ হইবে, আবার সিপাহীদেরও একসঙ্গে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সিপাহী উত্থান আর সম্ভব হইলনা।

* ইনি মথুরার নিকটবর্ত্তী স্থানের জমিদার। শ্রীবৃন্দাবনে "প্রেম মহাবিদ্যালয়ে" তিনি তাঁহ সর্বতীয় সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

এদিকে স্বয়ং আমীর বিরুদ্ধে থাকায় প্রধান মন্ত্রীর সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও কাবুলে তেমন সুবিধা হইলনা। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অজিৎ সিং পালাইয়া যান—চীনে কি পারস্যে। সুফী অম্বাপ্রসাদ আফগান সরকার কর্ত্তৃক ধৃত হন এবং জেলেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দুইদিকের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল। রাসবিহারী বলিতেন "জানি, আমাদের শক্তি কম, কিন্তু প্রচেষ্টা চাই। যদি একশতবারও বিফল মনোরথ হই, তবে হয়তো ১০১ বারের সময়ে জয়লাভ হইতে পারে।" কাবুলের প্রচেষ্টা ও দেশে বিদ্রোহের সূচনা ব্যর্থ হইলে, রাসবিহারী কর্ত্তার সিং এবং বিষ্ণুগণেশ পিংলেকে আর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যেন অসমসাহসিকতা দেখাইতে গিয়া শক্তি ক্ষয় না করে, সেই সম্বন্ধে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দেন। তথাপি পরে কর্ত্তার সিং ও হারনাম সিং রাসবিহারীর মত আদায় করিয়া কাবুলে যাত্রা করেন, কিন্তু রাস্তায় যাহাদের মধ্যে বিপ্লব প্রচার করিতেছিলেন, সেই সিপাহিরাই তাঁহাদিগকে ধরাইয়া দেয়। পিংলেও লাহোরে ধর পাকড়ের কথা শুনিয়া কাশী আসিতেছিলেন। রাস্তায় মীরাটে আসিয়া আবার সেনাবারিকে বিদ্রোহ প্রচারার্থ প্রবেশ করেন। তাঁহার হাতে ১০টা বড় রকমের বোমা ছিল। এই বোমাগুলির শক্তি ছিল বড় মারাত্মক। ব্যারাকে পড়িলে সমস্ত ব্যারাকেরই ধ্বসিয়া যাইবার কথা। কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় একজন মুসলমান দফাদার মিষ্টকথায় প্রলোভিত করিয়া পিংলেকে নিজেদের ব্যারাকে লইয়া যায় এবং দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর লাইনে পিংলেকে বোমা সমেত পুলিসের হাতে সমর্পণ করে। বোমা-কয়টি একটি বাক্সে ভরা ছিল। পিংলে এই ভাবে ১৯১৫, ২৯ মার্চ্চ ধৃত হইল।

লাহোরের ধর পাকড়ের পরে রাসবিহারী বিনায়ককে সঙ্গে করিয়া বেনারসে আসেন। সেখানে প্রায় এক মাস থাকেন। লাহোর হইতে উভয়ে পাঞ্জাবী পোষাকে আসিয়া একেবারে সেকেণ্ড ক্লাস বার্থে ঘুমের ভান করিয়া রহিলেন। পুলিশ কিছুই জানিতে পারিল না। কাশীতেই পিংলে দেখা

করিতে আসিয়াছিলেন। পিংলের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাসবিহারী লিখিয়াছেন :—

"কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটটির উপর আমরা বসিয় আছি। মা গঙ্গা কুলকুল করে বহিয়া যাইতেছেন। ২।৪ খানি নৌকা দেখা যাইতেছে। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হইয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি পিংলেকে বলিলাম—

"তুমি যে কাজে যাইতেছ, তাতে কত বিপদ তা জান বোধ হয়; একটু এধার ওধার হইলেই মৃত্যুকে বরণ করিতেই হইবে, এটা মনে ভাবিয়াছ কি?"

পিঙ্গলে এক গাল হাসিয়া বলিল—"মরা বাঁচা আমি কিছু জানিনা, যখন order (আদেশ) দিবেন তখন সেটা করিবই, তাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয় হবে।" ঠিক বীরের মতনই সে উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু উত্তরটা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। অনেককেই হারাইয়াছি, আবার পিঙ্গলেকেও হারাইব কি? পিঙ্গলে তার পরের রাত্রে মিরাটে গেল। পিঙ্গলের সঙ্গে সেই শেষ সাক্ষাৎ। এখনও তার হাসিভরা মুখখানি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে। পিঙ্গলে মানুষ নয়, সে ছিল দেবতা। তারমত দশ হাজার লোক থাকিলে আজ ভারত স্বাধীন হইবে।"

কর্তার সিং, পিংলে, ভাই পরমানন্দ প্রমুখ প্রায় শতাধিক আসামী লইয়া লাহোর ষড়যন্ত্রে মামলার পত্তন হয়। গভর্ণমেণ্ট এডভোকেট Sir Bevan Petman এর প্রাথমিক অভিভাষণে ও কমিসনারদের রায়ে প্রকাশ ফেরারী ঠাকুর দাস, অজিত সিং, সুফী অম্বাপ্রসাদের সহিত পারস্যে প্রথম ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। নেপালের মহারাজাকে ভারতেশ্বর করাই ষড়যন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া ভাই পরমানন্দ আমেরিকায় গিয়া লালা হরদয়ালের সহিত মিলিত হন।

১৯১৪ জানুয়ারী মাসে মেক্সিকো, ষ্টকটন গুরুদ্বারায়ে ক্যানেডার ভারত অধিবাসীদের লইয়া একটি সভা হয়।

১৯১৪ জুলাই মাসে স্যানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয়দের আর একটী সভা হয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শিখ। ভারতের সিপাহীদিগের প্ররোচনা করিয়া অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা হয়। বজবজের হাঙ্গামার পরেই গভর্ণমেণ্ট সতর্ক হয় এবং ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পায়।

মূলা সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে সাক্ষী দেয় তাহাতে প্রকাশ পায়—

"আমরা অপর একটী জাহাজে মালয় ষ্টেট, সাংহাই, ম্যানিলা প্রভৃতি স্থান হইয়া আমেরিকায় যাই। কমাগাটামারুর যাত্রীদের উপর যে ভীষণ অত্যাচার হয়, তাহা শুনিয়া আমরা খুব উদ্বেলিত হই এবং ভারতবর্ষে গিয়া আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হই। তারপরে ভারতবর্ষে আসি এবং অমৃতসরে পৌছি।

"অমৃতসরে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বিদ্রোহ করিতে বলেন আর স্বাধীন ভারতেয় একটী পতাকার পরিকল্পনা দেন। ইহা ত্রিবর্ণ পতাকা হইবে—লোহিত, সবুজ এবং নীল। প্রথমটি হিন্দুর মনের ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য দ্বিতীয়টি শিখদের আর তৃতীয়টি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের।"

সুচা সিংও রাজসাক্ষী হইয়া মীরাট, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, ফিরোজপুর, আম্বালা প্রভৃতি সেনাবারিকে যায় তাহা প্রকাশ করে।

গদর পত্রিকা, কামাগাটামারুর যাত্রীদের অবস্থা ও পরিণতি, রাসবিহারীর প্রচার কার্য্য, গণেশ বিষ্ণু পিংলের সহায়তা, সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি এবং আনুসাঙ্গিক কার্য্যে ডাকাতি, খুন, লুট প্রভৃতিকে নির্ভর করিয়া লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সৃষ্টি হয়। এরূপ বিরাট মামলা এই সময়ে আর হয় নাই। প্রথম বারে আসামী ছিল ৬১ জন। সেসনে সোপর্দ করা হয় ১৯১৫ সালের ১৪ নভেম্বর। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার একবৎসর পরে বিচার আরম্ভ হয় ১৯১৬, ২৭ এপ্রিল। মোকদ্দমা শেষ হয় ১৩ সেপ্টেম্বর। কমিসনারদের রায়ে চারিজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ২৪ জনের ফাঁসীর হুকুম হয়। ২৭ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয়। আর ৬ জনকে ৫, ৭, ১০ বৎসর করিয়া

সাজা দেওয়া হয়। অতঃপরে লর্ড হার্ডিঞ্জ ( বড়লাট ), ২৪ জনের মধ্যে ১৭ জনের মৃত্যুদণ্ড দ্বীপান্তরে পরিবর্ত্তন করেন।

সিপাহীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার জন্য যে টাকা প্রয়োজন উহার জন্য মগা, সানেওয়াল, মানসুরন, ঝানের, ছাহের ও রুব্বন প্রভৃতি স্থানে ডাকাতি হয়। রেল লাইন প্রভৃতি উড়াইবার জন্য চেষ্টা হয়।

সে সাতজন নির্ভীকভাবে মৃত্যুবরণ করে, তাহাদের নাম—

(১) গণেশ বিষ্ণু পিংলে। (২) বিষেণ সিং। (৩) জগৎ সিং। (৪) সুরণসিং ( বীরসিং এর পুত্র )। (৫) সুরণ সিং ( ঈশ্বর সিং এর পুত্র ) (৬) হরনামসিং। (৭) কর্ত্তার সিং।

বড়লাট বাহাদুরের আদেশে যাহাদের মৃত্যুদণ্ড হইতে দ্বীপান্তরের আদেশ হয় তাহাদের নাম—

(১) বলবন্ত সিং (২) হরনাম সিংহ তুন্দা (৩) কেদার সিংহ (৪) খুসল সিং (৫) নন্দন সিং (৬) পৃথিসিং (৭) রুলুসিং (৮) সেওয়ান সিং (৯) সোহন সিং (১০) ওয়াসন সিং (১১) ভাই পরমানন্দ (১২) পরমানন্দ (১৩) হির্দ্দেরাম (১৪) জত্রিৎরাও (১৫) রামশরণ দাস।

বহুলোক দ্বীপান্তরিত হয় এবং অনেকের জেল হয়। প্রায় দশজনই হয় রাজসাক্ষী। আবার কর্ত্তার সিং, পিংলে প্রভৃতির আত্মদান খুবই প্রশংসনীয়। ২২ বৎসরের যুবক কর্ত্তার সিংকে দেখিলে মনে হইত যেন একটা পবিত্র জ্যোতি তাহার মুখে প্রতিভাত হইতেছে। সওয়াল জবাব হইয়া গেলে, রায় দেওয়ার পূর্ব্বে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও বিপ্লব-কার্য্যে তাহার সংশ্রব সে জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করে। কর্ত্তার সিং বীরের ন্যায় ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হয়।

পিঙ্গলের ধরা পড়িবার সংবাদ পাইয়া রাসবিহারী তাঁহার সহকর্মী ও বাল্যবন্ধু পশুপতিকে সঙ্গে লইয়া কাশী হইতে চন্দননগরে আসেন। এখানে আসিয়া ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ সাজিয়া রহিলেন। পৈতেতো ছিলই। তার পরে টিকিও ছিল। কেহ আসিয়া পায়ের ধুলা নিলে ঠিক মত তাহাকে

আশীর্ব্বাদ করিতেন। রাসবিহারী বলেন"—একদিন পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ একজনকে হাতজোড় করিয়া প্রতি নমস্কার করিয়া ফেলিয়াছিলাম।"

চন্দননগরে কয়েকদিন থাকিয়া নবদ্বীপে এক বৈরাগীর বাড়ী আসেন। এখানেও বিনায়ক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে রহিল।

প্রতাপ সিংও আসিয়া তাঁহার সঙ্গে নবদ্বীপে সাক্ষাৎ করিল। প্রতাপের সঙ্গে ১৯১৩ সালে রাসবিহারী দিল্লীতে পরিচিত হন। আমিরচাঁদ পরিচয় করাইয়া দেন। প্রতাপ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"প্রতাপ সিং প্রকৃতই সিংহ ছিল। প্রতাপকে বুঝাইলাম কেন আমি বিদেশে যাইতেছি। সমস্ত শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমাকে সে অনেক দিন দেখিতে পাইবে না। এইটা তার প্রাণে বড় বাজিল। সেই প্রতাপের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। প্রতাপ আর ইহজগতে নাই। জেলেতেই প্রতাপ পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। যেখানকার জিনিষ সেইখানেই চলিয়া গিয়াছে।"

রাসবিহারী নবদ্বীপ হইতে আবার চন্দননগরে আসিলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার অপর পাড়ে কাঁচরাপাড়া গিয়া সেখান হইতে কলিকাতা যান। তিনি বিভূতি নামক কাশীর এক কর্ম্মীকে চিঠি লিখিয়া যান :—

"আমি পাহাড়ের ( hills ) দিকে যাইতেছি। দুই বৎসর পরে আবার আসিব।" সব ভার শচীন্দ্র ওগিরিজাবাবুর উপয় রাখিয়া গেলাম।" গিরিজাবাবু সম্বন্ধে রাসবিহারী লিখিতেছেন—"তার মত স্বার্থত্যাগী দেশভক্ত লোক সহজে পাওয়া যায় না। গিরিজাবাবুর আসল নাম নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।"

রাসবিহারী তাঁহার ভারত ত্যাগ সম্বন্ধে নিজেই লিখিতেছেন—

"এই সময়ে সংবাদ পত্রে দেখিলাম, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ জাপান যাইবেন স্থির করিয়াছেন। এই খবর পড়িয়াই মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল। শচীনকে বলিলাম যে পি, এন টেগোর এই নামে একখানি জাপানের টিকিট কিনো। দেরাদুনে প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের একটা mill আছে। সেখানে থাকার

সময় ইহার নাম শুনিয়াছিলাম। Poet Tagoreএর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এই ভাবে পরিচয় দিলে ইংরেজ হঠাৎ সন্দেহ করিতে পারিবে না।

"শচীন টিকেট কিনিয়া আনিল। গিরিজাবাবু দুইটি সাহেবী সুট খরিদ করিয়া আনিলেন। শচীন এবং গিরিজাবাবু যে আমাকে কত ভালবাসে তার ইয়ত্তা নাই। তারাই আমাকে ডকে পৌছাইয়া দিল। এই প্রকারে ১৯১৫ সালের ১২ মে তারিখ খিদিরপুর ডক হইতে Sanuki Maru সানুকি মারু জাহাজে চড়িয়া আমার সাধের জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিলাম।"

এই সম্বন্ধে শচীন সান্যালও লিখিয়াছেন—

"কাশী হইতে রাসুদা বিনায়ক কাপ্‌লেকে সঙ্গে করিয়া প্রথমে নবদ্বীপে আসেন এবং পরে বিদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতার সন্নিকটেই * কোথাও থাকেন। বিদেশ যাত্রা করিবার দিন চারেক পূর্ব্বে তিনি কলিকাতারই জনকোলাহল পূর্ণ এক পল্লীতে আসিয়া থাকেন এবং একদিন দিনদুপুরেই আমাতে ও গিরিজাবাবুতে গিয়া তাঁহাকে জাহাজে চড়াইয়া দিয়া আসি। ইহা ১৯১৫ সালের * এপ্রিল মাসের কথা।

পর পর তিনটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার * ভিন্ন ভিন্ন ট্রাইবুন্যালে বিচার হয়। প্রথমটিতে হরদয়াল, গদর, রাসবিহারী এবং পিঙ্গলেই ছিল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রীভূত বিষয়। এই মোকদ্দমায় যে ৭ জনের ফাঁসী হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাতে ৪০৪ জন সরকারী পক্ষের সাক্ষী ছিল, ২২৮ জন ছিল ছাপাই সাক্ষী। এই মোকদ্দমায় রাজ সাক্ষী ছিল ৯ জন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার দ্বিতীয় দফের যে বিচার হয় উহাতে ১০০ জন

* চন্দন নগর

* রাসবিহারী বলেন ১২ই মে। তাহার তারিখই ঠিক বলিয়া মনে হয়।

* ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে পোষ্টাফিসের উপরে

উপস্থিত আসামী ও ফেরারী আসামী ১২ জন। ৩৬৫ জন ছিল সরকারী সাক্ষী, ১০৪২ ছাপাই। ট্রাইবুনেলের বিচার আরম্ভ হয় ১৯১৫, ২৯ অক্টোবর। রাসবিহারী তখন দেশ ছাড়িয়া জাপানে। কিন্তু মোকদ্দমা তাঁহাকে ছাড়ে নাই। বিচারক ছিলেন মেজর আর্ভিন (Major A. A. Irvene, Sesssion Judge T. P. Ellis. আর পণ্ডিত শিবনারায়ণ। এই মোকদ্দমায় রাজসাক্ষী ছিল ১৬ জন।

পূর্ব্বের ঘটনা লইয়াই মোকদ্দমা হয়, তবে পূর্ব্বে ফেরারী আসামী, নূতন আমেরিকা প্রত্যাবৃত্ত শিখ, গত মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গিগণ আসামী শ্রেণীভূক্ত হয়। এখানেও রায়ে থাকে যে সৈনিকগণকে উত্তেজিত করা হয় এবং ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুরারী সিপাই উত্থানের তারিখ স্থির করা হয়। ধুটিলা জায়গায় বিপ্লবীরা সমাগত হইত, ১১ই জুন ( ১৯১৫ ) পরবর্ত্তী বিদ্রোহের অভ্যুত্থানের তারিখ নির্ব্বাচিত হয়। মোকদ্দমার কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ হয়। (১) মগার ট্রেজারী লুট করার আয়োজন হয়। (২) কর্পূরতলা রাজ্যের ট্রেজারী লুট করার ষড়যন্ত্র হয় (৩) ওয়ান ক্যানেলের (খালের) উপরিস্থ সেতুটী উড়াইয়া দেওয়ার জন্য আক্রমণ হয়। ২ জন লোক সেইথানে নিহত হয় এবং পালাইবার সময় দুইজনকে খুন করা হয়। এই শেষোক্ত ব্যাপারে মোকদ্দমার বিচারে যে পাঁচজনকে ঘটনাস্থলে ধরা হয় তাহাদিগকে ফাঁসী দেওয়া হয়। (৪) ১৫ এপ্রিল তারিখে (১৯১৫) চন্দন সিংহের হত্যা, কমাগাটা মারু আসিবার পরে অসন্তোষ বৃদ্ধি এবং ২রা আগষ্ট (১৯১৫) কর্পূর সিংয়ের হত্যা।

তৃতীয় অতিরিক্ত মোকদ্দমার প্রমাণ দেওয়া হয় জার্ম্মান অনুচরবর্গ সর্ব্বদা প্রচার ও চেষ্টা করিতেছিল যে একদিকে ভারতের বিদ্রোহ ঘোষিত হইবে, অন্যদিকে বাহির হইতে পশ্চিম হইতে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া ও পূর্ব্বদিকে বার্ম্মা-দেশের মধ্য দিয়া ভারত আক্রমণ হইবে। এইজন্য অজিত সিং, হরদয়াল, বীরেন চট্টোপাধ্যায় বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

হরদয়াল ও চাটার্জ্জি ছিলেন বার্লিনে আর অজিত সিং কথনও পারস্যে, কথনও কাবুলে, কথনও রায়ওজেনেরায় ( দক্ষিণ আমেরিকায় ) !

তৃতীয় মোকর্দ্দমায় 'মেভারিক' জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা কেবল শুনিতাম মেভারিক জাহাজে পেট্রোল আসিত কিন্তু একটি ট্যাঙ্কে আসে আগ্নেয় অস্ত্র। কিন্তু জাহাজ আটক হইলে জানা গেল মেভারিক সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম সবই প্রহেলিকাময় !

তৃতীয় মোকর্দ্দমা ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোরেই আরম্ভ হয়। ট্রাইবুন্যালের জজ ছিলেন T. P. Ellis ( প্রসিডেন্ট ) Major Trezillie লাহোরের জিলাজজ, ও রায় বাহাদুর গোপাল দাস। সতের জনের বিচার হয়। ইহাতে বিদেশাগত ব্যক্তিদের নাম :—

(১) বাবুরাম ( আমেরিকা হইতে আগত )
(২) বলবন্ত সিংহ ( ক্যানেডা হইতে )
(৩) কর্ত্তার সিংহ
(৪) সফি আবদুল্লা
(৫) নায়না
(৬) রুরসিং এই ছয়জনই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।
(৭) বলন্তন সিং ( যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর )
(৮) ফজলুদ্দিন ( দীর্ঘ কারাবাস ) আরও আটজনের কারাবাস হয়।

(১৭) নম্বর ঠাকুর সিংহ মুক্তিলাভ করে।

ইঁহারা পিনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, ম্যানিলা, কেনেডা প্রভৃতি স্থানে ষড়যন্ত্র করেন, আর মুণ্ডি রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, গদর পত্রিকা ও হরদয়াল রচিত 'গদর কি গঞ্জ,' তাহার আর একখানা পুস্তক।

"নিম্ হাকিম খতর জান" ষড়যন্ত্রের বিষয়ীভূত হয়। বরকতুল্লা যে তুরস্ক হইয়া আফগানিস্থানে বিদ্রোহের নিশান তুলিতে যান তাহাও প্রকাশ পায়।

যে সমস্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দী জার্ম্মানদের হাতে ছিল, তাহাদিগকেও বিদ্রোহে যোগদান করিতে উত্তেজিত করা হইয়াছিল।

এখন মেবারিকের কাহিনী সম্বন্ধে জনৈক রাজসাক্ষীর চাঞ্চল্যকর কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া বিচার-কর্ত্তাগণ বলেন—

“গদর পত্রিকার রামচন্দ্রই এই লোকটিকে হরিসিংহ সহ মেভারিক জাহাজে এপ্রিলমাসে ( ১৯১৫ ) রওনা হইতে প্ররোচিত করে। ছদ্মনামে তাহারা স্থান পেড্রো হইতে মেভারিকে উঠে। এটি তেলের জাহাজ। ইহার একটি ট্যাঙ্ক খালি ছিল। জাহাজের পতাকা ছিল আমেরিকার, ইহার কাপ্তেনরা ছিল আমেরিকাবাসী, নাবিকগণ ছিল মার্সেল দ্বীপ বাসী। ইহারা পূর্ব্বে জার্ম্মানীর প্রজা ছিল। ইঞ্জিনে কাজ করিত মেক্সিকোবাসীরা। প্রথমে তাহারা মেক্সিকোর একটি বন্দরে আসে, তারপরে যায় সিগারোদ্বীপে। এই দ্বীপটি জনমানবশূন্য। এখানে তাহারা কোন জিনিষের আশায় প্রায় মাসেক কাল অবস্থান করে। মাঝে মাঝে আমেরিকার কয়েকটি জাহাজ আসিয়া ইহার খানা-তল্লাস করিয়া যায়। আরও মাসেকের উপরে বিনা উদ্দেশে প্রশান্তমহাসাগরে ঘুরিয়া ২২শে জুলাই জাভাতে পৌঁছে। একটি ওলন্দাজ (Dutch) টর্পেডো বোট্ ইহাকে আটক করে। মেভারিক গুপ্তভাবে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করিয়া বিপ্লবীদের সহায়তার জন্য নিযুক্ত হয়।

মণ্ডি ষ্টেটের বিদ্রোহের প্রস্তাব ছিল যে উক্তরাজ্যের উজিরকে ও পলেটিক্যাল এজেণ্ট মিঃ গর্ডন ওয়াকারকে খুন করিয়া রাজ্যটি করায়ত্ত করিবে। নিধান সিং এই কার্য্যে নিয়োজিত হয়। এই নিধান সিংএর কথাই রাসবিহারী উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও লাহোরে ছয়টি ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা হয়। সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। তবে একটিতে লালচাঁদ ফালক নামক এক ব্যক্তির ১০ বৎসর দ্বীপান্তর হয়। সে ১৯০৯ সাল হইতেই ষড়যন্ত্রের কার্য্যে লিপ্ত ছিল।

অতঃপরে যে ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট ও ইনগ্রেস ইণ্টু ইণ্ডিয়া য়্যাক্টে স্যার মাইকেল ওডায়ার বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে (অনুমান ৩।৪ হাজার ব্যক্তিকে) অন্তরীণে

আরম্ভ করে। অনেককে নির্দ্দিষ্ট স্থানের সীমা অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় না। স্যার মাইকেল এতই সতর্কতা অবলম্বন করেন যে লোকমান্য তিলক ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের পর্য্যন্ত পাঞ্জাবের সীমানায় আগমন নিষিদ্ধ হয়। তাঁহারা আসিতেছিলেন হোমরুল সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য চালাইতে।

গদর আন্দোলনকে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ ভয় করিত। এর পরে নিউ ইয়র্কে রামচন্দ্র, ভন বর্‌ (স্যান ফ্রান্সিসকোর জার্ম্মান কন্সাল), চক্রবর্ত্তী, গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজনের বিচার হয়। রামচন্দ্রই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এতাবস্থায় জামিনে খালাস পাইলে কেহ তাহাকে হত্যা করে। বাকী কয়জনের কেবল অর্থদণ্ড হয়।

রাওলট কমিটির রিপোর্ট পড়িয়া মনে হয় হরদয়ালের বিচার হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়, বিচার হয় গদরের রামচন্দ্রের। হরদয়াল যুদ্ধ শেষ হইলে সুইজারল্যাণ্ডেই থাকেন এবং রাজনীতি চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন। পরে লণ্ডনে গিয়া কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। তারপরে সেই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। শেষদিকে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মত কোন কাজ তিনি করেন নাই। রাসবিহারীর সহিত এইখানেই অন্য বিপ্লবীদের পার্থক্য। রাসবিহারী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার ধ্যানেই মগ্ন ছিলেন।

---

# দ্বাদশ অধ্যায়

## বেনারস ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

## (Benares Conspiracy Case.)

কাশীতে শচীন সান্যাল প্রথমে ঢাকা অনুশীলন সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করে। দুই এক বৎসর মধ্যে যখন অনুশীলন সমিতি বে-আইনি বলিয়া ঘোষিত হয়, শচীন সান্যাল তখন সমিতির নাম দেন 'যুব সমিতি' (Students' Youth League )

৪।৫ বৎসর এই ভাবে কাজ চালাইবার পরে রাসবিহারী যখন কাশী আসেন শচীন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজ করিতে থাকেন। উক্ত ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়—

(১) নানাস্থানের সেনাবারিকে অসন্তোষ উৎপাদন

(২) সৈন্যগণকে বিদ্রোহ করিতে উত্তেজিত করা

(৩) বিস্ফোরক বোমা তৈয়ার

(৪) উৎকট রাজদ্রোহ মূলক পুস্তকাদি প্রচার

বেনারস ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় শচীন সান্যালই প্রধান নেতা ও আসামী ছিলেন। শচীন ধৃত হন ১৯১৫ সালের ২৬ জুন। রাসবিহারী সেই সময়ে জাপানে। মোকদ্দমার রায়ে ট্রাইবুন্যালের জজেরা বলেন "রাসবিহারীই ছিলেন নেতা এবং শচীন ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। রাসবিহারী ছদ্মবেশে বেনারসে থাকিয়া শচীন সন্যাল প্রভৃতির সহায়তায় উত্তর ভারতে ২১শে ফেব্রুয়ারী সমস্ত সিপাহীদের দ্বারা একটী বিদ্রোহ করাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।' শচীন সম্বন্ধে রাসবিহারী বলেন—"আমার মায়ের পেটের

ভাইএর চেয়েও তাকে আমি ভালবাসি এবং আপনার বলিয়া মনেকরি। তার সাহসিকতা, স্বদেশপ্রেম ও আত্মদানের ভাবে আমি মুগ্ধ। তার সাহায্য না পাইলে আমি একপদও অগ্রসর হইতে পারিতাম না।"

মোকদ্দমা প্রায় ছয়মাস চলে এবং ১৯১৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী রায় বাহির হয়। এই মোকদ্দমার বিভূতিভূষণ হালদার নামে বসিরহাট নিবাসী এক বাঙ্গালী যুবক এপ্রুভার হয়। সে রাসবিহারীর বিশ্বাসভাজন ছিল। বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এই সাক্ষী বর্ণনা করে, রাসবিহারী কিরূপ পুলিসের চোখে ধূলাদিয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের ন্যায় জনাকীর্ণ স্থানেও বাস করিতেন। সেই চমকপ্রদ কাহিনী শুনিতে শুনিতে কমিসনাররা অলক্ষ্যে কয়েকটি মিনিট কলম বন্ধ করিয়াছিলেন। রায়েও এই বিষয়গুলি উজ্জল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ১৯১২ হইতে ১৯১৫ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে রাসবিহারীর চালচলন এমন রহস্যময় ছিল যে দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় পর্য্যন্ত দুইপক্ষেরই দুইজন প্রসিদ্ধ কৌন্সিলি, স্যার জন এলষ্টন ও মিঃ নর্টন তাহার দুর্জ্ঞেয় গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ না করিয়া পারেন নাই।

বেনারস ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় শচীন সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। শচীন সান্যাল বাঙ্গলার অন্যতম যোগ্যতম বিপ্লবী নায়ক। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে সম্রাটের ঘোষণানুসারে তিনি মুক্তিলাভ হয়েন। ১৯২০ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাকে, তাঁহার মাতা, মাসীমাতা ও স্ত্রী সহ কুতব মিনার কি হুমায়ুনের সমাধির নিকট দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া অকালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় যাহাদের দণ্ড হয়:—দামোদর স্বরূপ (মাষ্টারজী) গণেশ লাল, নলিনী মুখার্জ্জি, প্রতাপ সিংহ, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রত্যেকে ৫বৎসর, আনন্দ ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিম মিত্র, কালীপদ প্রত্যেকের ৩বৎসর, শচীন সান্যালের সহোদর জিতেন সান্যালের ২বৎসর। রবীন্দ্র ও সুরেন্দ্র মুখার্জ্জিকে

মুক্তি দেওয়া হয়। জজেরা বলেন এখানে অনেক আয়োজন হইয়াছিল বটে, কিন্তু লাহোর ও দিল্লীর ন্যায় লোক হতাহত ও ডাকাইতি হয় নাই বলিয়া আসামীদের অল্প শাস্তি দেওয়া হইল।

লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আবার দ্বিতীয় বারেও আরেকটি মোকদ্দম হয়, ইহাতেও বহুলোকের ফাঁসী হয়। অধিকাংশই পাঞ্জাবী শিখ্। প্রথম বারে রাজসাক্ষী হয় ৯জন, এবার হয় ১৬ জন। ইহারাও পাঞ্জাবী শিখ্। একদিকে মৃত্যুঞ্জয়ী দেশভক্তগণ, অন্য দিকে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ইহাদের সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দননগর সমিতির সহায়তায়ই রাসবিহারী ছদ্মবেশে থাকিয়া জাপান যাত্রা করিতে সমর্থ হন। পাসপোর্টে তাঁহার নাম দেওয়া হয় পিএন ঠাকুর। পূর্ব্বে চন্দননগরে তিনি গুরুঠাকুর সাজিয়া ছিলেন। বিলম্বিত যজ্ঞোপবিত, সদাই পূজাহ্নিকে ব্যস্ত, মুখে হরহর বম্‌বম্, রামরাম, কিষণজী অসংখ্য লোক আসিয়া পদধূলি গ্রহণে আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইত। তিনিও 'জিতারোহ' ভালা হোগা প্রভৃতি বাক্যে আশ্বাস দিতেন।

অতঃপরে পাসপোর্ট পাইয়া যখন ১৯১৫, ১২ই মে জাপান চলিয়া গেলেন সেখানে গিয়াও ভারত এবং দেশকে ভোলেন নাই। সেখানে প্রথমে গিয়া জাপানের অন্যতম সচিবের কন্যা বিবাহ করিয়া নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হন। রাসবিহারী পুস্তক লেখেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সেখানেও তিনি সর্ব্বদা চিন্তাও চেষ্টা করিতেন।

এই প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তকের নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"রাসবিহারী জাপান-মন্ত্রীদের সহায়তায় জার্ম্মানীর কাইজারের সহিত পরিচয় করিলেন। জাপান এই সময়ে বাহ্যতঃ জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও অন্তরে অন্তরে তাহার রাষ্ট্রনায়ক গণের ভারত হইতে ইংরাজ রাজ্যের উচ্ছেদ-কামনা ছিল। জাপানের সাহায্যে কাইজারের অর্থে ও স্বার্থে দুইটি অস্ত্র সজ্জিত জাহাজ ভারতের অভিমুখে যাত্রা করিল। সেই অস্ত্র

শস্ত্র পূর্ণ জাহাজ সুন্দরবনের অদূরে আসিল। বংশীধ্বনি করিলেই বিপ্লবীরা অস্ত্র তীরে উঠাইবে এই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু হংকং বন্দরে একজন ইস্‌লামধর্মী সহ-কর্মী কর্তৃপক্ষদের একথা জানাইয়া দিল। জাহাজখানি তল্লাস হইল। বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টাও আবার ব্যর্থ হইয়া গেল। অস্ত্র সরবরাহ সম্বন্ধীয় নির্দ্দেশপত্র খানিও পুলিসের হস্তগত হইল। বাংলায় আবার ধরপাকড়ের ধুম পড়িয়া গেল। ( প্রবর্ত্তক শ্রাবণ ১৩৫৪ সাল। )*

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমস্ত উত্তর ভারতের সিপাহী অভ্যুত্থানের যে বিরাট ষড়যন্ত্র হয়, তাহার অধিনায়কই ছিলেন রাসবিহারী। শচীন সান্যাল, পিংলে, বিনায়ক, কর্ত্তার সিংহ, দামোদর, যমুনাদাস প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। বেনারস ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় কমিসনার গণের রায়ের কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"The Conspiracies at Lahore, Delhi and Benares were all parts of one big movement but the centre of the movement was in the Punjab, where there was very different matereal to deal with from the Bengali striplings who form bulk of the acsused here. The discovery at Meerut of loaded bombs is sufficient to show to what deadly results the movement there was capable of leading.

Rashbehari was the leader of the conspiracies and Sachin was chosen lieutenant in Beneras. He had at first started a branch of the Dacca Anusilan Samity at Beneras, but when the Dacca association was banned in 1908, Sachin started Sewak Samity or Youngmen's Association forming a branch of the Delhi and Lahore conspiracies.

"In a house at Harish Chandra Ghat Beneras, an important

কিরূপে গ্রেপ্তারের পুরস্কার ঘোষণা সত্ত্বেও প্রায় দশমাস এই বারাণসী ধামেই রাসবিহারী পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া স্বচ্ছন্দমনে রহিয়াছেন, কিরূপে ভারতত্যাগের পূর্ব্বে জনাকীর্ণ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে পোষ্টাফিসের উপরেও কয়েকদিন থাকিয়া গিয়াছেন, বেশ জ্বলন্ত ভাষায় কমিসনারগণ তাহা বর্ণনা করেন।

বেনারস ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রায় বাহির হয় ১৯১৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে।

পরের অধ্যায়ে আমি দেখাইব যে যতীন্দ্র বাবুর দলও এই সময়ে বিদেশ হইতে অস্ত্র শস্ত্র আনাইবার জন্য নিজেদের লোক বিদেশে পাঠাইয়াছেন। শচীনবাবু বলেন দেশে আমরা বিভিন্ন দল এইরূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করিতেছিলাম বটে, কিন্তু বিদেশে সে সময় সকল দলই বোধ হয় মিলিত হইয়াছিলেন।

শচীনবাবু আরও বলেন "রাসবিহারী বাবুর বিদেশ যাত্রার খরচ, এক সহস্র মুদ্রা এই ঢাকা অনুশীলন সমিতির নিকট হইতেই লওয়া হয়।"

রাসবিহারী দেশ ছাড়িয়া যাইবার পরেও চন্দননগরের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল। তিনি শ্রীশ ঘোষ মহাশয়কে পত্র লিখিতেন। একখানি পত্র আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। তাহাতে লেখা ছিল,—গুপ্ত বোমায় আধ্যাত্মিকতার সংস্পর্শ নাই, তাই আমি উহা বর্জন কয়িয়াছি, আমি চাই ভারতে মুক্তি যেমন সামাজিক

meeting was held presided over by Rashbehari and attended by Sachin, Damodar, Pingle, Venayak Rao, Jamuna Das and Bibhuti; when it was settled to have rebellion all over the country with Damodar as leader of Allahabad, Rashbehari going to Lahore with Pingle and Sachin and Vinayak would take bombs from Bengal to Lahore, Kartar Singh and Suchi Sing also came when events moved rapidly, Rashbehari and Sachin left Beneras and the centre shifted to Lahore and Delhi.

ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তেমন নৈতিক ও জাতীয়তার দিক্ দিয়া, কিন্তু সকলেরই ভিত্তি হইবে ধর্ম্মের উপরে।* আমরা যা কিছু করিব, প্রকাশ্যে করিব, গোপনে নহে।"

ভারতের মুক্তি রাসবিহারীর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একান্ত সাধনার বস্তু হইয়াছিল।

রাসবিহারীর সঙ্গে চন্দননগরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই উক্ত স্থানের কথা বলিতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ ও বিপ্লবী বীর রাসবিহারী উভয়েই দেশের শত্রুদের হাত হইতে মুক্ত হন চন্দননগরের সহায়তায়। চন্দননগরের শিক্ষাগুরু চারুচন্দ্র রায়, বীর শহীদ কানাইলাল, অগ্নিযুগনেতা উপেন্দ্রনাথ, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্থাপয়িতা বিপ্লবী মতিলাল যে স্থানকে ধন্য করিয়াছেন, সেখানকার নাম বাঙ্গালীর নিকট চিরদিনই সমাদৃত হইবে।

শচীন সান্যাল ধৃত হন ১৯১৫ সালের জুনমাসে, আর রাসবিহারী দেশ ছাড়িয়া যান তিনমাস পূর্ব্বে এপ্রিল মাসে। সুতরাং রাসবিহারীর যাওয়ার পুর্ব্বে শচীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। শচীনবাবু জাহাজেও রাসবিহারীকে কাছে উঠাইয়া দিয়া আসেন। যাইবার পূর্ব্বে রাসবিহারী বিভূতি প্রভৃতি অন্যান্যের যাওয়ার কথা গোপন রাখিয়া নিজে বিভূতিকে লিখিয়া যান—

'আমি পাহাড়ের দিকে ( hills ) যাইতেছি। দুই বৎসর পরে আবার আসিব। সব ভার শচীন্দ্র ও গিরিজার উপরে রাখিয়া গেলাম।"

* "I think you already know that my whole existence and Sadhona are for the sole purpose of the political, social, moral and spiritual foundation. Our activities must be open and above board. Secret conspiracy can not bring in salvation. Whatever we have to say or do we must say or do it openly. I hope you understand me correctly".

—Letter to Sj. Srish Ch. Ghosh, Prabartak.

কিন্তু ইহাই শেষ বিদায়। রাসবিহারী আর স্বদেশে আসিলেন না।

শচীন সম্বন্ধেও বেনারস ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার হাকিমরা বেশ উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করিয়াছেন—

"There are elements in his character which might have made him a useful and even a noble member of society; as for instance his joining the band of volunteer relief workers in the Damodar floods. The perverted elements have however gained the upperhand and he then became an anarchist of a peculiarly dangerous type—the type of man who incites others to deeds of violence while keeping in the background himself. No sentence short of transportation for life would be at all adequate in this case."

উত্তর ভারত, বিশেষতঃ পাঞ্জাবে যে ভীষণ বিদ্রোহের সূচনা হয় তাহা থামিবার পরই 'ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের' পত্তন হয়। বাঙ্গালার অবস্থা খুবই ভয়াবহ হইয়াছিল, তবে পাঞ্জাবের মত নয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচীব স্যার রেজন্যাল্ড ক্রাডক (Craddock) বিলটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার সময় স্পষ্টই বলেন :—

"We have had anarchism for a long time in Bengal, but situation in the Punjab was serious, in Bengal it was less so."

কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গলায় এমন ধরপাকড় আরম্ভ হইল যে এমন গৃহ ছিল না যেখান হইতে একটি দুইটি পাঁচটি ব্যক্তি এই দুরন্ত আইনের কবলে পড়িয়াছেন। কলেজের ছাত্র, উকীল, চাকুরে, ব্যবসায়ী কাহারও ত্রাণ ছিল না।

রাসবিহারী সম্বন্ধেও বেনারস ট্রাইবুন্যালের হাকিমেরা নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

"It is a remarkable fact that Rashbehari though a reward was offered for his arrest and his photo had been widely circulated should have succeeded in living in Benares during

he whole of 1914 without the police being aware of his presence. He seems to have taken the precaution of going out chiefly at night but in the early part of his stay interviews are described as taking place at day time out of doors, either in Victoria Garden or some other gardens.

In a house near Harish Chandra Ghat an important meeting was held by Rashbehari with Sachin, Damodar, Pingle, Vinayak Rao, Jamunadas and Bibhuti, when it was settled to have rebellion all over the country with Damodar as leader of Allahabad, Rashbehari going to Lahore with Pingle and Sachin when events moved rapidly and Vinayak would take bombs from Lahore. Kartar Singh and Suchi Singh also came. Sachin then left Benares and the centre shifted to Lahore and Delhi.

## গদর ও আমেরিকার বিচার

যুদ্ধ লাগিবার তিনবৎসর পূর্ব্ব হইতেই (১৯১১) কূটচক্রী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তায় সেনফ্রান্সীসকোতে গদর-বিপ্লবী-দল গঠন করেন। এই দল ক্রমে ক্যালিফর্ণিয়া, অরিগন ও ওয়াসিংটনের সর্ব্বত্র সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে। এই দলের প্রচার বাণী-ই ( slogan ) ছিল যে জার্ম্মানী শীঘ্রই ইংলণ্ড দেশ আক্রমণ করিবে। **The Fatherland would strike England.**

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'ভারতীয় জাতীয় দল' **The Indian National Party** চেম্পকরাম পিলাইর চেষ্টায় বার্লিনে স্থাপিত হয় ১৯১৪ সালে; আর ইহার সভ্য ছিলেন, শ্রীতারকনাথ দাস, বরকতুল্লা, হেরম্বলাল গুপ্ত প্রভৃতি, এই দুই দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

১৯১৭ সালের ২২ নভেম্বরে সেনফ্রান্সিসকোতে হরদয়াল ও রামচন্দ্রের গদর সংক্রান্ত কার্য্যকলাপের পরিণতিকে ভিত্তি করিয়া একটি ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার

বিচার হয়। এই মোকদ্দমার প্রধান আসামী হন রামচন্দ্র, মিওন বব্ ( Bob ) (জার্ম্মান কনসাল অব ফ্রিসকো), হেরম্বলাল গুপ্ত ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রায় ১৭।১৮ জন। আসামীরা জামিনে খালাস পান এবং মিঃ গুপ্ত আমেরিকা হইতে চলিয়া আসেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর জরিমানা হয়। মোকর্দ্দমা চলিবার সময় রামচন্দ্রকে কে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। শুনিয়াছি ইহা ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে হইয়াছিল।

এসিয়ার দুইটি বিপ্লবকেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য, একটি ব্যাঙ্ককে। ইহার সাহায্যে ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশ এবং পূর্ব্বাংশ হইতে ভারতাক্রমণের পরিকল্পনা হয়। দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল ব্যাটাভিয়ায়—। উভয় পরিকল্পনাই সাংহাইতে যে জার্ম্মান কনসাল জেনারেল ছিলেন, তাঁহার নির্দ্দেশে হয়। ব্যাটাভিয়ার পরিকল্পনায় তিনি বাঙ্গালার বিপ্লবীগণের সহায়তার উপর বিশেষ নির্ভর করেন। তাহা কিরূপ সাফল্য লাভ করে, যথাস্থানে আমরা উহা উল্লেখ করিব।

পরে চিকাগোতেও একটি বিচার হয় এবং তাহাতে আসামী ছিলেন হেরম্বলাল গুপ্ত, জার্ম্মান ওয়েল্ডি ( **Welhde Boehm and Herambalal Gupta** )

---

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## নূতন যুগান্তর সমিতি ও যতীন্দ্রনাথ

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে যতীন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করেন এবং ইহার পরে দুই আড়াই বৎসর বিপ্লবী মন লইয়াও তাহাকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হয়। তখনও কংগ্রেসে অগ্রগামী দল প্রবেশ করেন নাই। মডারেট কংগ্রেসই পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছিল। প্রকাশ্যে কোন আন্দোলনই ছিল না। কিন্তু ১৯১৩ সালের বর্ষায় দামোদর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্দ্ধমান জিলার লোকদের এত অসুবিধা ও লাঞ্ছনা হয় যে অসংখ্য লোকের দুঃখ, অভাব ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য বাঙ্গালার যুবমণ্ডলী বিশেষভাবে অগ্রসর হন। এইখানেই শ্রীযুক্ত মাখন লাল সেন, অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ, মতিলাল রায়, শচীন্দ্র সান্যাল, যতীন্দ্র রায় প্রমুখ কর্ম্মীগণের মিলন ও ভাবের আদান প্রদান হয়। বন্যায় মাখনবাবুর কাজ এই সময়ে বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল।

ইহার কয়েকমাস পরেই ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধে এবং বঙ্গদেশীয় বিপ্লবীরা ব্রিটিশের পরাজয়ে ভারতের মুক্তি আসন্নজ্ঞান করিয়া সময় বুঝিয়া অস্ত্র শানাইতে প্রস্তুত হন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা উত্তরপাড়ায় গঙ্গাতীরস্থ গ্রাণ্ড ট্যাঙ্ক রোডের উপরে প্রাচীন শিবমন্দিরে রাত্রিতে একটী গুপ্ত সভাতে মিলিত হন। এই সভায় মাখনবাবু, যতীন্দ্রবাবু, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অমরেন্দ্রবাবু, নরেন্দ্র সেন, মতিলাল রায় ও শ্রীশ ঘোষ ( চন্দননগর ) প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্থির হয় যে তাঁহারা অবিলম্বে কাজে প্রবৃত্ত হইবেন। আর যতীনবাবু বাঙ্গালার বিপ্লবী শক্তি পুনর্গঠন করিবেন।

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বলেন "স্থির হইল বিপ্লব শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

বাংলার দশ সহস্র যুবক প্রস্তুত করার ভার অনুশীলন সমিতির উপর থাকিবে; সহস্র বোমা নির্ম্মাণের ভার লইবে চন্দননগর। অর্থাদি সংগ্রহ করা ও স্থানে স্থানে বিপ্লবীসঙ্ঘ স্থাপনের ভার বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল।”

কিন্তু অবশেষে সমস্ত নেতৃত্ব আসিয়া যতীনবাবুর হাতেই পড়িল। যতীন্দ্রনাথ সকল দলকেই ডাকেন। মাদারীপুরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে একটি দল ছিল। তাহার প্রধান কর্ম্মী ছিলেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন দাশগুপ্ত, রাধাচরণ পরামানিক, পতিতপাবন প্রভৃতি।

বরিশালের দল ছিল স্বামী প্রজ্ঞানন্দের (স্বরেশ মুখোপাধ্যায়ের) নেতৃত্বে; এখানকার প্রধান কর্ম্মী ছিলেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন্দ্র দত্ত, সত্য বসু প্রভৃতি।

নোয়াখালীর দলে ছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, নগেন্দ্র গুহ রায় ইত্যাদি। তবে নোয়াখালীর দল বরিশালের দলের সহিত মিশিয়া কাজ করেন।

খুলনা দলের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ময়মনসিংহের সাধনা সমিতির নেতা ছিলেন হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী। আনন্দ মজুমদার (৺শ্যামাচরণ রায়ের জামাতা) সুরেন্দ্র মোহন ঘোষও অন্যতম বিশিষ্টকর্ম্মী ছিলেন।

আত্মোন্নতি সমিতির নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্র ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি।

এই নয়টি দলই যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কোন কোন দল ইহাদের সঙ্গে যোগদান না করিয়াও বিপ্লবাত্মক কার্য্যে রত ছিলেন। যেমন বাঙ্গালার ভিতরের অনুশীলন দল। চন্দননগরের দলও পুরোপুরী ভাবে যোগদান করে নাই।

এপর্য্যন্ত পূর্ণবাবুর দলেরই কর্ম্মতৎপরতা ছিল খুব বেশী। আর এই দলের কর্ম্মীগুলিও ছিলেন বিশেষ তেজস্বী। তাহাদের বিরুদ্ধে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

উপস্থিত হয় এবং আসামীও হন প্রায় পঁয়ত্রিশ জন। মোকদ্দমা হয় মাদারীপুরে। অভিযোগের বিষয় হয় চারিটি ডাকাতি :—

(১) গোপালপুর (ফরিদপুর)—১৮০০০৲ অপহৃত হয়।

(২) কাউকুঁড়ি—ঐ

(৩) ভরাকৈর (ঢাকা) সাহার বাড়ী ৫৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়

(৪) কোলা (ঢাকা)

হাই স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মাদারীপুরে বিপ্লব সমিতি গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের কার্য্য করা এবং তদুদ্দেশ্যে ভয়প্রদর্শন করিয়া ধনীদের গৃহ হইতে অর্থ সংগ্রহ করা। এই আদর্শ যুবকদের মধ্যে প্রচারের জন্য বামন চক্রবর্ত্তী, রাজেন্দ্র সরকার ও রসরঞ্জন গুহঠাকুরতার চেষ্টায় একটি হরিসভা গঠিত হয়। ক্রমে ইহার বহুশাখা মাদারীপুর ও বিক্রমপুরে স্থাপিত হয়—

খালিয়া—শ্রীকালী প্রসাদ বানার্জি, চিত্তপ্রিয় রায়, সুরাজ রায় ইতাদি।

আমগ্রাম—কেশব রায়, কালীপদ রায় চৌধুরী ইত্যাদি।

বাজিতপুর—বিনোদ ব্রহ্মচারী (পরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ) কুলচন্দ্র নাগ, বনবিহারী দাস ইত্যাদি—

কেন্দুয়া—সন্তোষ দত্ত, শুভেন্দ্রমোহন বসু, যামিনীকান্ত দাস

খয়ের ভাঙ্গা—মনোরঞ্জন গুপ্ত, নীরেন্দ্র দাশগুপ্ত

কুলপদ্দি—মনোমোহন ভট্যাচার্য্য, মনোরঞ্জন বক্শী

মাণিকগঞ্জ—হরিদাস, প্রফুল্ল চট্যোপাধ্যায়

ভাঙ্গা—যতীন্দ্রচন্দ্র ভট্যাচার্য্য

ইদিলপুর—জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু, নিরঞ্জন দাস ইত্যাদি

কালামৃধা—দীনেশ মুখার্জি

নিলখি—শরৎচন্দ্র দাস

কোটালিপাড়া—বিজয় চক্রবর্ত্তী।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণের অনেককে লইয়াই ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা

উপস্থিত করা হয়। কয়েকমাস মোকদ্দমা চলিবার পরে পূর্ব্বোক্ত রাজেন্দ্র দে সরকারী এপ্রুভার হয়। স্বীকারোক্তি করিবার পূর্ব্বে সে দুইজন উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিল। তন্মধ্যে একজন ছিলেন স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক। কিন্তু তাহার সাক্ষ্য এত অবিশ্বাস্য হয় যে ইহার পরেই সরকার পক্ষ মোকদ্দমাটি উঠাইয়া লয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের অনেকেই মুক্তিলাভ করেন, কয়েকজনকে সেই সময়েই পুনরায় ধৃত করিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয়।

মোকদ্দমা শেষ হইবার কয়েকমাস পরে উক্ত সম্পাদকের বাড়ীতে বোমা ফেলা হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

এই মোকদ্দমায় ঢাকার প্রসিদ্ধ দেশনায়ক শ্রীযুক্ত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় উকীল আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন।*

পূর্ণবাবুর দলের নীরেন, মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয়, রাধাচরণ পরামাণিক যুগান্তর সঙ্ঘের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে যে কিরূপ একনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা পরে বলিব।

যতীনবাবু অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তখন দল গঠন করিতেছিলেন, এ বিষয়ে শীঘ্রই একটি সুযোগ উপস্থিত হয়।

রডা কোম্পানির জনৈক বিপ্লবপন্থী কর্ম্মচারীর সহায়তায় ৫০টি মশার পিস্তলপূর্ণ একটি বাক্স ও বহুসংখ্যক কার্টিজ পাওয়াতে যতীন্দ্রনাথের সঙ্ঘের বিশেষ সুবিধা হইল। ঘটনাটি এই—

## রডা কোম্পানী ও মশার পিস্তল

ভান্সিটার্ট রোডে রডা কোম্পানীর একটী বন্দুকের দোকান ছিল, ইহার অধ্যক্ষ (বড় সাহেব) ছিলেন মিঃ প্রাইক্ (Pryke)। ইউরোপ, আমেরিকা

* বালেশ্বরের উকীল উপেন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে লিখিয়াছেন, ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিচালনা করেন, তাহা সত্য নয়।

প্রভৃতি দেশ হইতে এই ফার্ম্মে আগ্নেয়াস্ত্র আসিত। ১৯১৪ সালের ২৬শে আগষ্ট Tactician নামক একটী জাহাজে মাল আসিবার পরেই শ্রীশ সরকার (ওরফে হাবু) নামে ফর্ম্মের সরকার বড় সাহেবের অনুমতি অনুসারে মাল খালাস করিয়া লইয়া আসে। সাতটি গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া ২০২টি অস্ত্রসমেত বাক্সের (case) মাল খালাস করিয়া আনা হয়। ইহার ২০১ টিতে ছিল গুলি (bullets) আর একটিতে ছিল ৫০টি মশার পিস্তল। ৬খানি গাড়ী রডাকোম্পানীর গুদামে আসে, আর একখানি লালদিঘি পর্য্যন্ত আসিয়া থামে। একটু পরে উহার গাড়োয়ান দোসাদকে শ্রীশবাবু আসিয়া বলেন 'চলো, তোমাকে জলের কলের কাছে যাইতে হইবে।' এই গাড়ীতে ৯টি প্যাকিং বাক্সে ছিল গুলি ও একটিতে মশার পিস্তল। সুতরাং রডা কোম্পানীতে মোট ১৯২টি প্যাকিং করা বাক্স যায়।

এই গাড়ীখানি ওয়েলিংটন ও মলাঙ্গা লেনের সংযোগ স্থলে গেলে উক্ত মাল একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠান হয় এবং জেলেপাড়ার দিকে একটি স্থানে মাল খালাস করা হয়। পরে ৯টি টিকেন্দ্রে ঐ মাল সত্বর বিতরণ করা হয়। শ্রীশ সরকারকে অতঃপরে খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। তাহার সঙ্গে অনুকূল মুখার্জ্জি, গিরীন্দ্র বানার্জি, নরেন্দ্র বানার্জি মার্চ্চ মাস হইতেই কথাবার্ত্তা চালাইতে ছিলেন। অনুকুলবাবু, গিরিন্দ্রবাবু প্রভৃতি আত্মোন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সকলেই ছিলেন শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলীর সহকর্ম্মী।

অতঃপরে চীফ প্রেসিডেন্স ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অনুকুল মুখার্জি, গিরীন্দ্র বানার্জি, নরেন্দ্র, কালিদাস বসু, ভূজঙ্গভূষণ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের ১৯১৩এর নূতন আইন ও দণ্ড বিধি আইনের ৩৮১ ধারা অনুসারে বিচার হয়।

এই পিস্তলগুলির কার্য্যকরী শক্তি খুব বেশী ছিল এবং অতঃপরে প্রতি ডাকাতি এবং খুনের ব্যাপারে ব্যবহৃত হইত। রাউলট কমিটি বলেন—

"The pistols were of large size 300 bore. The pistols were so constructed and packed that by attaching to the

**butt the box containing the pistols, a weapon was produced which could be fired from the shoulder in the same way as rifle."**

বলাবাহুল্য এই পিস্তল ও গুলি পাওয়াতে যতীন্দ্রনাথের দলের খুবই সুবিধা হয়।

আর এই ঘটনার পরেই পুলিশের কর্ম্মপ্রবণতা বহুলাংশে বর্দ্ধিত হইল। খানাতল্লাস, ধরপাকড়, পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ, দূর হইতে পাহারা দেওয়া এবং নানাভাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পুলিশ ও গুপ্তচরের বাহিনী বিরাট আকার ধারণ করিল। স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, পুলিশ কমিসনার, সব বিষয়ই তত্ত্বাবধান করিতেন, কিন্তু এই কার্য্যের জন্য উক্ত বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন মিঃ ডালি, তার সহকারী ছিলেন ডেপুটি কমিশনার মেসার্স টেগার্ট ও বার্ড। এতৎসত্ত্বেও কলিকাতায় কয়েকটি ডাকাতি ও খুনের ব্যাপারে পুলিশ একেবারে নাজেহাল হইয়া পড়িল।

প্রথম ডাকাতি হয় গার্ডেনরীচে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী। বার্ড কোম্পানির বদর তলায় একটি জুট মিল ( South India Jute Mill ) ছিল। সেখানে কুলীদিগকে পারিশ্রমিক এবং বোনাস দেওয়ার জন্য উক্ত কোম্পানির সরকার ( নকুল বেলেল্লা ) এবং দুই জন দারোয়ান ( সুবেত তেওয়ারী ও সুরজবলি সিং ) ১৮০০০৲ একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কোম্পানির আফিস হইতে উক্তস্থানে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিল। গাড়ীর জানালা বন্ধ ছিল, এবং তিনজনেই টাকা লইয়া ভিতরে বসিয়াছিল। গাড়ীখানি অনুমান আড়াইটার সময় গার্ডেনরীচ সার্কুলার রোড্ ও গার্ডেনরীচ রোডের মোড়ে উপস্থিত হয়।

এদিকে ঐ দিন বেলা দশটার সময়েই ৪জন ভদ্রলোকশ্রেণীর যুবক একখানি পাঞ্জাবীর ট্যাক্সী ভাড়া করিয়া হাওড়া ষ্টেসন হইতে রওনা হইয়া চীৎপুর রোড্ ও শিয়ালদহ ষ্টেসন হইয়া উক্তস্থানে ঠিক সেই আড়াইটার

সময়ই উপস্থিত হয়। প্রথমে ছিল তাহারা ৪জন এবং পরে আরও ৪জন আসিয়া ঐ দলে যোগদান করে। একজনের ( নরেন ভট্টাচার্য্যের ) সাহেবী পোষাক ছিল, আর সকলের ছিল দেশীয় পোষাক। ট্যাক্সিখানি গাড়ীর কাছে আসিলে সকলে নামিয়া পড়ে এবং সকলে একসঙ্গে বলে "গাড়ী রোখো"। গাড়ী থামিলে ভিতরের সরকারদের বলে "তোম্‌লোগ্‌ বাহের আও"। তাহারা একটু গড়িমষি করিলে একেবারে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করা হয়। অতঃপরে টাকার থলেগুলি ট্যাক্সিতে চালান করে। চারিদিক হইতে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল বটে কিন্তু কোন রকম বাধা দিতেই সাহস পায় নাই।

অতঃপরে পাঞ্জাবী ট্যাক্সিচালক কিছুতেই গাড়ী চালাইতে সম্মত হয় না। তাই আরোহীগণ তাহাকে ভীষণভাবে প্রহার করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয় ও পতিতপাবন ঘোষ ( মাদারীপুরের ) ট্যাক্সি লইয়া দ্রুতগতি বারুইপুর চলিয়া আসে। নরেন ও পতিতপাবন ছাড়া রাধাবরণ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন প্রভৃতিও ছিল। সম্ভবতঃ অতুল ঘোষও ছিলেন।

ট্যাক্সি বারুইপুরে পৌঁছিলে একখানি টায়ার ফাটিয়া যায়। তাই সকলে একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া জয়নগর হইয়া পীয়ালী নদীর পারে উত্তরভাগ ঘাটে আসেন। অতঃপরে নৌকা করিয়া চোসার হাটে গিয়া জলযোগ করিয়া টাকী যান। টাকাগুলি সব ছিল থলেতে বন্ধ। তাঁরা বারুইপুরে দুইটি ট্রাঙ্ক কিনেন এবং আর দুইটি কিনেন টাকী পহুঁছিবার পরে। পরে হাসনাবাদ ষ্টেসন হইতে মার্টিনের লাইনে পাতিপুকুর আসিয়া আবার একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বৌবাজার, ২০ নম্বর ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রিটে তাহাদের আবাস স্থানে চলিয়া যান।

পরদিন অতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি তিন জন গ্রেপ্তার হয়।

পরদিনই সংবাদ পত্রে ডাকাতির কথা এবং ট্যাক্সির নম্বর ( A 34 ) পড়িয়া যে ব্যক্তির হেফাজতে ট্যাক্সি রাখা হইয়াছিল, তিনি পুলিশে সংবাদ দেন। গোয়েন্দা পুলিশ খবর লইতে লইতে গাড়োয়ানের সহায়তায় উক্ত ফকিরচাঁদ

মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করে। এবং নিজে আসিয়া ডাকাডাকি করিলে রাধারমণ পরামাণিক জানালা দিয়া মুখ বাহির করা মাত্রই গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া বলে "ঐ বাবু, ঐ বাবু"। এইখানে রাধারমণ ধৃত হয়। ইহা ডাকাতির দশবারো দিন পরের কথা। এই সঙ্গে আরও তিনজন ধৃত হয়। এই ভাবে ধরা পড়িবার পূর্ব্বে আবার ২২শে ফেব্রুয়ারী এইরূপ আরেকটি লোমহর্ষণ ডাকাতি হয়।

বেলিয়াঘাটা ইষ্ট ক্যানেল রোডের পারে ললিতমোহন বৃন্দাবন সাহার একটি গদি ছিল। উহা চাউলপটি রোড়ের উপরে অবস্থিত। এখানেও রাধারমণ, পতিতপাবন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন প্রভৃতি মাদারীপুরের দল ছিল। কয়েকজন ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ট্যাক্সি করিয়া গিয়া ক্যাসের কেরাণী বাবু হরেন্দ্র সাহাকে গুলি করিয়া ২২০০০৲ লইয়া আসে। এইসব টাকাই ছিল নোটে। গাড়ীতে টাকা লইয়া আসিলে ট্যাক্সি চালক এখানেও গাড়ী চালাইতে অসম্মত হইল, অমনি চিত্তপ্রিয় তাহাকে গুলি করে এবং মৃতদেহ রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, আর পতিতপাবন জোরে গাড়ী চালাইয়া তাহাদের বাসায় চলিয়া যায়।

পর পর নয় দিনের মধ্যে দুইটি ডাকাতি হইল, আর ৪০ হাজার টাকা উধাও হইয়া গেল, পুলিস চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। গোয়েন্দা সাহেবেরাও ডাকাতির কোন কূলকিনারা করিতে পারিল না। মাদারীপুরের যে সমস্ত সন্দেহের পাত্র যুবক কলিকাতায় থাকিত, তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার ভার পড়িয়াছিল গোয়েন্দা দারোগা সুরেশ মুখার্জ্জির উপরে। সে বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিল, এবং অতঃপরে যে ২০ নম্বর ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটের বাড়ী সন্ধান মিলিয়াছিল, তাহাও তাহারই কর্ম্মকুশলতায়।

এই মাদারীপুরের দলের চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন প্রভৃতি যতীন্দ্রবাবুর খুবই প্রিয় ছিলেন। কালীভক্ত চিত্তপ্রিয়, যতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া গীতার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করেন। চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন প্রভৃতি যতীন্দ্রনাথের

নিত্যসঙ্গী ছিলেন। কিন্তু ইহাদিগকে সুরেশ মুখার্জ্জি তীব্রভাবে খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল।

যতীন্দ্রনাথও বুঝিলেন সুরেশ মুখার্জ্জি জীবিত থাকিতে তাহার এই সব অন্তরঙ্গদের, বিশেষতঃ তাঁহারও আত্মগোপন থাকিবার কোন উপায় নাই। তিনি আদেশ দিলেন সুরেশ মুখার্জ্জিকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিতেই হইবে। অতঃপরে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার জন্য ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

যতীনবাবু তাহার বিশ্বস্ত চিত্তপ্রিয় প্রমুখ কয়জন সঙ্গীসহ এই সময়ে ৭৩ নম্বর পাথুরিয়া ঘাটায় বাসা নিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিল চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন প্রভৃতি কয়েকজন। পাথুরিয়াঘাটা লেনের বাসাটি দোতালায়, কিন্তু একটি সরু গলির মধ্য দিয়া যাইতে হইত, তাই বড় নির্জ্জন ছিল। ফণীভূষণ রায় নাম দিয়া একজন উহা ভাড়া লইয়াছিল। জিনিষপত্র তাহাদের সঙ্গে কিছুই ছিলনা, মাত্র কয়েকটি ঝোলা। ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, প্রাতে নীরদপ্রকাশ হালদার নামে এক ব্যক্তি ৭৩ নম্বরের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোমস্তা মহাশয় কোথায়, গোমস্তা মহাশয় কোথায় বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, ৭৩ নম্বরে আমাদের গোমস্তা বাবু আছে কিনা দেখিতে আসিয়াছি'। পাড়ার লোক বলিল, 'এবাড়ীতে লোক আছেন তাদের জিজ্ঞেস করুন, আমরা চিনিনা'। নীরদ গলি দিয়া গিয়া ৭৩ নম্বরের দ্বিতলের দিকে উঠিতে লাগিল।

প্রকাশ যে নীরদ চাঁদনীতে টেলারিং করিত। যতীন্দ্রনাথ সেই সময়ে চিত্তপ্রিয় প্রভৃতি সহ পিস্তলগুলি পরিষ্কার করিতেছিলেন। কিন্তু নীরদ উঁকি মারিতেই যতীনবাবু যেন ভূত দেখিবার মত বিস্ময়াপন্ন হইলেন! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়!—কোথায় সুরেশের বধের আয়োজন করিতেছেন, আর কে একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া ফেলিয়া সব মতলব পণ্ড করিয়া দিবে! নীরদ যতীন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিল "এইযে যতীনবাবু আপনি এখানে!"—যতীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন "Shoot, মার!"

অমনি চিত্তপ্রিয় পিস্তল ধরিল। নীরদ অমনি কাঁদিয়া বলিল, "দোহাই বাবা মেরোনা বাবা, আমি একেবারে খুন হ'য়ে যাব।" অমনি শব্দ হইল 'ক্রুম্'। নীরদ হেলিয়া পড়িল, গুলি তাহার কণ্ঠদেশ বিদ্ধ করিল। নীরদকে অজ্ঞানবস্থায় দেখিয়া যতীনবাবু আর দ্বিতীয়বার মারিতে না দিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে লইয়া ত্বরিত গতিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এই ঘটনা হয় ২৪ ফেব্রুয়ারী।

স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন, পাড়ার কেহ কিছুই জানিতেই পারিল না। নীরদ কিন্তু মরে নাই, কিছুক্ষণ বাদে একটু সংজ্ঞা পাইয়া হামাগুড়ি দিয়া কোন রকমে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। কেহ তাহাকে হাসপাতালে লইতে স্বীকৃত হইল না। পরে জোড়াবাগান থানায় খবর দেওয়া হইলে, সেখান হইতে পুলিশ হিউয়ে সাহেব আসিয়া তাহাকে মেয়ো হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। সেইখানে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন ডাক্তার যতীন মৈত্র। হাসপাতালে নীরদ দুইদিন বাঁচিয়াছিল। সে যতীন্দ্র, চিত্তপ্রিয় প্রমুখ কয়েকজনের নাম করে। যতীনবাবুর মাতুল ডাক্তার হেমন্ত চ্যাটার্জী এবং আত্মীয়স্বজন সকলের বাড়ী তল্লাস করা হইল, কিন্তু কোথাও যতীনবাবুকে না পাওয়ায় তাহার মাথার জন্য মূল্য ঘোষিত হইল আড়াই হাজার টাকা। অর্থাৎ কেহ ধরিয়া দিতে পারিলে আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। নীরদের বিবৃতিতেই এই সব কার্য্যে যতীন্দ্রনাথের সংস্রব প্রমাণিত হইল। এতদিন যাহা সন্দেহ মাত্র ছিল, আজ যতীন্দ্রনাথের দয়াগুণে পুলিশের কাছে স্বপ্রকাশ হইল। কারণ সেই দিন নীরদকে একেবারে মারিয়া ফেলিলে কোন সংবাদই পুলিশ পাইত না।

অতঃপরে সত্যেন্দ্র মিত্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ যতীন্দ্রবাবু ও তাঁহার সঙ্গীগণের থাকিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এখন দেখা যাক সুরেশ মুখার্জি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইল।

২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে অনুমান ৬।৭টা, পাথুরিয়াঘাটার ঘটনার দুইদিন পরে চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন প্রভৃতি চারিজন তৈয়ার হইয়া হেদো পুষ্করিনীর কাছে আসিয়া রহিল। গোয়েন্দা দারোগা সুরেশ মুখার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত বনবিহারী

মুখার্জ্জি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সম্মেলনের দিকে যাইতেছিলেন। হঠাৎ কি একটা লক্ষ্য করিয়া উভয়েই হেদোর দক্ষিণ দিকে নামিয়া পড়িলেন। চিত্তপ্রিয় ছিল মাণিকতলা ষ্ট্রীটে একটু পূর্ব্বের দিকে দাঁড়াইয়া। আর তিনজন সতর্কভাবে একটু অন্তরালে ছিল। বনবিহারীবাবু রহিলেন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের পশ্চিম পারে, আর সুরেশবাবু শিকার পাইয়াছেন মনে করিয়া চিত্তপ্রিয়ের নিকটে আসিলেন। চিত্তপ্রিয় নড়ে না! বোধ হয় স্বেচ্ছায় ধরা দিতে আসিয়াছে। সুরেশবাবু কাছে গিয়াই বলিলেন "এই যে চিত্তপ্রিয় তোমাকে কত খুঁজচি, পাই না, এসো ভাই আমার সঙ্গে।" চিত্তও দুই একটি উত্তর দিতে দিতে পিস্তলটি আস্তে আস্তে সোজা ধরিল। সুরেশবাবু "কি কর, কি কর" বলিতে বলিতে একহাতে চিত্তরঞ্জনকে ধরিতে যাইবেন, আর একহাতে নিজের পিস্তলের দিকে হাত দিবেন, অমনি তিনদিক হইতে তিনজন ও চিত্তের গুলি একই সময়ে সুরেশের উপরে বর্ষিত হইল। সুরেশের প্রাণহীন দেহ রাস্তায় ঢলিয়া পড়িল। আক্রমণকারীরাও ত্বরিতগতিতে পলাইয়া গেল; আর পুলিশের কর্ম্মতৎপরতাও বৃদ্ধি পাইল।

এদিকে নীরদের মুখ হইতেই যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় প্রভৃতির নাম বাহির হয় এবং এইজন্য তাহাদের কলিকাতা থাকা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নীরদের প্রাণটুকু থাকে যতীন্দ্রনাথের দয়াদ্র হৃদয়ের কোমলতার জন্য। গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হইবার পরে এবং তাহার দ্বারা অনিষ্ট হইবার পরেও শত্রুর শেষ রাখায়ই নিজের বিপদ ডাকিয়া আনা। এইরূপ উদারতা যতীন্দ্রনাথের চরিত্রের মহানুভবতারই নিদর্শন, কিন্তু ইহা খাঁটি বিপ্লবী হৃদয়ের পরিচায়ক নয়।

সুরেশ নিহত হইবার পরে যতীন্দ্রনাথের একটি বড় কর্ত্তব্য রহিল নরেন ভট্টাচার্য্যকে জেল মুক্ত করা; কেবল স্নেহ ও বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া নয়, অনেক দরকারের জন্যও। কিন্তু নরেন গার্ডেনরীচ ডাকাতির অভিযোগে তখন আলিপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে অভিযুক্ত। যতীন্দ্রনাথ ফৌজদারী বিভাগস্থ সরকারী উকীলের সঙ্গে দেখা করেন এবং জানিতে পারেন তখন

পর্য্যন্ত নরেনের বিরুদ্ধে বেশী প্রমাণ না থাকিলেও জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। তবে যদি কেহ স্বীকারোক্তি করিয়া নিজের উপর দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে নরেনের জামিনে খালাস সম্বন্ধে বোধহয় কোনরূপ আপত্তি হইবে না।

আসামীরা অধিকাংশই মাদারিপুরের, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতির সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ। কিন্তু তাহাদের নেতা পূর্ণবাবু তখন আটক রহিয়াছেন। পূর্ণবাবু মাদারিপুর ষড়যন্ত্র মাম্‌লায় খালাস পাইয়াও বিপদ্‌মুক্ত হইতে পারেন নাই। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। কিন্তু তিনি ধরা দেন নাই, তাঁহাকেও কেহ ধরিতে পারে নাই। কিন্তু এবার ধরা পড়িলেন। গার্ডেনরীচ ও বেলিয়াঘাটা ডাকাতির মাঝামাঝি সময়ে একদিন মাদারিপুরের দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ী রাত্রিতে টাকা চাহিতে গিয়াছেন। উক্ত গৃহস্বামীর চক্রান্তে ছদ্মবেশধারী সৈন্যদল কর্ত্তৃক ১৫ ফেব্রুয়ারী ( ১৯১৫ ) তিনি ধৃত হন। জেলে পূর্ণবাবুর কাছে যতীনবাবুর মনোভাব এবং অনুরোধ জানান হইল। পূর্ণবাবু সানন্দে ও সাগ্রহে তাঁহার অনুগত রাধারমণকে সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়া স্বীকারোক্তি করিতে বলিয়া পাঠান। শৃঙ্খলাপ্রিয় নিয়মানুগ রাধারমণও স্বীকারোক্তি করিয়া নিজের স্কন্ধেই সব দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

গার্ডেনরীচ সংক্রান্ত ডাকাতির জন্য কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্টেট ও আলিপুর হাকিমের কাছে দুইটি মোকর্দ্দমা হয়। একটি হয় ডাকাতি আর একটি হয় অস্ত্র আইনানুসারে—২০ নম্বর ফকিরচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের বাসায় অস্ত্র পাইবার জন্য। দ্বিতীয়টির জন্য হয় রাধারমণ ও হীরালাল বিশ্বাসের ম্যাজিষ্ট্রেট কীজ সাহেবের আদালতে দুই বৎসর করিয়া আর ডাকাতির জন্য হয় রাধারমণ ও পতিতপাবনের ৭ বৎসর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পতিতপাবনই ট্যাক্সি চালাইয়া বারুইপুর যায়।

এদিকে নরেন জামিনে খালাস হইয়াই জামিনদার মোক্তারের কাছে জামিনের টাকা জমা দিয়া দেশ ছাড়িয়া গেলেন। এই নরেন্দ্রনাথই বর্ত্তমান মানবেন্দ্র রায়।

## মেভারিকের কথা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যাটাভিয়াকেই কেন্দ্র করিয়া জার্ম্মান কনসাল জেনারেল বাঙ্গালী বিপ্লবীগণের সহায়তায় ভারতবর্ষে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। মেভারিক যে ব্যাটাভিয়ায় আসিয়াছিল, তাহাও ভারতীয় বিপ্লবীগণকে সহায়তা করিবার জন্য।

যতীন মুখার্জ্জি তখন যে অনেক দলের নেতা ইতিপূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ নভেম্বর (১৯১৪) কাশীতে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। রাসবিহারীও যে অনেকবার কলিকাতা ও চন্দননগরে আসিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর পশ্চিম ভারতে বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ১৯১৫ সালের মার্চ্চ মাসে আসিয়া প্রায় দুইমাস যে কলিকাতা ছিলেন তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখানেও যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাসবিহারীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। কি পরামর্শ হইয়াছে তাহা বলিবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক রাসবিহারী পি, এন ঠাকুর নাম নিয়া জাপানেই চলিয়া যান। ইহার পূর্ব্বেই ১৯১৫ সালের মার্চ্চের গোড়ায় জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামক জনৈক ভদ্রলোক ইউরোপ হইতে বোম্বাই আসিয়া পঁহুছেন। তিনি বাঙ্গালী বিপ্লবীগণকে ব্যাটাভিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখিতে উপদেশ বহন করিয়া আনেন এবং এতৎ ব্যাপারে বাঙ্গালীরা যে জার্ম্মাণীর সাহায্য পাইবে তাহাও উল্লেখ করেন।

যতীন্দ্রনাথ গার্ডেনরীচ ও বেলিয়াঘাটা ডাকাতির পরে একদিকে যেমন অর্থ পাইলেন, অন্যদিকে আবার নরেন ভট্টাচার্য্য এবং অতুল কৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতিকে হারাইলেন। কারণ তাঁহারা ডাকাতির অভিযোগে ধৃত হইয়াছিলেন। তাই শ্রীযুক্ত যাদুগোপাল মুখার্জ্জি ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নরেন ভট্টাচার্য্যকে জামিনে খালাস করাইয়া লয়েন। এবং তাঁহাকেই ব্যাটাভিয়ায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহার ছদ্মনাম হয় **C. Martin**।

এই বৎসর ২২ এপ্রিল 'ম্যাভারিক' ( S. S. Mavarick ) জাহাজখানি কালিফর্ণিয়ায়, Sun Pedro হইতে রওয়ানা হয়। তৎপরে অনুমান এপ্রিল মাসের শেষ দিকে মার্টিন জার্ম্মাণ কনসালের সঙ্গে দেখা করিলেই, তিনি বলেন—

"বেশ হয়েছে, ভারতীয়গণকে সাহায্য করবার জন্তই ম্যাভারিক করাচিতে গিয়ে পৌছুবে, জাহাজ রওনা হয়েছে শীঘ্রই এসে পড়্‌বে।"

মার্টিন—জাহাজখানি করাচীতে না গিয়ে বাঙ্গালা দেশে উঠুক্‌ না, আমরা সব ব্যবস্থা ক'রবো।

সাংহাইএর কনসাল জেনারেলের নির্দ্দেশ মতে অবশেষে তাহাই স্থির হইল।

ইতিমধ্যে "হ্যারি এণ্ড সন্স" নামে একটি ফার্ম্ম খোলা হইল। এটি ছিল বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে। হরিকুমার বাবু মার্টিনের স্বগ্রাম চাংড়ীপোতা নিবাসী। মার্টিন এখানে তারযোগে খবর পাঠাইলেন 'কাজটি আশাপ্রদ'।

হ্যারি এণ্ড সন্সের নামে ব্যাটাভিয়ার জার্ম্মান কনসালের নিকট হইতে টাকাও আসিতে লাগিল। রাউলট কমিটির রিপোর্ট বলে, প্রেরিত ৪৩০০০ টাকার মধ্যে কেবল দশ হাজার টাকা ধরা পড়ে, বাকীটা সবই হ্যারি কোম্পানী পায়।

জুন মাসের (১৯১৫) মাঝামাঝি বাঙ্গালায় যাহাতে মেভারিক আসে সে সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়া মার্টিন দেশে ফিরিয়া আসেন এবং যতীন্দ্রনাথ, যাদুগোপাল মুখার্জ্জি, ভোলানাথ চাটার্জ্জি, সত্যেন্দ্র মিত্র ও অতুল ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে জাহাজ নামাইবার স্থান নির্দ্ধারিত হয়। আগ্নেয়াস্ত্র আসিবে প্রায় ৩০০০০ রাইফেল বন্দুক, অসংখ্য গোলা বারুদ। সকলে আশায় আশায় রহিলেন। সেখানে উপযুক্ত লোক নিয়োজিত হইল। যাদুগোপাল ও অতুল ঘোষ সেই ভার লইলেন। জনৈক জমিদারের সহায়তায় তাঁহারা সেখানে আলোর বন্দোবস্ত করিলেন। যাদুগোপাল বলিলেন "যতীন দা, তোমার বিরুদ্ধে কতকগুলি হুলিয়া, তুমি এখানে না থেকে বালেশ্বরে

যাও। সেখানে লুকিয়ে থাকাও সম্ভব হবে। আর দেখ যে অস্ত্রশস্ত্র আমরা পাব, ফোর্ট-উইলিয়ামের এ ব্যাটাদের সাবাড় করতে পারবো, তবে বাইরের সৈন্য সামন্ততো এদের সহায়তা করবার জন্য ঢের আসবে। তাই রেল লাইনগুলি উড়িয়ে দেওয়া দরকার।"

যতীনবাবু—হ্যা ভাই তা হ'লে আমি বালেশ্বর থেকে মান্দ্রাজের রেল রাস্তা উড়িয়ে দেব; বেঙ্গল নাগপুরের ভার নিক ভোলানাথ চাট্যার্জি, চক্রধরপুর হ'তে; খুলনার সতীশ চক্রবর্ত্তী অজয়ের দিকে চলে যাক; সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন ওড়াবে।

অতুল ঘোষ—পূর্ব্ব বাঙ্গালায় কি বন্দোবস্ত হবে?

যতীন—তাও আমি ঠিক করেছি, স্বামী প্রজ্ঞানন্দের দল সে কাজ করবে। নরেন চৌধুরী আর ফণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে সেখানে সব ব্যবস্থা করবার ভার দিচ্ছি।

সত্যেন মিত্র—হ্যাঁ সেখানে এঁরা একটা বাহিনী ঠিক ক'রে পূর্ব্ব বাঙ্গলার জিলাগুলি দখল ক'রে নিবে, তারপরে কলকাতার দিকে আসবে।

আরও স্থির হইল নরেন ভট্যাচার্য্য ও বিপিন গাঙ্গুলী কলিকাতার ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে সব অস্ত্রশস্ত্র দখল করিয়া লইবে, ফোর্ট-উইলিয়াম দখল করিবে এবং কলিকাতা ধ্বংস করিবে। আর সত্যেন মিত্র সব তত্ত্বাবধান করিবে। কার্য্যতঃ যতীনবাবুর অনুপস্থিতিতে বিপ্লবাদের নেতা হইলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র। ইতি-পূর্ব্বেও সমস্ত দলগুলি সম্বদ্ধ করিতে তিনি অনেক স্থানে গিয়াছিলেন।

যতীনবাবু তাঁহার দল লইয়া বালেশ্বর যাইবেন স্থির হইল। ম্যাভারিকের রায়মঙ্গলে আসিয়া পৌঁছিবার কথা হয় ১লা জুলাই। কিন্তু কাদা মাথাই সার হইল, আশা ফলিল না। যে কয়জন কর্ম্মী সেখানে গিয়াছিল দশবারো দিন থাকিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। আনি লার্সেন (Annie Larsen) নামক জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ম্যাভারিকের সঙ্গে মিলিত হইবার প্রস্তাব আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু ইহা সম্ভব হয় নাই। অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা লইয়া ম্যাভারিক ২২শে জুলাই জাভায় আটক ছিল,

যুক্তরাজ্যের তৎপরতায় জুনমাসের মাঝামাঝি ইহা আটক হয়। পরে এক ওলন্দাজ পোত আসিয়া উহা ধরিয়া ফেলে। ম্যাভারিক এবং আনি লাসে ন ছাড়াও আর একখানি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত জাহাজ ধরা পড়ে। উহার নাম ছিল Henry S. ইহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যাঙ্ককে যাওয়ার কথা ছিল। ইহার জার্ম্মান আমেরিকার আরোহী ওনিই, এবং বায়েম এর সহিত হেরম্ব গুপ্ত জড়িত ছিলেন। তিনজনেরই চিকাগোতে বিচারে সাজা হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও ম্যাভারিকের আটকের কাহিনী অবগত হইয়া ধরপাকড় ও খানাতল্লাসে তৎপর হইল।

৭ই আগষ্ট হ্যারি এণ্ড সন্স তল্লাসী হয়। ১৫ই আগষ্ট মার্টিন আবার ব্যাটাভিয়ায় যান। অতঃপরে ৪।৫ মাস মধ্যে তাঁহার কোন খবর পাওয়া গেল না। বালেশ্বরের কাহিনীও ইতিমধ্যে তাঁহারা সকলেই শুনিয়াছিলেন।

ভোলানাথ চাট্যার্জি ১৯১৫, ২৭শে ডিসেম্বর পর্ত্তুগীজ গোয়া হইতে একখানি টেলিগ্রাফ করেন। ইহাতে ফলতো কিছু হইলই না, পরন্তু ভোলানাথ চাটার্জি ধৃত হইলেন। ১৯১৬, ২৭শে জানুয়ারী পুনাজেলে তিনি আত্মহত্যা করেন।

মার্টিনও মেভারিকে চড়িয়া আমেরিকায় চলিয়া যান। মার্টিনের পরবর্ত্তী কাহিনী এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে।

রাসবিহারী বসু যে মে মাসে জাপান পৌছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাউলট কমিটির নিকটে যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয়, তাহাতে রাউলট প্রভৃতি মনে করেন যে রাসবিহারী সেখান হইতেও ভারত সম্পর্কে সমস্ত ব্যাপারেই ইন্ধন প্রদান করিতেছিলেন।

অবনী মুখার্জি নামক জনৈক বিপ্লবীকে জাপানে পাঠানো হইয়াছিল। তিনি যখন ফিরিয়া সিঙ্গাপুরে আসেন, তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার পকেটে একখানি নোট বহিতে কতকগুলি ঠিকানা পাওয়া যায়:

নীলসন ( Nielson ) নামক জনৈক জার্ম্মান ১২৯টি পিস্তল ও কতকগুলি

গুলি গোলা বারুদ দুইজন চীনাম্যানের মারফত অমরবাবুর ( Sj. Amarendra nath Chatterjee, শ্রমজীবি সমবায়-এর নিকট পাঠাইয়া দেন। এইগুলি বাক্সে প্যাকিং করিয়া পাঠানো হইয়াছিল। এই নীলসনের তো অমরবাবুকে চিনিবার কোন কারণই ছিল না। নীলসনের ঠিকানা ছিল ৩২, ইয়াঙ্গটেস্‌পু রোড। এই বাড়ীতে রাসবিহারীও থাকিতেন। সুতরাং রাসবিহারীই ঐনামে বাঙ্গলায় পিস্তলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। নীলসনের ঠিকানা পাওয়া যায় অবনী মুখার্জির নোট বহিতে। অবিনাশ রায়ও এই বাড়ীতে থাকিতেন। অবিনাশ রায় চন্দননগরের মতিলালবাবুকে নমস্কার জানাইয়া যাহাতে তাহারা ভারতে ফিরিয়া যাইতে পারে সেই চেষ্টা করিতে বলেন। মতিবাবুও ছিলেন রাসবিহারীর বন্ধু। মতিবাবুর এবং রাসবিহারীর পরিচিত চন্দননগর, কলিকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লার আরও কতকগুলি নাম ঠিকানাও অবনীবাবুর নোটবহিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত হইতেই রাসবিহারীর চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতঃপর অবনী মুখার্জির কথা এবং রাসবিহারীর ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার কথা আমরা অন্যত্র বলিব।

---

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়

## বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথ

### বুড়ীবালামের যুদ্ধ

নীরদ হালদারের মৃত্যুর কিছুদিন পরে—মাস এবং তারিখ ঠিক বলিতে পারিবনা—যতীন বাবু চারিটি সহচর সহ দক্ষিণাভিমুখে রওনা হন। যত দূর জানিতে পারিয়াছি তাঁহারা প্রথমে যান বাগনান এবং তথাকার হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেনের সহায়তায় কয়েকদিন বাগনান বোর্ডিংএ থাকেন। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরস্পরে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। তাঁহাদের পরামর্শ মতই মাখনবাবুর অন্তরঙ্গ অতুলবাবুর ওখানে তাঁহাদের যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়। বাগনান, তমলুক, কাঁথি প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী কয়েকটি বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টাররাই ছিলেন বিপ্লবী। কাঁথি স্কুলের হেডমাষ্টার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল এবং তিনি সে জন্য বন্দোবস্তও করিয়াছিলেন কিন্তু সে পথে না গিয়া যতীনবাবুর দল বালেশ্বরের দিকে চলিয়া যান।

বালেশ্বরে শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী ৺শৈলেশ্বর বসুর সহায়তায় একটী দোকানের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দোকানটির নাম ছিল 'ইউনিভার্সেল এমপরিয়াম'। ইহা মনিহারী ও কাপড়ের দোকান ছিল। ঘড়ি মেরামত হইত ও বিক্রয় হইত। চাংড়ীপোতার গোপাল ও আর একটী লোক সেখানকার দোকান চালাইতেন। যতীনবাবুর দল এখানে উঠেন কিন্তু এখানে না থাকিয়া সুবিধা মত তাঁহারা ময়ুরভঞ্জের জঙ্গলে চলিয়া যান। বালেশ্বর হইতে ২০ মাইল দূরে কাপ্তিপোদা নামক গ্রামে তাঁহাদের একটী বাসস্থান নির্দ্ধারিত হয় এবং সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া কিছু দূরে আরও ১২ মাইল দূরে তালদিহা গ্রামে একটী বাসস্থান ঠিক করিয়া দোকান খোলেন। তালদিহায় চিত্তপ্রিয় ও
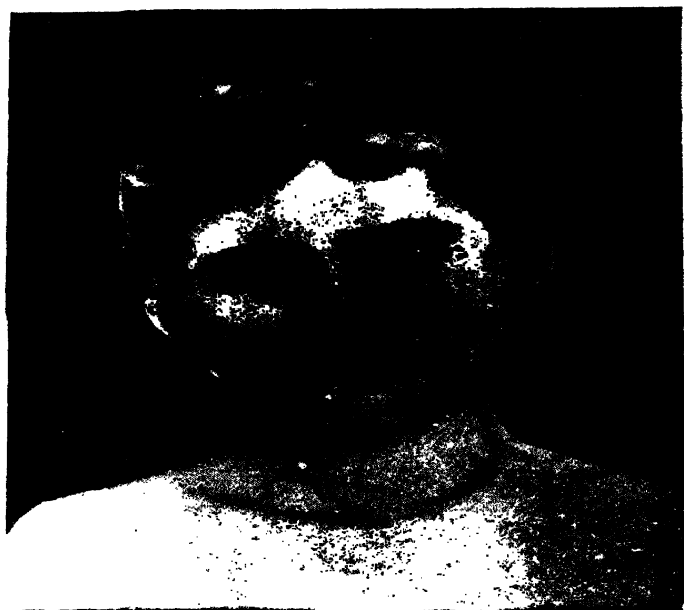
যতীশ পাল থাকিত, আর কাপ্তিপোদায় থাকিতেন যতীন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন। ইঁহারা কেহ কেহ দুইদিন পরে পরে বালেশ্বরে আসিয়া ইউনিভার্সাল এমপরিয়াম হইতে চিঠিপত্র ও আবশ্যকমত খাবার জিনিস লইয়া যাইতেন। মনে রাখিতে হইবে তালদিহা বালেশ্বর হইতে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত।

খবর পাইয়া সংবাদ বিভাগের (আই, বি) বড় সাহেব (D. I. G.) মিঃ ডেনহাম তাহার দুইজন ডেপুটী কমিসনার, টেগার্ট (পরে উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ ও স্যার চার্লস) ও বার্ড সাহেবকে লইয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে পৌছেন এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলবীকে ওয়ারেণ্ট সহি করিতে অনুরোধ করেন। মিঃ কিলবী তাহা করিলেও ভিন্ন প্রদেশেস্থ পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ ভার না রাখিয়া স্বয়ং উক্ত এমপোরিয়াম তল্লাস করিবার জন্য ৫ই সকালে সেখানে উপস্থিত হন। যতীনবাবুর দলের কাহাকেও পাওয়া যায়না, তবে কিছু কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায়। আর গোপাল ও অন্য লোকটিকে সাহেবরা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

কিলবী সাহেব কতকগুলি কাগজপত্র দেখিয়া মনে করিলেন, কাপ্তিপোদায় তল্লাস একান্ত দরকার, কেননা তল্লাসের ফলে একখানি কাগজে 'কাপ্তিপোদা' লেখা রহিয়াছে। ৬ই তারিকে তিনি দারোগা সহ কাপ্তিপোদায় সন্ধ্যাকালে পৌছেন। কাপ্তিপোদা ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে, সে রাত্রি তল্লাস স্থগিত রাখিয়া রাজ ষ্টেটের পুলিসও এস, ডি, ওকে সঙ্গে লইয়া ৭ই তারিখে কাপ্তিপোদা থানা তল্লাস করিয়া দেখেন যাহাদের চান তাহারা কেহই নাই, তবে গাছে, ঘরে, আশে পাশে বন্দুক ও গুলি ছুঁড়িবার সব চিহ্ন রহিয়াছে। সেখানে কিছু কিছু কাগজও পাওয়া যায় এবং খবর পাওয়া যায় যে তালদিহায় কয়েকজন বাঙ্গালীবাবু একটা দোকান করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া বালেশ্বরে চলিয়া আসেন, উদ্দেশ্য—পুলিশের সহায়তায় বালেশ্বরের এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেসনে যাইবার রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া। যতীন্দ্রনাথ কাপ্তিপোদা হইতে ৬ই রাত্রিতে রওনা হইলেই ২০ মাইল পার হইয়া কোন

ষ্টেসনে গাড়ী ধরিতে পারিতেন। কিন্তু চিত্তপ্রিয় এবং যতীশকে ফেলিয়া যাইতে তাঁহারা মন চাহিল না। তিনি উল্টাপথে তালদিহায় চলিয়া গেলেন। উদ্দেশ্য অন্য দুইজনকে লইয়া আসিবেন। ইহাতে শত্রুপক্ষ অনেকটা সুবিধা ও সময় পাইল বটে, কিন্তু সঙ্গীদের ফেলিয়া আত্মরক্ষায় যতীন্দ্রনাথ ব্যগ্র হইলেন না। পাহাড়ের জঙ্গলের পথ ধরিয়া ফিরিয়া আসিতে সম্পূর্ণ ৭ই লাগিল। ৮ই দিনে রাত্রে ৩২ মাইল হাঁটিয়া আবার বালেশ্বরের বা নিকটবর্ত্তী ষ্টেসনের জন্য রওনা হইলেন। দুই দিনের পথশ্রম, অনাহার, অনিদ্রায় তাঁহাদের চলৎশক্তি প্রায় রহিত হইল। হরিপুর গ্রামের মধ্য দিয়া তাঁহারা যে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

ইহার পরে ৯ই তারিখে বেলা ৮।৯ টার সময় এই পাঁচজন বুড়ীবালাম নদীর তীরে গোবিন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। ভাদ্রমাস, নদী স্ফীতবক্ষ, নৌকাছাড়া পার হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু নদীতীরে কোন নৌকারই সন্ধান পাওয়া গেল না। অপর পারে দেখিলেন একখানি নৌকা রহিয়াছে ও একটি লোক মাছ ধরিতেছে।

যে লোকটি মাছ ধরিতেছিল এবং তাহার নৌকাখানি নিকটেই ছিল, তাহার নাম ছিল সানি সাহু। যতীনবাবুরা ডাকিয়া তাঁহাদিগকে পার করিতে বলেন। সানি বলে 'পারিবনা,—নই পারি হোই জিবা'। তাঁহারা বলেন, 'আমরা সরকারী লোক, পার ক'রে দাও'। সানি উত্তর দেয়,—

"আমার নৌকা খেয়া নৌকা নয়, এত লোককে পার করিলে আমার নৌকা ডুবিয়া যাইবে'। ছোট ডোঙ্গা থিব নাহি বুড়ি জিব। অতঃপরে তাঁহারা বলেন "আচ্ছা ভাই, পার না করো আমাদের এই ঝোলা-টোলাগুলো নিয়ে যাও, আমরা সাঁত্রিয়েই পার হবো।" সানি উত্তর করে একটু দক্ষিণে যান, কয়েকখানি খালি নৌকা আছে, পার হইতে পারবেন। তাঁরা একটু দক্ষিণে গিয়া দেখেন চার খানা নৌকা রহিয়াছে, মাঝিরা কাঠ লইয়া বিক্রী করিতে গিয়াছে। একখানি নৌকার মাঝি কেবল

রহিয়াছে। তাহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করায় সে ব্রাহ্মণ দেখিয়া পাঁচটি পয়সা লইয়া পার করিয়া দিল। অনাহারে অনিদ্রায় আর যেন পা চলিবে বলিয়া বোধ হয় না, মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'মাঝি ভাত আছে ?'

—আজ্ঞে না।

"আমাদের রেঁধে দিতে পার ? আমরা পয়সা দেব।" মাঝি দাঁতে জিভ কাটিল। বলিল "দেবতা আপনারা ব্রাহ্মণ পাপ হবে।" মু ছোটজাত অছি, মু হাতেরে পানি খাই পারিব না।"

এখন সানির দাদার বালেশ্বরে একখানি দোকান ছিল, সেখানে সে রোজ যাতায়াত করিত। রাস্তায় গত দিন শুনিয়া আসিয়াছে, বাহিরের বাবুরা চলা ফিরা করিতেছে, দেখিলে তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতে হইবে। সানি সে কথা শুনিয়াছিল, তাই জাল রাখিয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন ?"

তাহারা—আমরা ষ্টেসনে যাব।

সানি—তবে ঐ জঙ্গলের মধ্যে যান কেন ? বাঁধ ধ'রে যান।

ইতিমধ্যে কয়েকজন লোক আসিয়া পড়িয়াছিল। সানি তাহাদিগকে সঙ্গে থাকিতে বলিয়া দফাদার ডাকিতে গেল। ইতিমধ্যে চারিদিকে রটিয়া গেল যে জার্ম্মানীরা এই রাস্তায় আসিয়াছে। আর চতুর্দ্দিক হইতে উড়িষ্যা-বাসীরা কতক ভয়ে কতক কৌতূহলে ছুটিয়া আসিল। এক একবার পালাইয়া যায়—জামিনি আসিছি পরাই জিবা,—আবার ছুটিয়া আসে।

যতীনবাবুরা একটু দূরে গিয়া বিশ্রামের জন্য একটি করঞ্জা বৃক্ষের নীচে বসিয়া পড়িলেন। দফাদার বাড়ী ছিলনা, তাহার ভাই আসে। এদিকে চতুর্দ্দিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল। যতীনবাবুরা দুই একটি ফাঁকা আওয়াজ করেন। লোকগুলি পেছনে দৌড়াইয়া যায়, আবার আসে। এই ভাবে যখন তাঁহারা দামুত্রা গ্রামে আসেন বেলা তখন ১১টা। গ্রামের মাতব্বর রাজ মোহান্তি এবং সুদানি গিরি সম্মুখে গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া পথ বন্ধ করে—চোর অছি,

ধর, ছাড়না'। মনোরঞ্জন তখন গুলি করে, রাজ মহান্তি পঞ্চত্ব লাভ করে, আর সুদানি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। 'মারি কিরি চলি গিলা, সেমানকো ধরো' বলিতে বলিতে এবার তাহারা পিছু হঠিল। দফাদারের ভাই তখন আরও ৩।৪ জন লোক লইয়া সহরে খবর দিতে চলিয়া গেল।

এদিকে সবাই পালাইয়া গেল, কেবল ৩।৪ জন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের গতি লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহারা ক্ষেত পার হইয়া চলিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একজন দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার নাম চিন্তামণি সাহু। সে পোষাক খুলিয়া গ্রামবাসীদের লইয়া আবার উহাদের পিছন পিছন চলিল। ময়ূরভঞ্জ রাস্তা অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা সম্মুখে দেখিলেন একটি খাল। যতীন বাবুরা পিস্তল ও টোটাগুলো ঝোলার সঙ্গে মাথায় বাঁধিয়া সাঁতরিয়া পার হইলেন, কিন্তু স্থানীয় লোকগুলো ভয়ে আর পার হইলনা। অতঃপরে দারোগা চিন্তামণিও গ্রামবাসীদের লইয়া আর পশ্চাদ্ধাবন করিতে সক্ষম হইল না, কেবল দূর হইতে সম্মুখের রাস্তা লক্ষ্য করিল। এবার যতীনবাবুরা চস্‌কন্দ গ্রামের দিকে গেলেন, পরে একটা জায়গা পাইলেন, শুক্‌নো পুষ্করিণীর সম্মুখে উলু-টিপির বাঁধের মত। পাড় ঢালু ও নীচে পুষ্করিণীর খাদ, আর চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা। এইখানে আসিয়া তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। জায়গাটির বিশেষত্ব বাঁধে উঠিলে চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুদূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়, তবে দূর হইতেও গুলি আসিলে পুকুরের মধ্যে লোক শুইয়া থাকিলে বা বাঁধের পেছনে মুখ লুকাইলে, আহত হইবার ভয় থাকে না। স্থানটি নিরাপদ জানিয়া তাঁহারা এই স্থানে আশ্রয় লইলেন।

এদিকে বেলা দুইটার সময় বালেশ্বরে পুলিস সাহেবের কাছে খবর পৌছিল। মাজিষ্ট্রেট কিলবী সাহেব স্বয়ং সশস্ত্র পুলিশ সহ রওনা হইলেন, আর সঙ্গে লইলেন সার্জেণ্ট রাদার ফোর্ডকে; ইনি **Proof Department**-এর লোক। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যতগুলো মটর ছিল, সব লইয়া আসেন। রাদারফোর্ডের

ড্রাইভার অসুস্থ ছিল, সে নিজেই মটর চালাইয়া আসে। বুড়ীবালাম নদীর পারে ফুল্লরী ঘাটে আসিয়া মোটরগুলি রাখিয়া তাঁরা নদী পার হন। পরে তাঁহারা দুইটি ভাগে রওনা হন, রাদারফোর্ড রওনা হয় ময়ূরভঞ্জ রাস্তার দিকে, আর মাজিষ্ট্রেট রওনা হন মেদিনীপুর রাস্তার দিকে। কথা হয় যে উভয়ে গিয়া একস্থানে মিলিত হইবেন। ইনস্পেকটার খাসনবিস রহিল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে। উভয় দলই দুইদিক হইতে ফাকা আওয়াজ করিয়া নিজেদের উপস্থিতি জানাইয়া দেয়। মাজিষ্ট্রেট একখানা সাইকেলে চড়িয়া একস্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঠিক এই সময়ে চৌকীদার আসিয়া সংবাদ দিল,—"হুজুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা কাপড় উড়াইতেছেন।"

এদিকে যতীনবাবুরা যখন বুঝিতে পারিলেন, সশস্ত্র পুলিশ দুইদিক হইতে আক্রমণ করিয়া একেবারে ঘিরিয়া ফেলিবে, সম্মুখে, পার্শ্বে শত্রু সৈন্য, পশ্চাতে গ্রামবাসীর সমাবেশ, তখন চিত্তপ্রিয়, নীরেন প্রভৃতি তাঁহাকে বলিল, যতী দা, "আমরা রহিলাম, আমরা ধরা দিতেছি, আপনার মূল্যবান জীবন, আপনি অন্য দিক দিয়া চলিয়া যান।"

যতীনবাবু সঙ্গীগণকে বলিলেন,—"না ভাই তা হয় না, যতীশ অসুস্থ, তাহাকে ফেলিয়া কোথায় যাইব, আজ এখানে আমরা ভীরুর মত ধরা দিবনা, আমাদের কাছে অস্ত্র আছে, আজ আমরা যুদ্ধ করিয়া মরিব। মৃত্যুতো একদিন আছেই, তবে এমন সুযোগ আর ছাড়িব না, যুদ্ধে মৃতুতো বীরেরই কাম্য। আমরা মরিলেও আমাদের মৃত্যুই জাতির আদর্শ হইবে। তোমরা একখানি কাপড় উড়াইয়া দাও। তাহাদিগকে জানিতে দাও, আমরা এখানে আছি, যুদ্ধের জন্য প্রস্তত।"

পঞ্চবীর এই ভাবেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া দুইদিক হইতে শত্রুপক্ষের আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

কিলবী সাহেব রাদারফোর্ডের জন্য অপেক্ষা করিয়া দুই একটি দূর পাল্লার বন্দুক ছুঁড়িলেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অপরপক্ষের পিস্তলের পাল্লা

বহুদূরগামী নয়, তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে। কিন্তু প্রতিপক্ষ আত্মসমর্পণ করিল না।

শীঘ্রই রাদার ফোর্ড আসিয়া পৌঁছিলেন। অতঃপর দুই দল একত্র হইয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। বামে রহিল রাদার ফোর্ডের দল, দক্ষিণে রহিল কিলবীর দল। যতীন্দ্রনাথই প্রথমে গুলি নিক্ষেপ করিলেন। অপর পক্ষ উত্তর দিতে লাগিল। সাহেবদের দল হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল (crawled)।

এইরূপে তাহারা প্রায় পাঁচশত হাত অগ্রসর হইল। যতীন্দ্রনাথের দল আবার গুলি নিক্ষেপ করিলে ইহারাও প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। এইরূপ কতক্ষণ চলিল তাহা জানিবার উপায় নাই। আমরা শুনিয়াছি কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু কিলবী সাহেব সাক্ষী দিতে গিয়া বলেন অর্দ্ধ ঘণ্টা। যাহা হউক পুলিসের দলের কয়েকজন মারা গেল। কত মারা গেল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। কারণ গভর্ণমেণ্ট কখনও ইহা প্রকাশ করে নাই।

এই পঞ্চবীর অনবরত কেবল পিস্তল ছুঁড়িতেই থাকে (continued firing)।

হঠাৎ একটি বন্দুকের গুলি চিত্তপ্রিয়ের বক্ষদেশ ভেদ করিয়া গেল। কিলবী বলেন আমি দেখিলাম, 'একজন কাপড় ভিজাইয়া নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে জল নিয়া আসিল, তখন সে নিরস্ত্র ছিল বলিয়া আমি গুলি করি নাই।' ইহার পরে যতীনবাবুর উরুদেশে কিলবীর গুলি লাগে। ইহার পর মনোরঞ্জন ও নীরেন মরিয়া হইয়া অনবরত গুলি করিতে থাকে, তাহাদেরও বাসনা বীরের ন্যায় মরিবে, কিন্তু যতীনবাবু আদেশ করিলেন—'যুদ্ধ বন্ধ কর, নিশান উড়াইয়া দাও।' তখন নীরেন এবং মনোরঞ্জন অনিচ্ছায় দুইখানি সাদা কাপড় উড়াইয়া বলিলেন—"যুদ্ধ বন্ধ কর, আমরা আত্মসমর্পণ করিলাম।"

ম্যাজিষ্ট্রেট (কিলবী) সাহেব কাছে আসিলেন। তিনি আর গুলি ছুঁড়েন নাই। কাছে আসিবার পরে তাঁহার টুপীতে করিয়া জল আনাইয়া

আহত দিগকে পান করিতে দেন। চিত্তপ্রিয়ের জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, যতীশ আহত হইয়াছিল, যতীনবাবুও সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। যতীনবাবু সাহেবের সঙ্গে আলাপও করিলেন বীরের ন্যায়। সাহেব তিনখানা খাটিয়া আনাইয়া আহত তিনজনকে শোয়াইয়া দেন। মনোরঞ্জন ও নীরেন ধৃত হইল, তাহাদের গায়ে কোন আঘাত লাগে নাই। যতীনবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিলেন—

"আপনার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট। আমি জানিতাম না, আপনি আসিয়াছেন। বাঙ্গালী ইনস্পেক্টার বুঝিয়া আমি গুলি নিক্ষেপ করিয়াছি।"

আরও বলেন, "আমি ও চিত্তপ্রিয়ই গুলি করিয়াছি। এই তিনজন লোক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল মাত্র, তাহারা জানিতনা আমরা কি করিব। সমস্ত দায়িত্ব আমার ও আমার লেপ্টেনাণ্ট চিত্তপ্রিয়ের।"

অতঃপরে তিনখানা খাটিয়া আসিল, সাহেব ধৃতাবস্থায় তিন জনকে শোয়াইয়া দেন। মনোরঞ্জন ও নীরেনকে লইয়া যাইবার সময়ে যতীনবাবু আবার বলিলেন—

"আপনি ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি, দেখিবেন এই দুইটি বালকের উপরে কোনরূপ অবিচার না হয়, একমাত্র আমিই দায়ী—

**See that no injustice is done to those two boys under the British Raj, whatever was done, I am responsible."**

যতীনবাবুর আঘাত ছিল মুখের মাড়িতে এবং বগলের নীচে ( **in the jaw and below arm-pit** ),

এইরূপে বাঙ্গলার পঞ্চবীর পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া শক্রর সহিত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া রাজপুত বীরদের মত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর ভোরে বালেশ্বর হাঁসপাতালে যতীনবাবু শক্র-মিত্রের প্রশংসা লাভ করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ইহার পর কয়েকদিন কিছু তদন্ত হইল, তারপরে বালেশ্বরে স্পেশাল

ট্রাইবুন্যালে বিচার আরম্ভ হয়। মোকদ্দমার তদ্‌বির করিতে মনোরঞ্জনের দাদা প্রফুল্ল সেনগুপ্ত ও নীরেনের খুল্লতাত সেখানে গিয়াছিলেন। প্রফুল্লবাবুকে সেখানেও কিরূপ পুলিশের নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিব। অনেক চেষ্টা করিয়াও উকীল পাওয়া যায় নাই। একমাত্র উকীল উপেন্দ্রনাথ ঘোষই আসিয়াছিলেন। তাঁহারা থাকিবার স্থান পান নাই, ভয়ে কেহ স্থানই দিতে চায় নাই। একটা কদর্য্য গৃহে তাঁহারা আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহারা কেন, তাহাদের ব্যারিষ্টার মিঃ নিশীথ সেন পর্য্যন্ত বাসা পান নাই, কেহ বাড়ীতে স্থান দিতে সাহস পায় নাই। অবশেষে তাঁহাকে একটা ভাণ্ডারে থাকিতে হইয়াছিল। তারপরে অন্যরূপ নিগ্রহও কম হয় নাই। একজন সাক্ষীর নাম বলবন্ত। নিজেই আসিয়া প্রফুল্লবাবুকে (মনোরঞ্জনের দাদা) দেখাইয়া বলে, 'এই বাবু আমাকে বলে যদি ইহাদের বাঁচাইয়া দিতে পার টাকা দিব'। কমিসনারদের প্রেসিডেণ্ট প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন এইরূপ বলা হইয়াছিল কিনা? প্রফুল্লবাবু তখনই অস্বীকার করেন। হাকিম বলিলেন, 'তোমরা আদালতে আসিতে পারো, কিন্তু কখনও সাক্ষীদের এমন কথা বলিবেনা'—অর্থাৎ এমন ভাবে বলা হইল, যেন তাহারা সত্যই বলিয়াছে। মোকর্দ্দমার সময়ে পুলিশের হাতে এইরূপ নির্য্যাতন ভোগ কেবল দূর বালেশ্বরে নয়, কলিকাতার উপরেও যে বহু বার হইয়াছে, লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বেশ জানে। যাহা হউক যতীশ অসুস্থ ছিল কিন্তু মনোরঞ্জন ও নীরেনের প্রফুল্ল ভাব কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাহারা মাঝে মাঝে বিমর্ষ হইত এইজন্য, কেন তাহারাও চিত্তপ্রিয় ও যতীনবাবুর মত যুদ্ধ করিবার সময়ে মরিতে পারে নাই।

১৬ই অক্টোবর যখন ট্রাইবুন্যালের কমিসনাররা তাহাদের দুইজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং যতীশকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দেন তখনও তাহারা সমানই প্রফুল্ল ছিল।

নীরেন ও মনোরঞ্জনকে প্রফুল্লবাবু প্রভৃতি আসিয়া খুব প্রফুল্ল দেখেন এবং

দেখিয়া মনে হইল পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারা আরও যেন হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে। তাহারা হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করে। নীরেনকে ফাঁসীর পূর্ব্বে যখন মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেন—তোমার কিছু বলিবার আছে? নীরেন বলে—

"ব্রিটিশের অত্যাচার নিবারণ কল্পেই আমরা মৃত্যুপথ যাত্রী। আমাদের মৃত্যুতে ব্রিটিশের অত্যাচার প্রশমিত হউক।"

অসুস্থ অবস্থায় যতীশ একটী স্বীকারোক্তি করে। তাহাতে তাহারা পাঁচজনই যে কলিকাতা হইতে একসঙ্গে আসিয়াছে, তাহা বলে, আর কাপ্তিপোদা হইতে তিনধনা যায় এবং সেখান হইতে হরিপুর হইয়া গোবিন্দপুর আসে ইহাও বলে। বিচারের সময় উক্ত স্বীকারোক্তি সে প্রত্যাহার করে।

নীরেন, মনোরঞ্জন এবং যতীশের বিচার হয় বালেশ্বর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে। ব্যারিষ্টার ছিলেন শ্রীযুক্ত নিশীথ সেন এবং উকীল ছিলেন বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। মোকদ্দমা ১লা অক্টোবর হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৫ই তারিখ রায় বাহির হয়। নিশীথবাবু প্রায় দশদিন থাকিয়া জেরা ও সওয়াল জবাব করেন। উপেন্দ্রবাবু আগাগোড়াই ছিলেন। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের কমিশনার ছিলেন বালেশ্বরের জজ মিঃ Macpherson ও কটকের উকীল রায়বাহাদুর নিমাই মিত্র ও সবজজ রায়সাহেব দয়ানিধি দাস। যতীশ পালের পক্ষ সমর্থন করেন উকিল রজনীকান্ত পাল। যতীশের বাড়ী ছিল খোক্‌সা (নদীয়া)। সে যতীনবাবুর অধীনে যশোহর ঝিনাদহের রেলের মধ্যে কাজ করিত। সে খুব বিশ্বাসী লোক ছিল।

বালেশ্বরের যুদ্ধে জীবিত যোদ্ধৃবৃন্দের বিচারকালে উক্ত জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলবীর সাক্ষ্য :—

On the 5th September I sent for the Superintendent of Police and requested him to collect armed Constables and conduct search. Messrs. Denham, Tegert and Bird had previously arrived. As a result of the search and subsequent enquiries I started for Kaptipada in Mayurbhanja State. I had reason to

suspect there was a retreat for political offenders there. I had written and Sub-Divisional Officer in Mayurbhanja State arrived on the 7th. Messrs. Denham, Tegert, Brid, S. D. Magistrate and myself with Sub Inspector set off on elephants for the alleged retreat and found a house in the jungle with courtyard round. This was about two miles from where we had spent the night. We surrounded the house but heard someone say—there is no one here. We went into the courtyard and on a tree inside found target. There were bullet marks on the tree and on mud wall behind. There was also a small piece of ground prepared for wrestling. The doors were broken open. We looked hastily through the rooms and found books in English, powder shot, case of Homeopathic medicines and other things. We consulted and then searched a neighbouring house belonging to a Bengalee but found none we wanted. I and Mr. Bird returned to Balasore to head off the men wanted. Denham remained behind to make more detailed search of the house. I reached Balasore at 3 P. M. and S. P. made arrangements to petrol the Trunk Road and guard the railway stations. On the 9th at 2 P. M. Superintendent of Police came and told me that five Bengalees had shot one villager dead and wounded another. I requisitioned a car from Major Freath and Sergeant Rutherford was engaged to drive it. Some armed constables were sent on in a carriage and as the chauffeur of Proof Department car had arrived,he drove the constables in the Proof Department Car. More constables were brought by S. P. and we set off. We crossed the ferry and continued on foot along Maurbhanj road, the villagers met us and asked us return as the Bengalees had gone the other way. I sent half of constables under Sg. Rutherford along the road they were on and I turned back with others. I had my revolver in hand

and rifle and ammunition were being carried by another man. Just I passed a nulla a coolie came running to me accross the fields. There was a number of people in the fields and a bamboo, to which a piece of cloth was attached was being waved to attract their attention. I crossed the nulla and as there was water I waded accross the nulla and water being upto shoulder I had to keep the revolver up my head. I then went in direction where people were waving the bamboo and people advanced to meet me and pointed out where the Bengalees were. Presently I heard a sound popping and as by this time constables with the sporting 303 and cartriges had come, I fired to people at a distance of 400 yds in orderto see that I had a long range rifle. I sat and waited for Rutherford who presently arrived with his constales. We made a line with Sergeant Rutherford on the right, myself in the centre and constables on the left and advanced 500 yds. As we advanced. Bengalees started firing again on us. Except the warning shot no other shot had been fired by this side. We lay down and crawled towards where the Bengalees continued firing. We then returned fire from where we were. We could see only four bushes which seemed to be in line and from which firing came but could not see the Bengalees. Suddenly two men appeared from the bush and held up hands. I gave order to cease fire and advanced with Rutheford towards bushes. I saw one man dead and two badly wounded. We noticed three big mauser and one small mauser pistols lying on theground and the stacks for converting big mauser pistols into rifles, and a quantity of mauser ammunition. A watch and money were handed to Rutherford. I fetched water for wounded men and subsequently fetched three beds from the village. Later in the evening S. P. brought to me a bundle of wrapped up blankets and a packet of papers. There was a variety of clothing and in the pocket

of the coat I found a phial containing packets of "Hyoscene Hydrobromide".

"Three pad lived at Maurbhanj two others at Taldiha."

Before he died, Jatin fn English said, "see that no injustice is done to those two boys under the British Raj. Whatever is done, I am responsible. He applogised to me for shooting at me as he thought I was a certain Bengalee Police Officer.

Rutherford...I had not been fired on but Mr. Kilby said he had been fired on. I was on right, Kilby towards the left and constables on either side of us.

When I got on the path of the ridge, the Bengalees opened fire on me and many shots fell round me. I lay down and was again fired at. I threw my topi forwards. The Bengalees still fired shots in my direction and after I rested few minutes to get breath, I prepared to fire if they showed themselves. Presently one got up and fired at me and I fired back but the shot fell short. 5 minutes later the Bengalee got up and fired at Kilbey's direction. He fell back at a distance 150 yds. I reloaded and presently the man got up from different place but just near and fired in Kilbey's direction. I fired and probably hit him for he fell over. After that I saw no more movements and fired few rounds into the bushes. I saw a man slooping up water with hands from rice field—I did not fire then. Almost immediately after the man went back with water, two men came out from the bush, facing us and unarmed called out 'Dont fire, sir, we surronder".

মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত নিশীথ সেন অপূর্ব্ব সওয়াল জবাব করেন। মনোরঞ্জনকে সনাক্ত করা যে সহজ এই সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলেন—

Monoranjan stood out from others by reason of his fairer skin and height and this would account for witnesses' singling him out as being the man who fired, carried the jhola and walked in front.

একটী বিষয়ে সরকার পক্ষের দুর্ব্বলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনোরঞ্জনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয় (১২১ দঃ বি নয়), রাজমহান্তিকে হত্যা (৩০২ দঃ বি) মাত্র। শুনিতে পাই, টেগার্ট সাহেব নাকি যতীনবাবুর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু অভিযোগ হইতে মনে হয় এইরূপ প্রশংসায় (যদি বাস্তবিকই টেগার্ট ইহা করিয়া থাকে) কোনরূপ আন্তরিকতা ছিল না।

যাহা হউক চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন এবং নীরেন সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় ছাড়া এ গ্রন্থে বেশী কিছু দেওয়া সম্প্রতি সম্ভব হইল না।

চিত্তপ্রিয় খালিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পঞ্চানন রায়চৌধুরী, যে বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়—সেই বৎসর উত্তীর্ণ হন। তিনি মাদারীপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই চিত্তপ্রিয় ছিল অমিত বলশালী ও দুর্দ্ধর্ষ। মনোরঞ্জন এবং নীরেন উভয়েই সম্পর্কে ছিল ভাই। উহাদের বাড়ী খয়ের ডাঙ্গা গ্রামে। নীরেনের পিতা ললিত দাশগুপ্ত মাদারীপুরে কবিরাজী করিতেন। মনোরঞ্জনের জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রফুল্লবাবু শিক্ষকতা করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। খেলা, সন্তরণ ও কুস্তী প্রভৃতিতে ইহারা বিশেষ পটু ছিল। যতীশের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। দ্বীপান্তরে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং পরে উহা মস্তিষ্কের পীড়ায় পরিণত হয়। রংপুরের উন্মাদাগারে তাহার জীবনাবসান হয়। এই তিনজনকেই চালান কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দলভুক্ত (recruit) করেন। এবং ইহারা পূর্ণবাবুর দলভুক্ত। মনোরঞ্জনের চেহারা সম্বন্ধে সুলেখক শ্রীমান্ অমলেন্দু দাশগুপ্ত যে পরিচয় দিয়াছেন, "ফর্সা রং, মাথার চুল কুঞ্চিত, দীর্ঘ-চেহারা সরলমুখ—" তাহা মিঃ নিশীথ সেনের অভিভাষণেও সমর্থিত হয়।

মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও, জেলখানার ভিতরে, কয়েদীদের সম্মুখে, কানাইলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকের প্রাণবধ, বুড়ীবালামের যুদ্ধ, গৌহাটীর কামাখ্যা পাহাড়ের যুদ্ধ এবং ঢাকা কলতাবাজারে তারিণী মজুমদার ও নলিনী বাগচীর সহিত পুলিসের সংঘর্ষ—এ সকলই বাঙ্গালীর বীরত্ব, সাহস ও দেশভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন।

আমরা কি আশা করিতে পারিনা যে, যেস্থানে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারজন বীর সৈনিক সহ যুদ্ধ করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, অচিরে সেই পবিত্র ভূমি চসকন্দে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইবে?

বিপ্লব ইতিহাসের প্রথম পর্ব্ব এইখানেই শেষ করিতে ইচ্ছা করি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিপিনবাবুর মামলা, তালতলা ডাকাতি, শিবপুর ডাকাতি, প্রয়াগপুর ডাকাতি ও বসন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হত্যার দুইবার প্রচেষ্ট ও পরে ১৯১৬ সালে হত্যার কাহিনী অনুক্ত রহিল।

এই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রঘোষের 'যুগান্তর দল,' 'অনুশীলন দল' এবং 'পুনগঠিত যুগান্তর' দলই বিপ্লবান্দোলনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পাঠকের অবগতির জন্য এইস্থানে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলের নিকট বাঙ্গলার গভর্ণর কেসি ১৯৪৫ সালে যে গোপনীয় চিঠি * লিখিয়াছেন তাহার কিছু অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

"বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও আরও জনকয়েক মিলিত হইয়া 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। গুপ্তসমিতি গঠন করিয়া হিন্দু যুবকদের আধুনিক মারণাস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার শেখাতে থাকেন। তারা প্রচার করিতে লাগিলেন—বৃটিশ এ দেশ শাসন কচ্ছে ছল আর বলের সাহায্যে এবং তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।....এই যুগান্তর দল ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সংগঠনশীল সমিতিতে পরিণত হয়। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে এরূপ বাছাবাছা তীক্ষ্ণধী যুবক দেখা যায় না। এই দলের মধ্যেই ছিলেন বৃটেনের সত্যকার দুর্জয় শত্রু।

এছাড়া আরও দল আছে, উহাদের উদ্দেশ্য এক ও কর্ম্মপদ্ধতিও অনুরূপ। এদের মধ্যে অনুশীলন সমিতি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এদের প্রধান ঘাঁটি ঢাকায় এবং এই সমিতি প্রদেশের সব চেয়ে বিপজ্জনক সংগঠন। ইহার শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। এঁদের সভ্যও অনেক, বিভিন্ন প্রদেশে এঁদের শাখা-প্রশাখা আছে। এই দলের বহু সভ্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন। তাছাড়া বিশেষ আইনের বলে এঁদের অনেককে আটক করে রাখা হয়েছিল।"

অন্যায় দলগুলি সম্বন্ধে এখনও বলিবার সময় আসে নাই।

অতঃপরে কি প্রকারে সমস্ত বিপ্লবী দল বাঙ্গলার একচ্ছত্র নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়া অহিংস অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণ করে ও স্বরাজ সংগ্রামে আত্মদান করিতে অগ্রসর হয়, পরবর্ত্তী ইতিহাসে তাহা উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল। **বন্দেমাতরম্‌**।

---

* শারদীয় সংখ্যা "স্বাধীনতা" ১৩৫৪ পৃ ৪১—৪২